বাবা-মা

শ্রী অজিতকুমার দত্ত

ও

শ্রীমতী নূপুর দত্ত

প্রাককথন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কবে আমার প্রিয় লেখক হ'য়ে উঠলেন, আমি জানি না। কেননা তিনি যে কেমন লেখক কিংবা লেখকদের লেখক অথবা নিপুণ ভাষাশিল্পী একথা জানারই সুযোগ ঘটেনি জীবনের অনেকদিন পর্যন্ত। স্কুল-কলেজে জ্যোতিরিন্দ্র পাঠ্য ছিলেন না কোনোদিন (ভবিষ্যতেও অন্তর্ভুক্তি তালিকায় তাঁর নাম উঠবে কি না, সন্দেহ আছে) এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরে পৌঁছেও তাঁর নাম শুনিনি। হয়তো আমারই অজ্ঞতা। কিন্তু এ-ও ঠিক, পুঁথি-প্রকরণ আলোচনায় তুলনামূলক ভাবেও তাঁর নাম কলকণ্ঠে উচ্চারিত হ'তে শুনিনি কখনও। অথচ, পাঠ্যসূচির বাইরে আমাদের পড়াশোনার পরিধি কতটুকু!

তাঁকে নিয়ে যখন কাজ শুরু করি তখন আমার আনাড়ি হাতে দু'একটি পদ্য এবং গদ্য চর্চা হয়ে গিয়েছে। সেটা ১৯৯৩ সাল। তীব্র ভাষাসংকট এবং ভাবোন্মাদনায় ভুগছি। কী লিখব! কী পড়ব! জানি না।

আলো দেখালেন আমার শিক্ষাগুরু, একান্ত পরামর্শদাতা, ঋষিতুল্য ড. অলোক রায়। জ্যোতিরিন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনটি তিনিই প্রথম আমার হাতে তুলে দেন। বইটি পড়ি। একবার দু'বার একাধিকবার। পড়তে পড়তে অনুভব করি, কোথাও কোনো নিষিদ্ধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। আমার নাকি আমার পরিচিত পৃথিবীর!

ভয়ংকরভাবে আহত, বিধ্বস্ত আমি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করি কেন জ্যোতিরিন্দ্র বাহিরি, কেন এত অনুচ্চারিত।

যা একান্ত গোপন, ব্যক্তিগত। লজ্জার এবং অপমানেরও তেমন কথা কি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা যায়! লোকে ছি ছি করবে না! সে লেখা পড়াটাও যে অপরাধ!

ঠিক এইখান থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন। সবরকম অসত্য, কৃত্রিমতা এবং ভণ্ডামি থেকে চেতনার মুক্তি দিলেন তিনি। তাঁর এক একটি ভাষার চাবুক বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো টানটান করে দিল শিথিল মেরুদণ্ডকে। অস্তিত্বের বিপন্নতা থেকেই অস্তিত্বকে চিনে নেওয়ার সংকেত-ধ্বনি অনুরণিত হ'তে শুনলাম তাঁর রচনায়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এল মনে, কেন এই বিস্মরণ! তাঁর মৃত্যুর মাত্র ষোল বছর পরেই! কেন আমাকে এক নবীন কবি প্রশ্ন করবে কে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী? নাম শুনিনি তো। কেন উচ্চশিক্ষিতা তরুণী প্রশ্ন করবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী না নাথ! (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে) আবার পুরস্কারপ্রাপ্ত কোনো সাহিত্যিক কেন নাক কুঁচকে বলবেন, ইস্-স্, জ্যোতিরিন্দ্র! আর কাউকে পেলে না?

তখনই আমি সমগ্র জ্যোতিরিন্দ্র বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করি।

কারণ তাঁকে আংশিক জানলে না জানার থেকে বড় অবিচার হ'য়ে যায়। আসলে জ্যোতিরিন্দ্রকে বোধ এবং প্রতীতির মধ্যে গ্রহণ করার জন্য বোধহয় কেবল একটি যৌবন যথেষ্ট নয়। সমাজ-সংসারের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে উত্তর তিরিশে যে দ্বিতীয় পরিণত যৌবন আসে তখনই মনে হয়, ইনি আমার আত্মীয় হতে পারতেন। কাজেই জ্যোতিরিন্দ্রকে নিয়ে এই আলোচনা যেন মহালয়ার পুণ্যলগ্নে এই প্রজন্মের স্বতোৎসারিত তর্পণ।

প্রথমেই বলে রাখি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সব রচনাই আলোচনার যোগ্য নয়। হয়তো রুজির কারণে, সংসারের প্রয়োজনে অনেক আবোল তাবোল লিখতে হয়েছিল তাঁকে। যা অধিকাংশ লেখকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তাঁর ক্ষেত্রে একথা আরো সত্য এই কারণে যে, জীবনে কোনোদিন বাঁধাধরা চাকরি তিনি করেননি। (হাতে গোনা কয়েক বছর ছাড়া)। কোনো আকাশচুম্বী পুরস্কার পাননি (আনন্দবাজার গোষ্ঠী প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছাড়া) পাঠক কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। যদিও তাঁর নিতান্ত তুচ্ছ, বিষয়-বৈচিত্র্যে বৈশিষ্ট্যহীন কাহিনীতেও ঘটেছে অসাধারণ শিল্প-রসায়ন। এই লেখক আকাদেমি পেতে পারতেন। যথার্থ অনুবাদ হ'লে স্থান পেতে পারতেন বিশ্ব সাহিত্যেও। কেবল গুটিকয় রচনার জন্যই।

তাঁকে চেনাব জন্য বেছে নিয়েছি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনাগুলিই। হয়তো পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি গল্প-উপন্যাস বিশ্লেষণ সংযোজিত হ'তে পারে। কিন্তু এখানে সেগুলি বাদ পড়ায় সম্যক উপলব্ধির কোনো অসুবিধা হবে না বলেই মনে করি। উল্লেখ্য, সৃষ্টিপর্বে কোনো অগ্রজেব প্রভাব জ্যোতিরিন্দ্র স্বীকার না করলেও প্রায় মায়াবী দৈত্যের মতো যিনি তাঁকে তাড়িত করেছেন অবিরত, তিনি হলেন জীবনানন্দ দাশ। কাজেই জীবনানন্দের কবিতা দিয়েই প্রবন্ধ-প্রসঙ্গ বিস্তার বিবেচ্য বলে মনে করেছি।

জ্যোতিরিন্দ্রকে নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে ভীষণ সমস্যায় পড়েছিলাম, মাঝপথে কাজ থেমে যাবে বলেও আশঙ্কা করেছিলাম তা হ'ল তাঁর বই-এর অভাব। 'আউট অফ প্রিন্ট' হয়ে যাওয়ায় সে সময় বাজারে তাঁর সব বই পাওয়া যাচ্ছিল না। গ্রন্থাগারেও নয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বই এবং যাবতীয় পত্র-পত্রিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার ও নিবন্ধগুলি দিয়ে আমাকে সর্বতোভাবে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন শ্রী ধীমান দাশগুপ্ত।

এ ছাড়া যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ছাড়া এ বই-এর একটি অক্ষরও লেখা এবং প্রকাশ সম্ভব হ'ত না, তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. নরেশচন্দ্র জানা, শ্রী আজাহারউদ্দীন খান, লেখক পত্নী শ্রীমতী পারুল নন্দী, শ্রী দেবকুমার বসু (আই. পি. এস.), এবং আমার দিদি শ্রীমতী আল্পনা দত্ত। এ ছাড়াও নানা ভাবে আরও অনেকেরই সহযোগিতা পেয়েছি। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করি। শোধ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। বহু পরিশ্রম এবং চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো কোথাও কিছু ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তবু পাঠক সাধারণের কাছে এ-বই গ্রহণযোগ্য হ'লে নিজেকে ধন্য মনে করব।

রঞ্জনা দত্ত

সূচি

জ্যোতিরিন্দ্র : সময় অসময়

*   *   *

"কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

*   *   *

বন্ধুকে বঞ্চিত ক'রে দু জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু জনের হাতে।
পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন

*   *   *

...পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হয়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার করে নিতে হবে
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হয়ে যায়।

*   *   *

মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয়;
সময়ের হাতে অন্তহীন।"

(১৯৪৬-৪৭ : শ্রেষ্ঠ কবিতা : জীবনানন্দ দাশ)

সময়ের অনুলিপি রচনা করেন একজন লেখক। সময় কথা বলে লেখকের সঙ্গে, লেখক বলেন পাঠকের সঙ্গে। পাঠকসাধারণের কাছে একটা সময়, সময়ের ইতিহাস ও তার কার্যকারণ সম্পর্ক তুলে ধরেন তিনি। সেক্ষেত্রে কেবল ঘটমান বর্তমান নয়, ঘটমান অতীত ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে কথাশিল্পীর অন্তর্চেতনায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজজীবন তথা মানবজীবন ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে নানান ভাঙচুর এবং গড়ে ওঠা বা গড়ে ওঠেনি এমন কোনো গৌরবহীন জীবনের কাহিনীবিন্যাসই তখন এক তন্নিষ্ঠ শিল্পীর জীবনাদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা সাহিত্যচর্চার যে উল্লেখযোগ্য পর্বে কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-১৯৮৩) আত্মপ্রকাশ, তা মূলত পালাবদলের কাল। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, বিদেশি শক্তির শোষণ এবং স্বাধীনতার মূল্যে দেশভাগজনিত অভিঘাত সূচিত করেছিল এই পালাবদলের ইঙ্গিত।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) দু'বছর আগে জ্যোতিরিন্দ্রের জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত সেভাবে বাঙালির জীবনকে স্পর্শ করেনি। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, একদল মানুষ প্রভূত অর্থোপার্জন করেছেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরির বাজার সংকুচিত হয়েছে। বিশেষ ভাবে তিনের দশকে অর্থনৈতিক বিশ্বমন্দা বাঙালির নিশ্চিন্ত জীবনধারাকে ব্যাহত করেছে। শুধু কলকারখানাব শ্রমিকদের জীবনে অনিশ্চয়তা এসেছে তাই নয়, পল্লীবাংলাতেও সমাজস্থিতি বিপর্যস্ত হয়েছে (দ্রষ্টব্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা')।

এর মধ্যে রুশদেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। জারের শাসনের অবসান, শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতালাভ— শুধু বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে তাই নয়, মার্কসবাদের জয় ঘোষণা করেছে। ভারতবর্ষের সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটেছে, কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে গণচেতনার উন্মেষ না হলেও ধীরে ধীরে কৃষিজীবী এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অধিকারবোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে রাজনীতি-নিরপেক্ষ আত্মসন্তুষ্ট মনোভাব পোষণ করা তখন আর সম্ভব ছিল না।

ভারতবর্ষে বিশ শতকের সূচনা থেকেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ এবং তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন—দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্রবদলে সাহায্য করে। অল্পপরেই অগ্নিযুগের সূচনা। নরমপন্থী রাজনীতির পরিবর্তে চরমপন্থী রাজনীতির জন্ম। সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন সেকালের যুবাসম্প্রদায়। শুধু স্বপ্ন নয়, তাকে কিছুটা বাস্তবায়িত করতেও সক্ষম হন তাঁরা। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেশবাসী সকলে সমর্থন করেছিলেন এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো কারো মনে হয়েছিল, "রাষ্ট্র যখন তৈরি নেই তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা করা পথ ছেড়ে অপথে চলা" (সত্যের আহ্বান, কালান্তর), কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে বলতে হয়েছে, "দেশভক্তির আলোকে বাংলা দেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবী শক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনোদিন দেখি নাই।" (ছোটো ও বড়ো, কালান্তর)। কোনো সন্দেহ নেই তিনের দশকের শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী-রাজনীতি দেশের যুবাসম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেছে। ইতিমধ্যে

গান্ধিজির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসংখ্য মানুষ কারাবরণ করেছেন। ভুল হোক ঠিক হোক, এক প্রবল উন্মাদনা, আবেগ আত্মবিস্মৃত জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে। সেই আবেগে অনেকে ভেসে গেছেন। অনেকে সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একটা পথ খুঁজে পেয়েছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ ইউরোপে শান্তি আনেনি। অথবা সেই আপাত শান্তি-কল্যাণের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ লুকিয়েছিল। তিনের দশকের শেষের দিকে ইউরোপে আবার যুদ্ধের সূচনা, আর সেই মহাযুদ্ধ এবার ইউরোপ ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ না থেকে প্রাচ্য ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল। বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান ভারতবাসীকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিল না। সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের 'দিল্লি চলো' অভিযান যুদ্ধকে এক নতুন মাত্রা দান করেছে। এর সঙ্গে '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথাও মনে পড়বে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাধারণ বাঙালি হয়তো বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ে শুধু কলকাতায় বোমা পড়েনি, বোমার আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে, মানুযেব মনে। কলকাতায় বোমা পড়বে— এই আতঙ্কে শহর ছেড়ে দলে দলে মানুয গ্রামে ও মফস্বল শহরে ভিড় করেছেন। মানুষের সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। যুদ্ধের জন্য মজুতদারি অস্বাভাবিক প্রাধান্য পেয়েছে। চাল-তেল-কাপড়— সব কিছু অদৃশ্য হয়েছে। অথচ দেশে কোনো কিছুরই অভাব নেই। কালোবাজারের সঙ্গে এই সময়ই বাঙালির পরিচয় ঘটল। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, এই সময় থেকেই মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প'-এ সেই-সময় ধরা আছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধের কোনো লেখকই মহা-মন্বন্তরের (১৯৪৩) অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেননি।

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে মনে হয়েছিল এবার স্থিতি ফিরে আসবে— নতুন ধান্যে হবে নবান্ন। কিন্তু '৪২-এর আন্দোলন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে কাম্য ঐক্যবদ্ধ গণজাগরণ সম্ভব হয়নি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আগে থেকেই ছিল, ইংরেজ শাসক সেই ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছে। ফলে '৪৬ সাল থেকে বাংলা দেশে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রান্তভাগে পৌঁছে (১৯৪১) মর্মান্তিক বেদনায় প্রত্যক্ষ করেছেন, "সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।" ফলে রবীন্দ্রনাথ আতঙ্কবোধ করেছেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অবস্থা কল্পনায়—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" (সভ্যতার সংকট, কালান্তর)

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এল। কিন্তু বিদেশি শাসনের অবসান হলেও স্বদেশি একশ্রেণীর মানুষের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল। অন্যদিকে দেশবিভাগ জাতীয়জীবনে কী সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে, আজ একুশ শতকে পৌঁছেও তার স্বরূপ অনুভব করা যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। পূর্বপাকিস্তান থেকে শরণার্থী হিসেবে যাঁরা এ-বাংলায় এলেন, তাঁরা সকলেই '৪৭-এর পরে আসেননি। যাঁরা আগে এসেছিলেন, যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, এদিক থেকে উদ্বাস্তু নন। কিন্তু দেশবিভাগের আগে পর্যন্ত যে-দেশ ছিল স্বদেশ, পরবর্তীকালে তাই হল বিদেশ। ফলে নিজ বাসভূমি হারিয়ে মানুষ অনিকেত নিরালম্ব নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে বাধ্য।

দেশের স্বাধীনতালাভকে তাই অনেকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। সে সময় সাম্যবাদী দলের কর্মীদের মুখে শোনা গেছে— এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। আসলে স্বাধীনতার কাছে আমাদের যে-প্রত্যাশা ছিল, সে-প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। দেশে অধিকাংশ মানুষ অন্ন বস্ত্র শিক্ষা আশ্রয়— সব কিছু থেকে বঞ্চিত। একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে পুরনো মূল্যবোধের অবক্ষয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, দেশে কলকারখানা গড়ে উঠেছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের দুঃখ দূর হয়নি। বেঁচে থাকবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাও মেলেনি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ভৌগোলিক সীমারেখার দাসত্ব করেনি কোনোদিন। নিছক কালপারম্পর্য রক্ষা করা তার কাজ নয়। দূর অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যতের পথে বিরামহীন যাত্রা তার। তাই দহনকাল বা পালাবদলের কালটিকে চিহ্নিত করতে হলে জেনে নিতে হয় তার প্রাক্ পর্বটিকেও।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে মানবিক আবেদনের একটা বড় প্রাধান্য ছিল। ছিল হৃদয় ও আবেগের সুষ্ঠু গৃহিণীপনা। সংঘাত তখনও ছিল। কিন্তু একইসঙ্গে ছিল সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। সাহিত্য যেহেতু বিশুদ্ধ সৃজনক্রিয়া, হৃদয়াবেগ সম্ভূত সংঘাত ও সমন্বয়ের এই লীলার প্রতিরূপ ধরা পড়েছিল তার ফলকে। 'হিতবাদী' থেকে 'সবুজপত্র' পর্যন্ত এই পর্বকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এবং এই পর্বের যোগ্য ঋত্বিক অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। ছোটগল্প থেকে উপন্যাস, প্রবন্ধ থেকে কবিতা— সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সর্বত্র যিনি মানবজীবন তথা সামাজিক পটভূমিগত যুগমানসের নির্ভুল চিত্রটি যথার্থ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরলেন, তিনি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ।

উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে পরিবর্তনের সূচনা। বিশ শতকে বিশেষভাবে যন্ত্রসভ্যতার উত্থান। বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি। একইসঙ্গে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে ঘটে গেল পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ। প্রথমটি সুদূর ইউরোপে। দ্বিতীয়টির অভিঘাত সরাসরি এসে লাগল প্রাচ্য ভূখণ্ডে। গ্রাস করল মানুষের সার্বিক চেতনা। দেখা দিল ভীষণ এক অনন্বয়। সৃষ্টি হল নয়া মানবতাবাদ। আবেগ এখানেও। নিছক বেঁচে থাকার আবেগ। এই আবেগের লক্ষ্যে স্থির থাকতেই হৃদয়ের স্থান নিল বুদ্ধি। রুদ্ধ হল সহজ পথে সহজ হবার সাধনা।

বস্তুত সবুজপত্রের (১৯১৪) কালেই শোনা গিয়েছিল এই বৌদ্ধিক জটিলতার

সংকেতধ্বনি। যন্ত্রসভ্যতার ভয়াবহ আস্ফালন ও তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ছবিটি আমরা দেখতে পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' ইত্যাদি রচনায়। মনীষীসম মানুষটি হয়তো খুঁজেছিলেন কিছু সমাধানসূত্রও তাঁর 'মানুষের ধর্ম', 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। কিন্তু তত্ত্ব এবং প্রয়োগের বিরোধ বরাবর ছিল। এখনও আছে। যে মানুষ একাই দশকাঠা জমির ফসল ভোগ করেছিল একদিন, যুদ্ধ বিপ্লব অথবা দেশভাগের কশাঘাতে হঠাৎ সে যদি বাস্তুচ্যুত হয়, কোনো তত্ত্বকথা বা দর্শন তার কাছে বাহুল্যমাত্র। অভ্যাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সে বিসর্জন দেয় মূল্যবোধ। নৈতিকতা। বিস্মৃত হয় মেকি আভিজাত্য। তখন অন্যের জমিতেই সে দখলিদার। প্রয়োগ করে যে কোনো কৌশল। ইন্দ্রজাল কিংবা কপটতা। চৌর্যবৃত্তি, বিবাদ অথবা হত্যা। বুদ্ধির এই রক্তচক্ষুই শাসন করেছিল যুদ্ধ-পরবর্তী জনজীবন ও সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে এই পর্বটিকে আমরা 'কল্লোলের কাল' বলে চিহ্নিত করতে পারি।

এই সময় যাঁরা সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হলেন, তাঁদের কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল যুদ্ধজনিত কয়েক বছরেব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছাড়াও ফ্রয়েডিয় মতবাদ এবং রুশ বিপ্লবোত্তর নতুন জীবনের বাস্তবগ্রাহ্য বিশ্বাসের জগৎ, যা ছিল অনেক পরিমাণে মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত। উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কল্লোল' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৩০ সাল, ইংরেজি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। আবার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী চেতন' তৎকালীন (কল্লোল পর্বের) সাহিত্যে যথেষ্ট ছাপ ফেলতে পারেনি। ছিল ভাবাবেগের প্রশ্রয়। এক ধরনের ভাববিলাস। এই সময় এক দল সাহিত্যিক রচনা করলেন স্থূল বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যচিত্র, অন্য দল বাস্তবের রূঢ়তা এড়িয়ে রচনা করলেন মোহ মায়াময় কল্পনার লোককথা।

অথচ ১৯০৫-এ কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-কে কেন্দ্র করে স্বদেশি আন্দোলনের এক প্রবল উত্তাপ প্রবাহিত হয়েছিল দেশজুড়ে। কিন্তু শহর-গ্রাম নির্বিশেষে বাঙলার মানুষ তখনও অভিন্ন হৃদয়। তখনও গোষ্ঠীবদ্ধ। স্বভাবধর্মে সার্বিক বিচ্যুতি, শূন্যতাবোধ অথবা জীবনের কেন্দ্রভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনাদায়ক অনুভূতি তখনও স্পর্শ করেনি তাকে। বরং স্বাধীনতা আন্দোলন দেশীয় মানুষকে পৌঁছে দিয়েছিল অন্য এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

দেশের সর্বাধিক শক্তিশালী দল কংগ্রেসে তখন গান্ধিজির নেতৃত্ব। গান্ধিজির কৃচ্ছ্রসাধনা এবং অহিংসা এক আত্মিক শুদ্ধির উদ্ভাস ঘটালেও রাজনৈতিক সংকট ছিলই। জনবিপ্লবের ধারণা তখনও ভারতীয় বিপ্লবীদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত নয়। বড়জোর বোমা-পিস্তল বানানো কিংবা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি জপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাঁদের চেতনা। কেউ কেউ দেশজুড়ে সমস্যা, বিদেশি শক্তির শোষণে অত্যাচারে নিষ্পেষিত বঞ্চিত অভুক্ত জনসাধারণের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও চিন্তাশক্তি তখনও ভাববাদী লক্ষণাক্রান্ত। কাজেই পটভূমিগত দূরত্ব এবং সুদূরপ্রসারী চেতনার অভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণাম কোনো সচেতন রেখাপাত করেনি বাংলা সাহিত্যে। আদতে প্রথম মহাযুদ্ধ এদেশে প্রসব করেছিল চরম অনিশ্চয়তা এবং জ্বরতপ্ত এক বিপ্লবের ঘোর। বিপ্লব কী, জনযুদ্ধ কী, কাকেই বা বলে জনসংযোগ (communication) বা জনসংগঠন—তখনও মজ্জাগত

হয়নি দেশীয় নেতা বা লেখক বুদ্ধিজীবীর চেতনায়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯) ভয়াবহ বিভীষিকাই যথার্থ পরিবর্তনের সূচনা করে ভারতবাসীর মনে। তীব্র করে তুলেছিল অস্তিত্বের সংকট। টানা ছ'বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এ দেশের সমাজ ও জনমানসে জন্ম দিয়েছিল অন্য এক স্নায়ু যুদ্ধ। যার ফসল নিঃসন্দেহে 'এলিয়েনেশন'— বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং আত্মসর্বস্বতা। অস্তিত্বের সংকট বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে নিরন্তর সংগ্রাম অথচ জীবনের মূলস্রোত থেকে বারবার কেন্দ্রচ্যুতি জনিত এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ।

বিপর্যয় যেমন একা আসে না, তেমন একটি যুগের অসুখও স্থির থাকে না একটিমাত্র বিন্দুতে। কাজেই বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং অস্তিত্বের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মধ্যবিত্তের অবক্ষয়। বাংলা তথা ভারত অথবা সারা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ভয়াল দাপট আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছিল নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কও। যৌনসম্পর্ক চিত্রণের এক দুঃসাহসিক প্রয়াস দেখা গিয়েছিল সমকালীন সাহিত্যে। ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বাদর্শে যৌবনের বেদনা হাহাকার বা অবক্ষয়ের কথা খোলাখুলি ভাষায় বলতে শুরু করলেন তৎকালীন লেখকগোষ্ঠী, যাঁদের অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন নিঃসন্দেহে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এস্টাব্লিশমেন্ট বিরোধিতা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাবও মাথা চাড়া দিয়েছিল যুগধর্মের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। অর্থাৎ, ফুল-পাখি-বাতাস জর্জরিত নিছক রূপকথার জগৎ নয় কিংবা অভিজাত শ্রেণী বা কুলীন সমাজের রোমান্টিক ভাববিলাস নয়। কঠিন গদ্যে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের পালিশবিহীন সংলাপ। বাঁধা গত ছেড়ে নতুন কিছু গড়ে তোলার চিন্তাভাবনার রেখা ফুটে উঠল বাংলা সাহিত্যের ক্যানভাসে।

কল্লোলপর্বেই এই যুগধ্বনি শোনা গেলেও এর পরিণতি 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। চার ও পাঁচের দশকের সাহিত্যে রচিত হতে থাকে যুদ্ধোত্তর জীবনের ফলশ্রুতি। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে দেশীয় ঐতিহ্য ও জনজীবনে সার্বিক ভাঙন অবসাদ ও অবক্ষয়ের চিত্রটি যথাযথ ধরা পড়ে পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন 'পরিচয়' পত্রিকায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজাত কল্লোলপর্বে ছিল যুদ্ধ সম্পর্কে খণ্ড অনুভূতি এবং রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে অন্ধকারে আলো হাতড়ানোর নিরন্তর প্রয়াস। পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এবং অনৈক্যের ও বিভেদের ছবিটি দেখা দিল আরও প্রকটরূপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামক মহাপ্রলয়ে ধরাশায়ী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের প্রতিভূস্বরূপ কথকের লেখনীতে ধরা পড়ল সময়ের নির্বেদ বিশ্লেষণ।

কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্য যেমন কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তেমনই নির্দিষ্ট দল বা মতবাদ প্রচারও তার লক্ষ্য নয়। তার একটাই লক্ষ্য— মানবতা। মানবতার লক্ষ্যে আর্ত চিৎকার, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার বেদনা অথবা লক্ষ্যে পৌঁছনো। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও জীবনধর্মের সঠিক পদসঞ্চারটি অক্ষরবন্দি করাই সাহিত্যের নিয়তি। কাজেই 'পরিচয়' কোনো বিশেষ দলের হাতিয়ার হয়ে পড়লেও দলনিরপেক্ষ এক রাজনৈতিক ঐতিহ্যকেই বহন করেছেন তৎকালীন লেখকগোষ্ঠী।

বাংলা কথাসাহিত্য এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আলোচনার বিষয় হলেও এই পর্বে বলে রাখি, বাংলা কবিতা বা কবিকুল সম্বন্ধে উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ রয়ে যায় বিশ শতকের সাহিত্যভাবনার মোড় বদলের যুগসূচি। বস্তুতপক্ষে দুই মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য প্রত্যক্ষত বামপন্থী আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে পড়ে। মার্কস-এঙ্গেলস রচিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' কিংবা লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থ এবং 'সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের শেষ ধাপ' দখল করে বসে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মনন ও চিন্তন প্রক্রিয়া। তারই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 'পরিচয়', 'অরণি' ইত্যাদি পত্রিকার রচনাগুলিতে। এমনকি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাও তার ব্যতিক্রম ছিল না (কবিতা পত্রিকার ১৩৪৯ সালের চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ফুল-পাখি-চাঁদ-এর স্থান নিল কাস্তে-হাতুড়ি-তারা। প্রেম-বিরহ-মিলনের পরিবর্তে শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী প্রতিরোধ। একদা যাঁরা গান্ধি, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বামী বিবেকানন্দের বন্দনাধর্মী কাব্যরচনা করতেন, তিনের দশকের প্রান্তে এসে তাঁদের রচনার ধারা হঠাৎ পাল্টে গেল। শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ, নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন, হিটলারের নাৎসি বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিবাদ এবং জাপানি আগ্রাসনের নিন্দা— এসবই রচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। উপন্যাস, নাটক অপেক্ষা কবিতাতেই যেন এই হাওয়া বদলের জোয়ার লাগল বেশি।

যদিও কবি নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাতেই পাওয়া গিয়েছিল এই বাঁধভাঙা সাম্যবাদের উচ্ছ্বাস, তবুও নব্য ভাবধারায় পুরোপুরি মার্কসীয় দর্শনে উদ্বুদ্ধ যেসব কবি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ছাপ রাখলেন তাঁদের রচনায়, তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। উপন্যাস নাটক অপেক্ষা কবিতাতেই এই পরিবর্তনের হাওয়া যেন বেশি করে অনুভূত হল।

মার্কস বলেছিলেন, সর্বহারা অর্থে নিছক খেটে খাওয়া মানুষ নয়। কেবলমাত্র 'শ্রম'-ই যাদের জীবনযাপনের মুখ্য অবলম্বন, সর্বহারা তারাই। এই সর্বহারাদের বা যুদ্ধান্তিক নিঃস্ব শ্রমিকশ্রেণীর কথা কবিতায় তুলে ধরতে কেউ নিয়েছিলেন শ্লেষ-বিদ্রূপ-চটুলতার আশ্রয়, কেউ সোচ্চার হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ আক্রমণে। 'এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে'— এই ছিল প্রতিবাদী কবিদের সময়দর্পণ। কিছু মুগ্ধতা কিছু বিস্ময় এবং আবেগে হয়তো এ সময় অনেকের কবিতা নিছক সাম্যবাদের উচ্ছ্বাস হয়ে উঠেছে। ধরা পড়েনি মার্কসীয় দর্শনের সামগ্রিক রূপ। তবু কখনো কখনো কেউ কেউ স্থির প্রত্যয়ে যে উপনীত হতে পেরেছেন, এ কথা অনস্বীকার্য। সমর সেনের একটি কবিতা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : 'পথে বাধা পর্বত আকার, ঘুণধরা আমাদের হাড়,/শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু/আশা আছে বাঁচবার।/যারা মাঠে ঘাটে, উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে/মাছ ধরে যারা আনে হাটে, ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা/আনে যারা নগরিয়া ঘরে-ঘরে/সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,/তাদের মিতালি খুঁজি,/তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,/হয়তো মলিন/নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,/তবু তারা কালের সারথি, তাদের দোস্তি তাদের গতি/আমার পরমা যতি।' (গৃহস্থ বিলাপ: তিনপুরুষ কাব্যগ্রন্থ)।

বস্তুতপক্ষে রুশ বিপ্লবোত্তর মার্কসবাদের প্রভাবে শ্রমজীবী বা বিত্তহীন মানুষের সঙ্গে এই আত্মীয়তাবোধ চারের দশকের সৃষ্টিশীল সাহিত্যে এনে দিল এক মহাবিপ্লব। বেকার সমস্যা, শিল্পোদ্যোগে ঘাটতি, এ সবই বিষয়বস্তু হয়ে উঠল কবিতা তথা সাহিত্যের।

বলা বাহুল্য, বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী আদর্শের ছোঁয়া বাংলা গল্প-উপন্যাসে ছায়া ফেলে দেরিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ এবং তেভাগা আন্দোলনের পরে। এই সময় অর্থাৎ দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে এবং পরে বেশ কিছু প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকের আবির্ভাব ঘটে। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞানমনস্ক নিরপেক্ষতায় সময় এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ নিপুণ আন্তরিকতায় বিধৃত হয়েছে যাঁদের রচনায় তাঁরা হলেন নিঃসন্দেহে জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমসাময়িক তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এ আলোচনায় অনুক্ত রাখাই বিধেয়। কেননা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দুই সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যে এঁদের দান বা বলিষ্ঠতা ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত (তবু জ্যোতিরিন্দ্রের কলমে প্রকৃতি প্রসঙ্গ আলোচনায় অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বিভূতিভূষণের নাম। সে আলোচনা পরে)। সেক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র জগদীশ এবং মানিকের ভাবানুসারী, এ কথা বলা চলে।

জ্যোতিরিন্দ্র নিজে অবশ্য তাঁর রচনায় অগ্রজের কোনো প্রভাবের কথা স্বীকার করেননি। কিন্তু কয়েকটি বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যের কারণে জ্যোতিরিন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনায় আবশ্যিক হয়ে পড়ে উপরোক্ত দু'জনের নাম। একদিকে মনোবিকলন তত্ত্ব, ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব অনুসারী মানব-মানবীর প্রণয় সম্পর্কের জটিলতা, (যদিও মানিকের রাজনীতি সচেতনতা জ্যোতিরিন্দ্রে অনুপস্থিত) অন্যদিকে ন্যায়-নীতি কল্যাণ— পৃথিবীর যাবতীয় শুভ অস্তিত্বের প্রতি জগদীশের নেতিবাচক মনোভাব, এ দুই লক্ষণে প্রবলভাবে আক্রান্ত জ্যোতিরিন্দ্রের রচনা। বৈশিষ্ট্যগুলি সময়োচিত ব্যাধির লক্ষণও বটে।

জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায় যুগলক্ষণের সন্ধানে অনিবার্য হয়ে পড়ে আরও একটি নাম। তিনি কবি জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ কি 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' পড়েছিলেন? আমরা জানি না। তাঁর কাব্যে কোথাও সোচ্চার ঘোষণা নেই তার। বরং সর্বত্র এক গভীর অবসাদ, রিক্ততা ও নিঃসঙ্গতা বোধ। সকলের মধ্যে থেকেও একা হয়ে যাওয়ার বেদনা, নশ্বর জীবনের প্রতি বিপন্ন বিস্ময়ে লগ্ন হয়ে থাকার অনুভূতি, সর্বোপরি এক অসম শ্রেণীযুদ্ধ হয়তো বা স্নায়ুযুদ্ধের চাপ অনুভূত হয় তাঁর কবিতায়। জ্যোতিরিন্দ্রও সামগ্রিক ভাবে রাজনীতি-মনস্ক ছিলেন না। মূলত শ্রমজীবী এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা বিত্তহীনদের কথা বললেও প্রবল সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমরা পাই না জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায়। পাই জীবনানন্দীয় রিক্ততা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও গভীর অবসাদ— যুদ্ধ পরবর্তী সমাজজীবনে যা মানুষগুলির দেহ-মনে এঁকে দিয়েছিল এক সুনির্দিষ্ট জন্মক্ষত।

এই যুগলক্ষণকে সামনে রেখে পরবর্তীকালে যাঁরা সাহিত্যচর্চার স্বতন্ত্র ধারাকে অব্যাহত রাখলেন তাঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম।

আদতে জ্যোতিরিন্দ্রের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দু'বছর আগে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। সেক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি ছিল দুটি বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি। এমনতর প্রেক্ষিতে সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন মানুষের চেতনা ও মূল্যবোধ, মূল্যবোধের অবক্ষয় রিক্ত নিঃসঙ্গ প্রকৃতি, প্রেম-অপ্রেম-যৌনতা চিত্রণ জ্যোতিরিন্দ্রের কলমে এক স্মরণীয় উদ্ধার।

বলেছিলাম জমি দখলের কথা। এক চিলতে জমির জন্য কিংবা ছোট্ট একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই বা বাসস্থান এবং সামান্যতম পরিধান ও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমরা লড়াইয়ে সামিল হই। এ তো গেল স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত লড়াই। আরো এক জাতের লড়াই আছে যা পরিকল্পনাপ্রসূত। রাষ্ট্রনায়ক এবং ধুরন্ধর কূটনীতিকদের ক্ষমতা দখলের লড়াই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এদেশে গণআন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছিল, কিন্তু পরস্পর যুযুধান দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। অর্থ এবং মনুষ্যত্বের সার্বিক অভাব বা অনটনের বাজার তাই দুই মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত ফসল। এই বাজারে মানুষেরই হাটে পণ্য হয় মানুষ। দেশভাগের বিক্ষত বুকে বাস্তুহারার দল এক টুকরো জমির আশায়, সামান্যতম আশ্রয় ও আহার্যের জন্য হারাতে থাকে প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ মমতা-প্রীতি সংস্পর্শের সবুজ জমি। সেই হৃতসর্বস্ব মানুষের বা মনুষ্যেতর প্রাণীগুলির জীবনের হলুদ বিবর্ণতা শেষ পর্যন্ত দখল করতে সমর্থ হয় জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্যভূমি। তাই 'ক্ষয়িষ্ণু-সময়ের সার্থক কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র'— এমন এক আপাত অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তাঁকে।

অমাবস্যার আকাশে চাঁদের উদয় সহসা হয় না। হলেও সকলের দৃষ্টিপথে পড়ে না তা। আবার, যা কিছু দৃষ্টিগোচর তার সবটাই সত্য নয় হয়তো। পূর্ণিমা-দিনের সাদা ফটফটে জ্যোৎস্নার অবিরাম গুণকীর্তনেও একঘেয়েমি আসে। কেননা চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। শতধাবিকীর্ণ আলোর আড়ালে সেই সত্যটা যে না দেখেছে— তার দৃষ্টির দৈন্য ঢাকা থাকে না শুক্লপক্ষের আলোতেও। দেশ-কাল-প্রকৃতির প্রতি এই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিপাতই বিজ্ঞানমনস্কতা।

বিশ শতকে বিজ্ঞানের জয়ধ্বনিতে মানুষের শক্তি যেমন অবহেলিত হয়েছিল, তেমনই মানুষকে এক সুদূরপ্রসারী চেতনলোকে পৌঁছে দিয়েছিল এই বিজ্ঞানই। বড় নির্মম এবং নিরাবেগ অভিঘাতে হাট করে খুলে দিয়েছিল তার বহির্বিশ্ব এবং অন্তর্বিশ্বের দরজা। হয়তো সেক্ষেত্রে মানুষের দেখার জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল বৌদ্ধিক যুক্তিবাদ। গ্রাস করেছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলি। তমসাচ্ছন্ন সেই গ্রহণকালের লিপি উদ্ধারে কে কতখানি সফল হলেন তার থেকেও বড় কথা কে কীভাবে এই সময়কে ধরলেন।

বস্তুতপক্ষে সময়ের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সময়ের দাসত্ব করা কোনো স্রষ্টার কাজ নয়। সাহিত্যের পূর্ণকুম্ভে তাঁর যাত্রা অব্যাহত অনির্দিষ্টকালের জন্য। তাই একটি বিলম্বিত নিকষ কালো রাত প্রদক্ষিণ করে অলৌকিক কোনো ভোরের প্রতীক্ষাই তাঁর নিয়তি। তাই বাঁধা সময়ের নিছক আনুগত্য নয়। মামুলি সাদাকালো রেখায় সময় বিভাজন নয়। বিচিত্র রঙ ও রসের সমন্বয়ে অন্তহীন সময়ের সঙ্গে আপোসহীন খেলাই পূর্ণতা দান

করতে পারে শিল্প এবং স্রষ্টা, উভয়কেই। কাজেই বুদ্ধির রক্তচক্ষু কিংবা হৃদয়াবেগের তরল উচ্ছ্বাস নয়, চূড়ান্ত জ্ঞানই পৌঁছে দিতে পারে চূড়ান্ত বোধিতে। আর বিজ্ঞান তো কতকগুলি জ্ঞানেরই সমাহার মাত্র।

সৃষ্টিকর্মে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সেই সময়কে ছাপিয়ে উঠেছিলেন কি না, সে প্রশ্নের আশু সমাধানে না গিয়েও বলা যায় একটি যুগচিত্রকে সঠিক ব্যাখ্যায় তুলে ধরা ছাড়াও নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি বনাম নারীসৌন্দর্য অনুসন্ধানে সদাব্যাপৃত ছিল শিল্পীর দ্বিতীয় সত্তা। সেখানে তিনি নিজেই একজন প্রেমিক।

এই প্রেমিক প্রবল কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসের ধারক নন। মহাযুদ্ধ পরবর্তী দিশেহারা আর্থ-সামাজিক রণভূমিতে দাঁড়িয়ে গভীর কোনো তত্ত্বকথা তিনি বলেননি। সৃষ্টি করেননি জোরালো ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলিষ্ঠ কোনো নেতা বনাম নায়ক চরিত্র। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক মধ্যবিত্ত সমাজ, মধ্যবিত্ত মানুষ। গভীর অবসাদ এবং প্রত্যয়হীন অন্ধকার থেকে উঠে আসা মানুষ। কিন্তু এই সার্বিক ভাঙনের মধ্য দিয়েই বড় কৌশলে অনায়াস দক্ষতায় বিপন্ন এক আত্মজিজ্ঞাসায় উপনীত করেন তিনি। আত্মজিজ্ঞাসা বনাম আত্মবিশ্লেষণ। আত্মশুদ্ধিও বটে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের জটিল রসায়ন শেষ পর্যন্ত লেখকের আত্মানুসন্ধানের লক্ষ্যবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিক জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায় আত্মার যে মর্মভেদী চিৎকার আমরা শুনতে পাই, তা কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদীর হলেও আদতে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসার সকরুণ আর্তিও বটে।

ধনু বনাম জ্যোতিরিন্দ্র : গুটিপোকা থেকে নীল নিথর প্রজাপতি

এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা ছিল না। তবু চলে গেলেন। তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ক্রমাগত মৃত্যু আর অবক্ষয়ের কথা বলতে বলতে প্রেম এবং অপ্রেমের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে 'প্রেমের চেয়ে বড়' কিছুর সন্ধান করতে করতে কখন নিজেই মৃত্যুকে ডেকে এনে শিয়রে স্থান দিলেন, সম্ভবত তিনি নিজেও তা জানতেন না।

রবীন্দ্রনাথ কিংবা এ কালের অন্নদাশঙ্করের আয়ু হয়তো সকলে পান না। কাজেই সমবিচারে না গিয়েও বলা যায় মৃত্যু যদি ত্বরান্বিত না হতো তা হলে পূর্ণকুম্ভ সাহিত্যের পাকদণ্ডি পথে জ্যোতিরিন্দ্রের যাত্রা আরো ভিন্নতর মাত্রা পেত। তন্নিষ্ঠ সাহিত্যপ্রেমীর আরো কিছু পাওয়ার ছিল তাঁর কাছে। কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার নিরসন নয়, তীব্র অনন্বয়ের বিপরীতে হৃদয়ের সমন্বয়। একজন সাধকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধনাও তো ব্যাহত হয়। বঞ্চিত হই আমরা। যারা হৃদয়বিলাসে জর্জরিত না হয়েও হৃদয় থেকে উৎসারিত কোনো মূল্যবান প্রহরের অপেক্ষায় দিন যাপন করি।

আবার এ-ও ঠিক, নিছক শরীরী মৃত্যুতে একজন শিল্পীর সৃষ্টি হারিয়ে যায় না। পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় তাঁর জীবনযাপন তাঁর কর্মধারা, ধ্যান ও বিশ্বাসের প্রতিটি পর্ব থেকে উঠে আসছে গল্প-কাহিনী-কবিতা।

খুব বর্ণময় চরিত্রের মানুষ ছিলেন না জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। খুব সুপুরুষ, সুবক্তা কিংবা প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্নও নন। বরং উল্টোটাই ছিল তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। নিতান্ত শৈশবেই সৃষ্টির নিঃসঙ্গতা সম্ভবত পেয়ে বসেছিল তাঁকে। তিনি ছিলেন আড্ডাবিমুখ, নির্জনতাপ্রিয়, নৈঃশব্দ্যবিলাসী এক কল্পজগতের বাসিন্দা। বস্তুত বিমুগ্ধ প্রকৃতিপ্রেম, প্রখর ঘ্রাণশক্তি এবং তীব্র সংবেদনশীলতা এই তিনের সমন্বয়ে বালক ধনু থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের বেড়ে ওঠা।

অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলা শহরের ডাকঘরে পোস্টমাস্টার কোয়ার্টারে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্ম ১৩১৯ সনের ৪ঠা ভাদ্র (ইংরেজি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট)। ডাকনাম ছিল ধনু। তাঁর মাতামহ ছিলেন কুমিল্লার পোস্টমাস্টার। জন্মের বছরখানেক পরেই চলে আসেন কুমিল্লার মহকুমা শহর ও পৈতৃক বাসভূমি ব্রাহ্মণবেড়িয়া

গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণবেড়িয়া হাইস্কুলের শিক্ষক। পরে ওকালতি পেশায় নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মণবেড়িয়াতেই জ্যোতিরিন্দ্র সাত-আট বছর বয়সে প্রথম মাইনর স্কুলে ভর্তি হন।

আশৈশব তিনি ছিলেন মিতবাক, আত্মমগ্ন এবং ভাবুক প্রকৃতির। গ্রামের অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তাঁর জীবন কেটেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়। শৈশবের দামালপনা, খেলাধূলা কিংবা উৎসব অনুষ্ঠান, যাত্রা-মেলার প্রতি আগ্রহ তাঁর কোনোকালে ছিল না। তাঁকে আকর্ষণ করত জনমানবহীন নির্জন প্রান্তর, পুকুরঘাট, মাথার উপর ডানামেলা লাল টুকটুকে আকাশ। বিশাল অট্টালিকা অপেক্ষা ছোট্ট একটি চারাগাছের বেড়ে ওঠা, পাখির ডাক, পোকামাকড়ের গন্ধ তাঁকে আবিষ্ট করত বেশি। আরো আবিষ্ট করত 'আশ্বিনের কোনও নির্জন ঊষায়, হেলিডি সাহেবের বাগানের দুটি শিশির-ভেজা গোলাপ'। ('আমার সাহিত্য-জীবন আমার উপন্যাস', দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২)। কুমিল্লা জেলার ছোট মফস্বল বনাম আধা শহরে জগৎটি স্থানমাহাত্ম্যে বিশেষ গৌরবান্বিত না হলেও কিশোর জ্যোতিরিন্দ্র ওরফে ধনু-র ব্যক্তিক অনুভূতি, প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা শহরতলির এই প্রাকৃতিক পরিবেশেই খুঁজে নিয়েছিল সহজাত মুক্তির স্বাদ। ঠাকুর্দার সঙ্গে একদিন খাল-বিল-ধানক্ষেত পেরিয়ে হেলিডি সাহেবের গোলাপ বাগানে বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন কুসুমভোরের রাঙা আলোয় উদ্ভাসিত দুটি সদ্য ফোটা সাদা গোলাপ ও অনতিদূরে এক আধফোটা কলির মুখে উপবিষ্ট সোনালী নীল প্রজাপতি।

বাস্তবিক, ''মাঠ-ঘাটের অবকাশ কিংবা শহরের আলো-উত্তেজনা গভীরে যাকে টানেনি এই হাওয়ায় কাঁপা দুটি গোলাপ ও আফোটা কলির ওপর প্রজাপতির ধ্যান তাকে গভীরে টানলো। আর টানলো তার গন্ধ, অত্যন্ত মৃদু কোমল গন্ধ। এই হলো তার প্রথম 'অভিজ্ঞতা'। দ্বিতীয় 'অভিজ্ঞতা'টি হলো মামার বাড়িতে সমবয়সী দুই মামার দেওয়া উপহার। রঙবেরঙের ক'টা পাখির পালক, ক'টা বালি-পাথর আর একরাশ শুকনো বকুল। সেই শুকনো বকুলের বাসি গন্ধ তাঁর ঘ্রাণ-চেতনাকে জাগিয়ে দিলে।'' (ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প) বোধহয় সেদিন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রূপ-রস-গন্ধময় প্রকৃতির তীব্র সংবেদনায় প্রেম-সৌন্দর্যের পথে বালক ধনুর বিরামহীন যাত্রা। বিশেষত শৈশবে জ্যোতিরিন্দ্রের ঘ্রাণেন্দ্রিয় এত সজাগ ছিল যা পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় এক অতিরিক্ত মাত্রা দান করে।

পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র জানিয়েছেন, ''কোর্ট-কাছারি, হাসপাতাল, বাজারের পরিবেশে আমাদের বাসা ছিলো। ওর গন্ডি পার হলেই একদিকে শান্ত-স্নিগ্ধ তিতাস নদী, অন্যদিকে ধানক্ষেত পাটক্ষেত এবং এই ছোট্ট শহরটা ঘিরে অফুরন্ত সবুজের সমারোহ। এসব দেখতে খুব ভালো লাগতো। পুকুরঘাট, ডালপালা ছড়ানো ঝুপসি মতো শ্যাওড়াগাছ, লাল ফড়িংয়ের ওড়াওড়ি, তিতাসের বুকে নৌকাদৌড় প্রতিযোগিতা, দুর্গাপ্রতিমার ভাসান, মৌরলা খলসের আঁশটে গন্ধ, ভোরের বাতাস—এসব নিয়েই আমার ছোটবেলা।'' (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি)

মুখ্যত জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন প্রকৃতির সন্তান। বিশাল মহীরুহ, দিক্‌চিহ্ন বিহীন সমুদ্র

বা দিগন্ত বিস্তৃত পরিধি নয় সে প্রকৃতির। শৈশবে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি যেমন তাঁকে আকর্ষণ করত, পরবর্তীকালে শহর কলকাতার নাগরিক জীবনে মাপা বৈভবের মতো খণ্ড অপসৃয়মান প্রকৃতিও ছায়া ফেলেছে তাঁর চেতনায়। ছোট্ট ডোবা, পুকুর, ঝোপ-জঙ্গল, কুয়োতলা, পুরুলগাছ, ঘাসফড়িং এমনকি জোনাকিও তাঁর লেখনীস্পর্শে নাগরিক কলকাতার ঘন অন্ধকারে মৃদুমন্দ আলোর উদ্ভাসে আশা-নিরাশা আন্দোলিত জীবনের মায়া সঞ্চারিত করে। আবার প্রকৃতি ছাড়া যেমন জ্যোতিরিন্দ্রের জীবন তথা সৃষ্টিকে ভাবা যায় না, তেমনই প্রকৃতি ছাড়া নারী-রূপ বর্ণনা পূর্ণতা পায় না তাঁর কাহিনীতে। প্রকৃতি এবং নারী জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টিতে মিলেমিশে একাকার।

একসময় প্রকৃতিকে রঙ তুলির সাহায্যে ছবিতে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। কৈশোরে কিছুদিন কাব্যচর্চাও করেন। সম্ভবত তাঁর শিক্ষক বিপিনবিহারী বর্ধন-এর উৎসাহে। তখন অন্নদা হাইস্কুলে পড়তেন। জ্যোতিরিন্দ্র জানিয়েছেন, "তখন আমার বয়স এগারো, একদিন কবিতা পড়া বন্ধ করে মাস্টার মশাই আমাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, তোরাও কবিতা লিখতে পারিস। পারবি। চেষ্টা করে দেখ না। চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। তাই তো, এমন কথা তো কেউ বলে নি, এ ধরনের কথা কারো মুখে তো শুনি নি। বুকের ভিতর যেন বাজনা বেজে উঠল। তোরাও পারবি কবিতা লিখতে। চেষ্টা করে দ্যাখ। আর কেউ চেষ্টা করেছিল কি না জানি না। তার প্রমাণ পাইনি।" (আমার সাহিত্য জীবন)

এরপর খাতা ভর্তি কবিতা নিয়ে যথারীতি মাস্টারমশাই-এর সামনে হাজির হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। এবং খুশিতে উচ্ছ্বসিত মাস্টারমশাই ছাত্রের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, "লিখে যা, তুই পারবি"।

উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী জানিয়েছেন, ওই একই স্কুলে পড়তেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' খ্যাত সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তিনি বলেন, "আমরা যখন ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ছাত্র তখন দুজনের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। বড়লোক উকিলের বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আর দরিদ্র মালোর সন্তান অদ্বৈত মল্লবমর্ণের। দুজনেই বেশ খ্যাতি পাচ্ছেন। জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন আমার চেয়ে এক বছরের উঁচু ক্লাশে পড়া ছাত্র। অদ্বৈত এক বছর পরের। অদ্বৈত লিখতেন কবিতা, জ্যোতিরিন্দ্র কখনও কবিতা লেখেননি।" (অদ্বৈত মল্লবর্মণ : একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত) বলা বাহুল্য, দুটি পরস্পরবিরোধী বিবৃতিতে পাঠকমনে সংশয় জাগতেই পারে। তবে এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের স্বীকারোক্তি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে আমার মনে হয়।

যাই হোক, কবিতা কিংবা ছবি আঁকা শেষ পর্যন্ত কোনোটাই টেনে রাখতে পারেনি জ্যোতিরিন্দ্রকে। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অমোঘ আকর্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত রূপ পায় গদ্যশরীরে। যদিও সেই গদ্যভাষায় অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে কবিতার চোরাস্রোত। কোথাও কোনো কাহিনীতে ছোট টুকরো বাঙ্ময় কবিতাও উপহার দিয়েছেন তিনি।

একসময় নাটকেও অভিনয় করেন জ্যোতিরিন্দ্র। দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসাও অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিনয় ছেড়ে দেন। নাটক দেখারও উৎসাহ বোধ করতেন না। সারা জীবনে দশ-বারোটির বেশি সিনেমাও দেখেননি জ্যোতিরিন্দ্র। তবে নাটক

থিয়েটার সম্পর্কে অতিমাত্রায় প্রভাবিত থাকার ফলে 'একটি একাঙ্ক নাটক'-এর মতো গল্প লেখেন।

ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন জ্যোতিরিন্দ্র। যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন মাইনর স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বাবার উৎসাহে শেখা কবিতা আবৃত্তি করে সভা জমিয়ে দেন। শিক্ষকরা বাহবা দেন। রীতিমতো উঁচু ক্লাশের বড় বড় ছাত্রদের হারিয়ে প্রথম পুরস্কার পেয়ে যান বালক জ্যোতিরিন্দ্র। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁর জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। এরপর থেকে সাহিত্য শিল্পকলার প্রতি এক স্বাভাবিক টান তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। নিয়মিত আবৃত্তি চর্চার মাধ্যমে পরিচিত হতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ, কামিনী রায়, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুকুমার রায়—এঁদের অসংখ্য কবিতার সঙ্গে। নিজেও কবিতা লিখতে শুরু করেন স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। এইভাবে সাহিত্যচর্চার শুরু। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' পড়ে ছোটগল্প বা গদ্য রচনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন তিনি।

জ্যোতিরিন্দ্রের শৈশব কৈশোরে ভাললাগার বইগুলি হল রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কন' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'। এ ছাড়া জলধর সেনের লেখা 'বিশু দাদা', 'পাগল', 'অভয়া', যতীন্দ্রমোহন সিংহের এককালের বিখ্যাত বই 'ধ্রুবতারা' ইত্যাদি পারিবারিক সম্পর্ক সমৃদ্ধ কাহিনী প্রাণিত করে তাঁকে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা সমাজ-সংসারের চেনাজানা মানব-মানবীর আশা-আকাঙ্ক্ষার রহস্যঘন কথাই তাঁকে আকর্ষণ করেছে বেশি। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রতি অনুরাগও একই কারণে। তা ছাড়া জীবনেব পরিণতিপর্বে এসেও রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, চার অধ্যায়, ঘরে বাইরে উপন্যাস পড়তে ভালো লাগতো তাঁর।

লেখালেখির জীবনে কোনোদিন অগ্রজের প্রতি ঋণ স্বীকার করেননি জ্যোতিরিন্দ্র। 'একেবারে নিজের মতন করে' লিখেছেন প্রতিটি গল্প-উপন্যাস। তাঁর আত্মশক্তি প্রাণিত করেছে তাঁকে। প্রতিটি সাক্ষাৎকারে এ কথা বারবার বলেছেন তিনি। পড়াশোনার পরিধি খুব বেশি না হলেও সমসাময়িক লেখা তিনি পড়তেন। বিদেশি লেখকদের মধ্যে হেমিংওয়ে, চেকভ, কাফকা, সমারসেট মম পড়েছেন। তা-ও সমগ্র নয়, অংশবিশেষ। আদতে বসে বসে পড়ার ধৈর্য জ্যোতিরিন্দ্রের ছিল না। বিশেষত প্রবন্ধ বা উপন্যাস পড়াতে কোনোকালেই আগ্রহ বোধ করতেন না তিনি।

দেশীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও মানিক, বিভূতি সর্বোপরি জীবনানন্দ দাশের লেখা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তেন জ্যোতিরিন্দ্র। এবং তার আভাসও তাঁর রচনায় আমরা পাই। জীবনানন্দ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রেব অকৃত্রিম দুর্বলতা পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসে পড়াবে। বিভূতিভূষণের (বন্দ্যোপাধ্যায়) সৃষ্টি তাঁকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করত সে প্রসঙ্গে 'পুঁইমাচা' গল্প সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য স্মরণযোগ্য—"... বিভূতিবাবুর 'পুঁইমাচা', হঠাৎ একদিন একটা কাগজে গল্পটা পড়ে ফেলি। তারপর কী করি জানো? ব্লেড দিয়ে গল্পটা কাগজটা থেকে কেটে নিয়ে মাথার বালিশের নিচে রাখি। মানে প্রায়ই পড়ব আর কি। মানে, সে সময় ঐ গল্পটা যে কতবার পড়েছি সে বলবার নয়।..." (প্রতিবিম্ব)।

অথচ কিছু কিছু সাদৃশ্যগত বিচারে জ্যোতিরিন্দ্রের রচনা প্রসঙ্গে যাঁর নাম বারবার

এসে যায় সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখালেখি নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন না তিনি। জ্যোতিরিন্দ্রের কথায়, "মানিকবাবুর বেশিরভাগ লেখাই আমার ভালো লাগে না। কিছু কিছু লেখা ভালো লাগে, যেমন—'প্রাগৈতিহাসিক'। স্তব্ধ হয়ে যাই। কিন্তু ওনার অন্যান্য লেখা নিয়ে অনেক বেশি হৈ চৈ ফেলা হয়েছে।" (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি : নতুন সময়)।

সমকালীন আরো এক স্বতন্ত্রধারার লেখক কমলকুমার মজুমদারের রচনাও ঘোরতর অপছন্দ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রের। কমলকুমারের জটিল গদ্যই এই বিরূপতার কারণ বলে জানা যায়। তাঁর অপছন্দের তালিকায় অন্য এক জনপ্রিয় এবং অগ্রণী লেখক হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কমলকুমারের জটিলতা এবং শরৎচন্দ্রের ভাবালুতা দুটোই অপছন্দের কারণ বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রের স্বভাবধর্মেই নিহিত ছিল। বিচিত্র মানবমনের জটিল রূপায়ণে যাঁর অনায়াস সিদ্ধি, বাহ্যপ্রকৃতিতে সেই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত সহজপ্রাণ, নৈর্ব্যক্তিক। জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজ, সাধারণ মাপের। জীবন ও কর্মের এই বৈপরীত্য নিয়েই জ্যোতিরিন্দ্র।

'কল্লোল'-এর লেখক গোষ্ঠী অর্থাৎ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুর লেখাও প্রিয় ছিল জ্যোতিরিন্দ্রের। সাগ্রহে পড়তেন বিমল মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনাও। সমসাময়িক লেখককুলের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সহমর্মিতা ছিল তাঁর। লেখার ক্ষেত্রে কোনোরকম গোষ্ঠীবাদী মতবাদে বিশ্বাস ছিল না জ্যোতিরিন্দ্রের। জোট বেঁধে আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না—এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি। সাহিত্য হ'ল লেখকের সম্পূর্ণ একক প্রয়াসের ফসল, এই বিশ্বাসে স্থিতধী লেখক কোনোদিন কোনো গোষ্ঠীর ছায়ায় আশ্রয় নেননি। সভাসমিতিতেও যেতেন না বিশেষ। ঘরের কোণে টেবিলের উপর ঘাড় গুঁজে কেবল লেখার চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন আজীবন।

লেখালেখির জীবনে বা পুরোপুরি সাহিত্যিক হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বে যিনি জ্যোতিরিন্দ্রকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন, তিনি তাঁর বাবা। ছোটবেলা থেকেই বালক ধনুব বই পড়া, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা সব ক্ষেত্রেই ছিল বাবার অবাধ প্রশ্রয়। কোনো সময়েই ভাটা পড়েনি সেই উৎসাহে। প্রথম জীবনে স্কুলশিক্ষক ও পরবর্তীকালে ওকালতি পেশায় লিপ্ত মানুষটি ছেলেকে নিছক পুঁথিপড়া বিদ্যার্জন ও স্কুল কলেজের গণ্ডি টপকানোর কাজে বেঁধে রাখেননি। প্রতিদিন আদালত বা কাছারি যাবার সময় এবং বাড়ি ফিরে তিনি ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতেন ছেলেকে। ঢাকার ও কলকাতার পত্রপত্রিকা এবং কাগজে জ্যোতিরিন্দ্রের বেশ কিছু লেখা তখন বেরুচ্ছে নিয়মিত। সারাদিন কেবল লেখার চিন্তাতেই কাটে তাঁর। কেমন এক ঘোর লাগা অবস্থায় নিশ্চুপ বসে থাকতেন ঘরটিতে।

এমন সময় একদিন জন্মদাতার গুটিকয় কথা প্রথম মন্ত্রোচ্চারণের মতো উদ্দীপ্ত করল তাঁকে। "তা, একদিন কি হ'ল, বাবা কাছারি থেকে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকার আগে আমার ঘরে ঢুকে বললেন, 'হ্যাঁরে, ঐ যে তুই লিখতিস টিক্‌তিস...তা এখনও লিখিসতো ওটা ছাড়িস না...বুঝলি একদম ছাড়িস না...লিখবি...লিখে যা...।'

...এরপর বললে বিশ্বাস করবে না, যতদিন গল্প লিখতে গেছি, কেবলই মনে হয়েছে টেবিলের পিছনে বাবা দাঁড়িয়ে। আর কেবলই বলেছেন...এ্যাই ওটা ঠিক হ'ল না...কেটে দে...ওখানটা কেটে দে। ঠিক ক'রে লেখ...আবার কেটে দে...আবার লেখ...। উঃ সে মানে তোমাদের ব'লে বোঝাতে পারব না। এরকম বহুদিন বহু লেখায় বাবার উপস্থিতি টের পেয়েছি আর লিখেছি। কেটেছি। আবার লিখেছি। অনেক যত্ন নিয়েছি। ফাঁকি দিইনি একটুও। হলফ ক'রে বলতে পারি। সমস্ত জীবনীশক্তি ঢেলে দিয়েছি।...!" (প্রতিবিম্ব)

একজন লেখকের সামগ্রিক জীবনযাপন এবং তার পদ্ধতিগত বিন্যাস কিংবা অবিন্যাস-এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে মানুষটির আদর্শ, জীবনদর্শন।

স্বভাবধর্মে পুরোপুরি অন্তর্মুখী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিতান্ত শৈশব থেকেই সযত্নে লালন করেছিলেন নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে অকৃত্রিম সখ্য। কাজেই ছোট থেকেই এই গভীর ও গম্ভীর ছেলেটির প্রতি মনোযোগী দৃষ্টিপাত দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি কেউ। বড় বয়সেও সাধারণের সঙ্গে এই নির্মোক দূরত্বই লেখক জ্যোতিরিন্দ্রের সার্বিক পর্যবেক্ষণ শক্তির সহায়ক হয়েছিল, সন্দেহ নেই। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর চেহারা ও ব্যবহার ছিল অবিকল একজন খাঁটি লেখকের মতন। (কলেজ স্ট্রীট)" আদতে কেমন হন একজন খাঁটি লেখক? সুনীল জানিয়েছেন, "তাঁর শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতন, মানুষটি লাজুক স্বভাবের। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অন্য কেউ তাঁর দিকে তাকাবেন না, কিন্তু তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবেন সকলকে। এই সব মানুষই স্রষ্টা হন। কোঁকড়ানো চুল ও পুরু লেনসের চশমা সমন্বিত মুখটি দেখলেই বোঝা যায় এই মানুষটি সাধারণ নন।" (কলেজ স্ট্রীট)

বাস্তবিক সাধারণ ছিলেন না মানুষটি। সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা কিংবা গুছিয়ে সংসার করা, কোনোটিই করে উঠতে পারেননি জীবনে। অথচ শিল্পকর্মের ঘর-গেরস্থালি সাজিয়েছেন নিপুণ দক্ষতায়। কথা বলার সময় খেই হারিয়ে ফেলতেন প্রায়শই। জীবনে কোথাও একটানা চাকরি করেননি কোনোদিন। প্রথম কর্মজীবন কাটিয়েছেন কলকাতার মেসবাড়িতে। তারপর বিবাহিত জীবনে কখনো বেলেঘাটার বস্তি এলাকায়, কখনো বাগমারি রোডে। বহুল প্রচলিত বিখ্যাত উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর চরিত্র ও ঘটনাবলি বেলেঘাটার জীবন-যাপন থেকেই উঠে এসেছে বলে জানান লেখকের সহধর্মিণী শ্রীমতী পারুল নন্দী। পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন পিকনিক গার্ডেনে, সরকারি আবাসনে।

মধ্যবিত্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত 'মধ্যবিত্তের কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' অভিধায় চিহ্নিত মানুষটি লেখক হওয়া ছাড়া জীবনে বড় কোনো স্বপ্ন দেখেননি। প্রায়শই ট্রামে বাসে না চড়ে হাঁটা পথে পথ চলতে ভালোবাসতেন। চলমান শহরের ব্যস্ত মানুষ, শব্দমুখর জীবন, নিঃশব্দে পরিক্রম করতেন আপন খেয়ালে।

প্রসঙ্গত, সুনীল এ-ও জানিয়েছেন, "শুনেছি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটা স্বভাব আছে, মাঝে মাঝে একা একা রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো। কখনো কোনো অপরিচিত পুরুষ বা

নারী বা দম্পতির কোনো একটা বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে লাগলে তিনি নিজের খেয়ালে তাদের অজান্তে তাদের পিছু পিছু অনেকক্ষণ অনুসরণ করেন। এইভাবে তাদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে চলে যান অনেক অচেনা রাস্তায়, তারপর তারা এক সময় হারিয়ে যায়। কিন্তু তারা হারায় না। সেইসব নারী-পুরুষ জানতেও পারে না, একজন তীক্ষ্ণধী মনস্বী লেখক তাদের এই ধুলোকাদায় ভরা ট্রাম-বাসের ভিড়ের রাস্তা থেকে সশরীরে তুলে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন সাহিত্যের অমরলোকে।" (দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬)

ভাবুক আত্মমগ্ন এই মানুষটি কিন্তু ব্যক্তিজীবনে ছিলেন সহজ সরল শিশুর মতো। কেউ দশতলার ফ্ল্যাটে থাকে শুনলেও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। কাল্পনিক ভয়ে আঁতকে উঠতেন নিজেই। "অ্যাঁ? দশতলা? সেখানে থাকতে কেমন লাগে? বৃষ্টির শব্দ পাওয়া যায়?" সম্ভবত মাটির স্পর্শ ও গন্ধ ছেড়ে অত উঁচুতে থাকার ব্যাপারটাই বড় অস্বস্তিকর ছিল তাঁর কাছে।

এ হেন জ্যোতিরিন্দ্র কোনো 'ideology' বা আদর্শ প্রচারের জন্য কোনোদিন লেখেননি। গভীর কোনো তত্ত্বকথা তিনি শোনাননি তাঁর পাঠককে। তবু প্রত্যেক স্রষ্টারই একটা নিজস্ব জীবনদর্শন থাকে। সেই দর্শন উঠে আসে আদর্শবোধ থেকেই। এ বিষয়ে লেখককে প্রশ্ন করা হলে তাঁর স্পষ্ট উক্তি, "...এসব নিয়ে আমি তত মাথা ঘামিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না। তবে লিখতে গিয়ে লেখার চরিত্রের মধ্য দিয়ে যদি কোন কথা বলে টলে থাকি তবে তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়।" (প্রতিবিম্ব)

কিন্তু বলা কথার বাইরেও কিছু কথা থেকে যায়। সেই না বলা কথার অন্তর্লীন মানুষটিকে খুঁজে পেতে অবশ্যই হানা দিতে হয় শিল্পীর একান্ত ব্যক্তিগত ঠিকানা সৃষ্টির আতুঁড়ঘরে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একদা বলেছিলেন, "একটা বুক শেলফ ছাড়া একজন লেখকের ঘরে আর কোন সম্পদ থাকতে পারে না। যদি থাকে তবে বুঝতে হবে তিনি লেখক নন। অন্য কিছু।" বাস্তবিক জ্যোতিরিন্দ্রের পিকনিক গার্ডেন-এর ঘরের চেহারাটি আক্ষরিক অর্থেই মিলে যায় সন্দীপনের কথার সঙ্গে। আসবাব বলতে সেই ঘরে ছিল একটি বুক শেল্ফ, একটি টেবিল চেয়ার ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু পত্রপত্রিকা। আদতে 'Simple living and high thinking' অর্থাৎ জীবনযাপনে সহজ এবং মননে প্রাজ্ঞ, এরকম এক আদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। অন্তত তাঁর ঘরের বাহুল্যবর্জিত আসবাব এবং প্রাত্যহিক অনাড়ম্বর জীবনযাপন, সর্বোপরি কোনো প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ না হয়ে কেবলমাত্র তাঁর সৃষ্টির আবেগ জ্বরতপ্ত হৃদয়ের আদেশে নীরবে এই কথাগুলি বলতে চায় অনুসন্ধিৎসু পাঠককে। আদতে সাহিত্যের জন্য নিঃশব্দে এক সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই জীবনে আদর্শ বলে তিনি জেনেছিলেন।

অথচ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়। অনেক ভাবতেন, লিখতেন কম। সত্তরোর্ধ্ব জীবনেও তাঁর লেখায় তারুণ্য ছিল স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুত লেখনীর মৃত্যু ঘটার আগেই লেখকের মৃত্যু হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারে একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁর কখনও প্রচুর লিখতে ইচ্ছে করে কি না। লেখক সঙ্গে সঙ্গে সরব প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, "না, না। একদম না। চিরকালই খুব যত্নে লিখেছি।

পরিশ্রম না ক'রে একটা লেখাও লিখিনি। তাছাড়া প্রচুর লিখব কী করে। কাটাকুটি মাজা ঘষার তো আর শেষ নেই। একটা গল্প তো প্রায় কয়েকমাস ধরে লিখেছি। এখনও সেই অবস্থা। আমার পাণ্ডুলিপি দেখে সম্পাদকরা তো তাই ভয় পেয়ে যায়।" (চা টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : প্রতিবিম্ব)

প্রসঙ্গত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুজপ্রতিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লেখকের উদ্ধৃতি এখানে অনিবার্য হয়ে পড়ে। গৌরাঙ্গ ভৌমিকের এক প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্র জানান, "...ওই তো আমার এক দোষ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে পারি না। বাইরের ঘটনার সঙ্গে ভেতরের সত্যের মিল খোঁজার চেষ্টা করি। কখনো বা একটা ভাবনা থেকে গল্পের বীজ খুঁজে পাই। কখনো বা একটা ঘটনা থেকে অন্য ঘটনার আভাস। মানুষের ভেতরে বাইরে কত কী-ই বা ঘটছে অহরহ। কত ঘটনা। কত দুর্ঘটনা।" (অনুজের চোখে অগ্রজ : কলেজ স্ট্রীট)। অর্থাৎ নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তি, অন্তঃপ্রকৃতির দ্বান্দ্বিক রহস্যমোচন ও একই সঙ্গে সত্যের প্রতি আনুগত্য বা সত্যের বিচিত্ররূপ উদঘাটন গতিশীল রেখেছে জ্যোতিরিন্দ্রের কলমকে।

একটা অনুসন্ধানী মন নিয়ত উজ্জীবিত করেছে তাঁর সাহিত্যভাবনা। কাজেই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য মানুষ হলেও মানুষের বেঁচে থাকার ইতিহাস জানতে অণুবীক্ষণ দৃষ্টির সাহায্যে ছেঁকে তুলেছেন পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর ইতিহাস। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গাছপালা, বুনো ঝোপ, গিরগিটি, টিকটিকি, বাদুড়, আরশোলা, শালিখ, চড়ুই এমনকি ছোট্ট কাঠ পিঁপড়েটিও বাদ যায়নি তাঁর সৃষ্টিশালা থেকে।

আসলে শিল্পসৃষ্টির জন্য একটা জিনিস খুব জরুরি মনে করতেন জ্যোতিরিন্দ্র। সেটা হল 'পাগলামি'। সমাজ-সংসার ও মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'তে হ'তে একজন ব্যক্তি যখন লেখক হয়ে ওঠেন কিংবা সৃষ্টির ছাপ রেখে যেতে চান শিল্প-শরীরে, তখন তাঁর ক্রমিক রক্তক্ষরণ ও শ্রমের ফসল সমাদৃত হ'ল কি না সে প্রশ্নের কাছে নত না হয়েও শিল্পীকে অব্যাহত রাখতে হয় তাঁর সৃষ্টিধারা। এটাই পাগলামি। এই পাগলামিকে জ্যোতিরিন্দ্র স্বাধীনতার নামান্তর বলে মনে করতেন।

যে মানুষটি যৌবনের প্রথম লগ্নেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রে এমন আপোসহীন সংগ্রাম এমন ক্লান্তিহীন সাধনা হয়তো আশা করাই যায়। কারণ সাহিত্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমাজ ও জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত মানুষের কথাই বলে তা। তবু দুই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে আবির্ভূত একজন শিল্পীর লেখনীতে রাজনীতি বা স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না কেন? কেনই বা তাঁর রচনায় '৪৭ থেকে '৭২-এর টালমাটাল ঘটনাবহুল ছবি তেমন প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট নয়? এই প্রশ্নে অবশ্যই বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয় পাঠককে। লেখকের উত্তর এ ক্ষেত্রেও আশ্চর্যরকম নির্লিপ্ত, উদাসীন। তাঁর মতে, "দেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেকে রক্ত দিয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন, শহীদ হয়েছেন। আমি আমার রচনায় তাঁদের সাধারণ মানুষ হিসেবে যে মানসিকতা তাকে ধরার চেষ্টা করেছি, নেতা বা শহীদ হিসেবে নয়।" (কালপুরুষ। প্রসঙ্গ : নৈশভ্রমণ)। জীবন ও কর্মে আগাগোড়া এই নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিকতা

তাঁর সৃজনশিল্পে সঞ্চারিত হয়েছে সাধারণ মানুষের রূপকল্পে।

সর্বোপরি 'প্রেম' সম্পর্কে তাঁর মতামত কী! জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''এ-প্রশ্ন শুনে একটু হেসে বললেন, এর কি উত্তর দেবো? প্রেম কি সত্যিই বাতিল হয়ে যাচ্ছে? আচ্ছা লিখে নাও, প্রেম মানুষের জীবনের একটা মহৎ অভিজ্ঞতা এবং এর প্রয়োজন আছে।'' (নীল রাত্রি ও বনেব রাজা : দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৬)

এই জ্যোতিরিন্দ্রকে কেন্দ্র করে জীবিতকালেই নানা বিতর্ক দেখা দিয়েছে বারবার। অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে তাঁব সাহিত্যপ্রসঙ্গে। 'মরবিড' আখ্যায় চিহ্নিত হয়েছেন লেখক স্বয়ং। তবু পাঠকমনোরঞ্জনের কথা ভেবে স্বকীয়তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে আসেননি তিনি। প্রসঙ্গত, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৬-এ প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ''...তারপর একদিন, ছাত্রীদের নিবিষ্ট হয়ে পড়াচ্ছি, মহিলা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর অন্যমূর্তি সেদিন, রুদ্রমূর্তিই বলা যায়— হাতে 'দেশ' পত্রিকার নতুন সংখ্যাটি, তীব্র কণ্ঠে তিনি বললেন, 'এই তো এতে আপনাদের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটা গল্প, ছি, ছি, কি জঘন্য, কুৎসিত, এসব লোককে...। দেশ পত্রিকাটা ছুঁড়ে ফেললেন ঘরের এক কোণে, মিনিট পনেরো ধরে চলল বাংলা-ইংরেজি প্রফেনিটিজ. গৃহকর্তাও দরজার অদূরে দাঁড়িয়ে, তিনি শুধু বললেন, বাড়ির ছেলেমেয়েরাও যদি এসব নোংরা জিনিস পড়ে... মহিলা বললেন, ছি ছি, এই আপনাদের রুচি..., ঘৃণা, বিরক্তি ও ভয় মিশ্রিত অদ্ভুত মুখভঙ্গি তাঁদের। হ্যাঁ, ভয়ও ছিল, আমি ভালো করে লক্ষ্য করেছি। দেশের সেই সংখ্যায় বেরিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সোনারচাঁদ' গল্প, রেস্তোরাঁয় ছোকরা চাকরদের অতি স্বাভাবিক জীবনের কথা। প্রথমে আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম—ওঁদের অতখানি চিত্তচাঞ্চল্য দেখে। তারপর আমার বেশ মজা লেগেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই যে দুর্গের মতন বিশাল প্রাসাদ, এত প্রহরী চাকর-খানসামা পরিবৃত হয়ে থেকেও ওঁদের অবস্থা তাসের প্রাসাদে বাস করার মতন। সদা শঙ্কা, হুস্ করে বুঝি সব ভেঙে পড়বে, একজন সামান্য লেখকও সব কিছু তছনছ করে দিতে পারে। রোদ-বৃষ্টি- বীজাণু আটকাবার মতনই, সাহিত্যের এইসব রূঢ় সত্যকেও ওঁরা জানালা-দরজা বন্ধ করে আটকে রাখতে চান। সেদিন আমাব প্রিয় লেখকের জন্য আমি গর্ববোধও করেছিলুম।'' উল্লেখ্য, জীবনে একবার একটিমাত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার। জীবিতকালে দ্বিতীয়বার সংস্করণ হয়নি তাঁর কোনো বই। এইভাবে লেখকের আদর্শ এবং পাঠকসাধারণের চাহিদার চরম অনন্বয় বা অসামঞ্জস্যজাত চরম অতৃপ্তিই মূলধন স্বরূপ জমা পড়েছে শিল্পীর সঞ্চয় ভাণ্ডারে।

নারী ছিল। শিশুও ছিল পাশে। তবু কী এক অমোঘ টানে অজানা বোধ থেকে মানুষটি পা রেখেছিলেন সৃষ্টির নিঃসঙ্গ আঙ্গিনায়! কাটিয়েছিলেন বৈভবহীন নিরালম্ব জীবন? অন্য কোনো দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় নারী ছায়া ফেলেছিল তাঁর জীবনে! কিংবা প্রেমহীন জীবনের গ্লানি! উত্তর জানা যায়নি। প্রিয় লেখকের মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্র স্মরণে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একবার উল্লেখ করেছিলেন, ''এ তো সেই মানুষ—সেই

নিসর্গের টুকরো, টবের মাটিতে সংবিদ্ধ ক্যাকটাস। তার কাঁটায় বসে আছে নিশ্চুপ প্রজাপতি। তার ধূসর শরীরে নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়ায় লালপোকা নীলপোকারা। এই সেই হিজল বিলের প্রাগৈতিহাসিক কিংবদন্তীর শিকারী—যে বিষণ্ন হেসে বলে, 'কী হবে। আমার কিছু ভাল লাগে না'। কারণ সে দেখেছে এক নীলরাত্রির জ্যোৎস্নায় সঞ্চরমান প্রাকৃতিক স্বাধীনতাগুলিকে, মানুষের শহরে যে স্বাধীনতাগুলি প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট হতে হতে কালো হতে হতে হাইড্রেনে গড়িয়ে পড়ে মলমূত্র আবর্জনার গভীরে। কী ভয়াবহ নিষ্ফলতা। কুষ্ঠরোগী হয়ে এখানে মানুষ হাইড্রেনের জল চেটে খায়। যে মানুষ প্রকৃতির বিস্ময়কর উজ্জ্বল সন্তান।" (এক প্রাগৈতিহাসিক শিকারী : কলেজস্ট্রীট পত্রিকা)।

বাস্তবিক 'ম্যান মেড অবজেক্টস'-এর ভিতর মানুষটি বোধহয় ঠিক ঠিক খাপ খায় না। ধরা পড়ে না। প্রকৃতির মতোই খেয়ালি স্রষ্টাব অন্তর্নিহিত রূপ।

দীর্ঘদিন ধরেই চোখের অসুখে ভুগছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। ১৯৮৩ সালের ১ অগস্ট অসুস্থ অবস্থায় বড় নিঃশব্দে শহরবাসীর অগোচরে দক্ষিণ কলকাতার এক নার্সিংহোমে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার হয়তো তাঁর পাশে ছিল। কিন্তু আজন্ম প্রথাবিরোধী মানুষটির অন্তিমযাত্রাতেও একনিষ্ঠ সঙ্গী হয়েছিল দারিদ্র্য এবং নিঃসঙ্গতা।

সাহিত্যজীবনে তিনি লেখক, সম্পাদকের আদর পেয়েছেন প্রচুর। পাননি পুরস্কারের উত্তাপ। পাঠকের মনোযোগ। অনেকটা 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসের রামানন্দ সেনের মতোই। কিন্তু রামানন্দের অস্থিরচিত্তের প্রতিফলন পুরোপুরি বর্তায়নি তাঁর স্রষ্টার মধ্যে। কাজেই উদাসীন পাঠকের অবজ্ঞা এবং অর্থকৌলীন্যজনিত চরম অপ্রাপ্তি সত্ত্বেও লেখক কলম ছাড়েননি হাত থেকে। যেন নীল দুঃখের ভিতর স্পন্দনহীন স্তব্ধ প্রজাপতি। যেন শিল্পের প্রেরণায় স্থিতধী মানুষটি একজীবন গুটিপোকার মতো যাপন করে শিখিয়ে গেলেন অবিকল্প উড়ান।

সবশেষে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক তথা অনুজ মহাশ্বেতা দেবীর মন্তব্য দিয়ে শেষ করব এই অধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে তাঁর লেখার মাধ্যমে আমি যেমন জেনেছি তা হলো এ লোক নিজের মধ্যে সর্বদা তন্ময় থাকা লোক। গাছপালা, সুন্দরী রমণী, অত্যন্ত জীবিত ও মাটিতে প্রোথিত বৃদ্ধ, এসব সে লেখককেই আকৃষ্ট করবে যে মনের ভেতরের মনকে দুর্মূল্য গাছের মত সযত্নে বাঁচায় ও লালন করে।...

...তিনি শহরের ক্যানসার সংক্রমণ থেকে বাঁচার পথ খোঁজায় ভীষণ ব্যস্ত, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুঃখকাতর বিপন্ন তাঁর মন। কখনো এই বাঁচার পথ সুস্থ যৌনজীবনে বলে তাঁর মনে হয়েছে, আর বারবারই মনে হয়েছে যে প্রকৃতির অনাবিল পরিবেশে সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন একটা বাঁচার পথ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই নগরে অত্যন্ত একলা ছিলেন অন্তরের অন্তরে, আমার এ উক্তির ভিত্তি তাঁর লেখায় সর্বব্যাপী অবক্ষয় বিষয়ে উদ্বেগ ও দুঃখবোধ।" (অবহি : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

গল্পে-কল্পে জ্যোতিরিন্দ্র

*　　　*　　　*

পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই;

*　　　*　　　*

অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।
আরো ঢের লোক আছে
সঠিক শ্রমিক নয় তারা।
স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝ'রে
এরা তবু মৃত নয়; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।

*　　　*　　　*

চারি দিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়— অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।"

(এই সব দিনরাত্রি : শ্রেষ্ঠ কবিতা : জীবনানন্দ দাশ)

সমষ্টিবদ্ধ জনতার কথা জ্যোতিরিন্দ্র বলেন না। নেতার কথাও নয়। বলেন একক কোনো চরিত্রের কথা—আপন অন্তঃপুরে প্রায়শই যে নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী।

মানুষটি ভিড়ের মিছিলে মিশে যায় সহজে। অনন্য ক'রে চিহ্নিত করবার উপায় থাকে না। বৃহত্তর এই পৃথিবীর মহত্তম কোনো কর্মে লিপ্ত নয় সে। মনুষ্যত্ব অর্থাৎ ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংযমের পরিচয়ও অপরিহার্য নয় তার চরিত্রে। কেননা তিল তিল ক্ষয়ের মধ্যে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তার জীবনবেদ। সে মানুষ অন্তর্মুখী। সহসা নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না বা পারে না। তার মনের গহনে সঞ্চিত কয়েকটি বোধ কথা বলে পাঠকের সঙ্গে।

নিপুণ কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র চরিত্রটিকে টেনে নিয়ে যান মুখর ব্যস্ততা থেকে দূরে, নির্জন প্রান্তরে। কান পেতে শোনেন তার না বলা কথা। কখনও ঝিঁঝি ডাকের মধ্যে, পেঁপে পাতার হলুদ বিবর্ণতায়, বৃষ্টির শব্দে, সোনারোদ উজ্জ্বলতায়, শামুক-গুগলি-শাপলার গন্ধে, কখনও কোনো বুনো ঝোপের অন্তহীন অন্ধকারে। তারপর আপাত সামঞ্জস্যহীন টুকরো টুকরো বোধের কোলাজ তৈরি করে তাঁর গল্পের শরীর—যা পাঠকের গল্প শোনার যাবতীয় অর্জিত অভিজ্ঞতায় ঘটিয়ে দেয় চেতনার উলটপুরাণ।

কিন্তু গল্প শুরুর আগের গল্পটা জেনে নেওয়া যাক। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির কর্মশালায় নিয়ত ভাঙাগড়ার কাজে ব্যাপৃত থেকেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। যা লিখেছেন, ভেবেছেন তার থেকে অনেক বেশি। হয়তো সে কারণেই উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্প রচনা করেছেন বেশি। ছোটগল্পের শিল্পিত প্রকরণেই স্রষ্টার সাবলীল বিচরণ।

যদিও সত্তরোর্ধ জীবনে জ্যোতিরিন্দ্র রচনা করেছেন অনেক কম। সৃষ্টির গুণমান রক্ষা করতেই সময় চলে গেছে তাঁর। পাঠকের কথা ভাবেননি। পয়সার কথাও না। আপামর জনতার প্রিয় লেখক হয়ে উঠতে পারেননি কখনও, কিন্তু ব্যক্তিসত্তা তথা শিল্পীসত্তার স্বাধীনতা বিসর্জন দেননি কোনোদিন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবসমাজের স্বাধীনতায় আস্থা পোষণ করাই শিল্পের ধর্ম। সেই ধর্মের হাত ধরেই আসে সৃষ্টির স্বাধীনতা বা শিল্পীর স্বাধীনতা।

এ ব্যাপারে তাঁর স্বীকারোক্তি, "আমি জনপ্রিয় হতে পারলাম কি পারলাম না—শিল্পচর্চার সময় কোনো শিল্পীই একথাটা মনে রাখে না। নিজের সৃষ্টির মধ্যেই সে নিজেকে দেখে, নিজেকে খোঁজে এবং সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে তার কতটা যোগাযোগ কতটা সম্পর্ক তা অনুসন্ধান করে বেড়ায়। এই অনুসন্ধানের মধ্যেই শিল্পী হিসেবে তার উত্তরণের বীজ নিহিত আছে। এটা আমি মনে করি। . . . সুতরাং কোনো শিল্পীই কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম ও গণ্ডির মধ্যে আটক থাকতে পারে না। স্বাধীনভাবে সে তার শিল্পের কাজ চালিয়ে যায়। স্বাধীনতা তার জরুরী। কোনো আরোপিত নিয়মশৃংখলা বা বাধ্যবাধকতা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ...কিন্তু চূড়ান্ত অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা শিল্প নয়। শৃঙ্খলা চাই, তা শিল্পী-সাহিত্যিকের মনোজগতের শৃঙ্খলা, আরোপিত নয়।..." [আমার সময় এবং আমার লেখালেখি : নতুন সময়]

বোধহয় বালক ধনুর বেড়ে ওঠা পর্বেই ছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। চারপাশের

গাছপালা পশুপাখি তথা প্রকৃতিজগতের প্রতি অমোঘ সংরাগ সম্ভবত তাঁর এই স্বাধীন সত্তার জন্ম দিয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় একখণ্ড 'গল্পগুচ্ছ' পুরস্কার পান তিনি। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পগুচ্ছ পাঠ জ্যোতিরিন্দ্রের জীবনে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। তিনি জানিয়েছেন, 'মনে হলো, এই জিনিস আমি শৈশব থেকে খুঁজছিলাম—ছোটগল্প। তারপর থেকে লেগে গেলাম ছোটগল্প লিখতে। গেল কবিতা—প্রথম গদ্যের স্বাদ পেলাম আমি যখন অষ্টম মানের ছাত্র।' (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি)। গল্পগুচ্ছ পড়ে অভাবনীয় বিস্ময়-আনন্দ-কৌতূহল উদ্বেলিত জ্যোতিরিন্দ্র মাত্র অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই প্রাণিত হন ছোটগল্প রচনায়।

গদ্যের প্রতি সর্বগ্রাসী টান বয়ঃসন্ধির কিশোরটিকে ভুলিয়ে দেয় কাব্যপ্রীতি। শিল্পকলা চর্চার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ঘনীভূত হয় ছোটগল্প রচনার সংহত প্রেক্ষাপটে।

১৯৩০ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কুমিল্লায় ভিকটোরিয়া কলেজে আই.এসসি ক্লাসে ভর্তি হন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এই সময় তাঁর অনূদিত মোপাসাঁর একটি ছোটগল্প ঢাকায় সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী'তে প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরে এই প্রথম তাঁর আত্মপ্রকাশ। একমাস পর ওই একই পত্রিকায় একটি মৌলিক গল্পের প্রকাশ। এর পর মাত্র আঠারো বছর বয়সেই জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের অন্যতম রূপকার কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত হাতে লেখা পত্রিকায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত সাড়া জাগানো গল্প 'অন্তরালে'। ক্রমে ঢাকার বাংলার বাণী, সোনার বাংলা, প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত কলকাতার নবশক্তি, সাপ্তাহিক সংবাদ ইত্যাদি পত্রিকায় একের পর এক গল্প ছাপা হতে থাকে তাঁর। লেখকের কথায়, "স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে কলেজে ঢোকার আগেই আমি একজন পাকা ছোটগল্প লেখক—বিশেষত আমার বন্ধুদের কাছে। আমার প্রথম গল্প ছাপা হয় কলেজ ক্রনিকলে—তার আগে একাধিক হাতে লেখা কাগজে অগুণতি গল্প লিখে ফেলেছিলাম"। (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি)

কলেজে পড়ার সময় জ্যোতিরিন্দ্র রাজনীতিব সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩২ সালে আই.এসসি পাশ করে কলেজে বি.এ ক্লাশে ভর্তি হওয়ার প্রথম বছরেই পুলিস তাঁকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ছ'মাস কুমিল্লা জেলে ও একমাস স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন তিনি। এই সময় তাঁর সাহিত্যকর্মের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অথচ মানুষটির মাথার ভিতর অজস্র প্লট, অগুণতি গল্পের আনাগোনা। অন্তরীণ থাকাকালীন ১৯৩৫ সালে প্রাইভেটে বি.এ পাশ করেন এবং সরকারী নির্দেশ অমান্য করে 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামে আবার লিখতে শুরু করেন। এরপর ১৯৩৬ সালে 'রাইচরণের বাবরি' নামে তাঁর একটি গল্প দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। পরিচয় ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 'নদী ও নারী' গল্পটি লিখে কলকাতার বৃহত্তর পাঠক সমাজের নজর কাড়েন জ্যোতিরিন্দ্র। এইভাবে লেখক মানুষটির সাহিত্যের পথে ভিন্নতম অভিযাত্রার পর্ব সূচিত হয়ে যায়।

১৯৩৭-৩৮ সাল নাগাদ কলেজ-গণ্ডি পার হওয়ার পর জ্যোতিরিন্দ্র জীবিকার সন্ধানে কলকাতা আসেন। কিন্তু নির্দিষ্ট চাকরির নিশ্চিত নিরাপদ জীবনযাপন বোধহয় তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেত সফল গল্প লেখক হওয়ার বাসনা। বাংলা সাহিত্যে এক স্থায়ী পদচিহ্ন রেখে যাওয়ার ঐকান্তিক স্বপ্ন। "...সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কথা। চাকরি-বাকরি যত-না খুঁজছি, সাহিত্যের কাগজ, সাহিত্যের পত্রিকা—বিরাট এই কলকাতা মহানগরীতে কোথায় কি ছড়িয়ে আছে খুঁজে খুঁজে দেখছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি। হোটেল- মেসের জীবন—সারাদিন আমাকে কেবল গল্পের ভাবনায় পেয়ে থাকতো। আর, হঠাৎই বা চাকরি দেবে কে? শুধু গ্র্যাজুয়েট। চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোও আমার ধাতে নেই।" (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি)

এহেন স্বভাব অন্তর্মুখী মানুষটি লেখার ফাঁকে চাকরি অবশ্য করেছেন। প্রথম 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' (ওষুধের কারখানা)-তে। তারপর 'দৈনিক যুগান্তরে'। বার্তাবিভাগে অবর সম্পাদক বা সাব এডিটরের চাকরি। 'দৈনিক আজাদে'র বার্তাবিভাগেও কাজ করেন কিছুদিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর 'টাটা এয়ারক্রাফটে'র স্টোরে চাকরি পান। অতঃপর ১৯৪০ সালে জে. ওয়াল্টার টমসন কোম্পানিতে কিছুদিন। 'জনসেবক' পত্রিকায় বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন। বিমল কর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "বিখ্যাত লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সে সময়ে জনসেবক পত্রিকায় কাজ করতেন। সাব এডিটর। . . . জ্যোতিদার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আগেই। উনি ছিলেন আমাদের প্রিয় লেখক। মানুষটিও চমৎকার। জ্যোতিদার সঙ্গে আমার যা কিছু মেলামেশা তা অবশ্য পরবর্তী কালে" (উড়ো খই, ১)। সবশেষে অল্পদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করেন জ্যোতিরিন্দ্র। এরপর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে পুরোপুরি লেখালেখির জগতে মনোনিবেশ করেন। সর্বক্ষণের লেখক হিসেবে মগ্ন থাকেন সৃষ্টির জটিল রহস্য সন্ধানে।

দৈনিক যুগান্তরে কাজ করার সময় থেকেই অসংখ্য ছোটগল্প লিখতে থাকেন জ্যোতিরিন্দ্র। লেখেন খেলোয়াড়, চামচ, চার ইয়ার, পালিশ, খেলনা ইত্যাদি শিল্পসফল গল্প। ছোটগল্পের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক দুঃসাহসী অভিযান চালাতে থাকেন তিনি। রং-রূপ-ভাষা-সংলাপ নিয়ে তাঁর এই পরীক্ষামূলক গবেষণা থেমে থাকেনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সে ক্ষেত্রে প্রকরণ সর্বস্বতা বা সস্তা চমক নয়, শাশ্বত সত্যের সন্ধানই হয়ে উঠেছে তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। দেশ. পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, ভারতবর্ষ, মাতৃভূমি ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন তিনি। ছোটগল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে তাঁকে সর্বাধিক উৎসাহিত করেন পূর্বশার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ১৯৪৬ সালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম গল্প সংকলন 'খেলনা' প্রকাশিত হয়।

আত্মপরিচয়ে জ্যোতিরিন্দ্র জানিয়েছেন, তাঁর রচনার বিষয় মানুষ। মানুষের সুখ-দুঃখ-নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গ আত্মার কান্না, পাপ-পুণ্যের টানাপোড়েন স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। সেক্ষেত্রে নিছক বহির্জগৎ নয়, অন্তর্লোক বা চেতন-অচেতন অন্তর্বর্তী অবচেতন মনের গোপন রহস্য উদ্ধার করেছে তাঁর লেখনী। ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব অনুসারী এই গল্পগুলিতে

রুদ্ধ-বদ্ধ হৃদয়ের গোপন অশিষ্ট কথা তিনি অভিনব ভাষা কৌশলে প্রকাশ করেছেন সমাজের আপাতসভ্য অবয়বের মুখোশ ছিঁড়ে।

গল্পের শেষে মোচড়, চমক বা শীর্ষে পৌঁছবার চেষ্টা লক্ষ করা যায় জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম দিকের রচনাগুলিতে। একটা সাঙ্গীতিক মূর্ছনার রেশ পাওয়া যায় এইসব গল্পে। 'নদী ও নারী' এই ধারার গল্পের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তীকালে অবশ্য গল্পে চমকসৃষ্টির প্রবণতা ত্যাগ করেছেন তিনি। আসলে চমকসৃষ্টির এই ঝোঁক মোপাসাঁ, সমারসেট মম এবং ও হেনরির গল্পে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, যা পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করত। জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর প্রথম দিকের গল্পে এই ধারার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছেন স্বাভাবিক ভাবেই। পরে অবশ্য গল্প বলার স্বাভাবিক বিন্যাস বজায় রাখতে রচনাধারাকে প্রবাহিত করেন স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির দিকে। কিন্তু ছোটগল্পের যে প্রধান আকর্ষণ একটা ক্লাইম্যাক্স বা শিখর ছোঁয়ার প্রবণতা, এটা তিনি রক্ষা করেছেন শেষ পর্যন্ত। না হলে ছোটগল্প আর ছোটগল্প থাকে না। ধর্মচ্যুত হয় বা মর্যাদা হারায় বলে তিনি মনে করতেন।

আত্মপরিচয়ে জ্যোতিরিন্দ্র এ-ও বলেছেন, ". . . অনেকে বলে শুনেছি, ঘোরাফেরা না বাড়ালে অভিজ্ঞতা হয় না, লেখালেখির অসুবিধা হয়। আমি বুঝি নি। অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই দরকার, ওটা একটা বেস। কিন্তু মূল ব্যাপার হলো কল্পনা—ইমাজিনেশন। ইমাজিনেশন না থাকলে শুধু অভিজ্ঞতা দিয়ে কিস্‌সু হয় না।" (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি)। বাস্তবিক যত্রতত্র হুটহাট বেরিয়ে পড়া বা দেশভ্রমণের সুযোগ বিশেষ ঘটেনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনে। একবারই মাত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন পুরী। পুরীর সমুদ্র দর্শনে। এবং তারপরই লিখেছেন সেই বিখ্যাত অনন্যসাধারণ গল্প 'সমুদ্র'। সমুদ্রকে নিয়ে আরো দু'টি উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। নাম, 'দুই সমুদ্র' এবং 'সমুদ্র অনেক দূর'।

প্রকৃতি এবং মানবমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে। কেবল প্রকৃতিকে চরিত্র করেই একাধিক গল্প লিখেছেন তিনি। গাছ, বনের রাজা, সামনে চামেলি ইত্যাদি অসংখ্য গল্প পড়লে মনে হয় যেন প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। আদিম এক গুহামানব হয়ে মিশে যাচ্ছেন, জড়িয়ে আছেন জগৎ ও জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায়। প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সেই অনাদিকালের সম্পর্ক তাদের অবোধ্য সংলাপ লিপিবদ্ধ করে রাখছে জ্যোতিরিন্দ্রের দ্বিতীয় সত্তা।

জ্যোতিরিন্দ্রের প্রতি গল্প-উপন্যাসেই আদ্যন্ত জড়ানো রয়েছে প্রকৃতির প্রচ্ছদ। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। মূল কথা হল, প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি বাহ্যত দুটি ভিন্ন সত্তা হলেও কোথাও এক জায়গায় মিলেমিশে একাকার—এ কথাই বারবার বলতে চেয়েছেন লেখক। সমুদ্রের বিশাল গভীর ব্যাপক বিস্তার তাঁর লেখক সত্তায় প্রথম প্রেমের তীব্র অনুভূতির শিহর জাগিয়েছিল। এনে দিয়েছিল এক বিপন্ন বিভ্রান্তি। লেখকের কল্পনাবৈভবে সেই অনন্য অনুভূতির ইশারা আমরা পাই 'সমুদ্র' গল্পটিতে।

বাংলা সাহিত্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়ে প্রথম গল্প লেখা শুরু করেন জ্যোতিরিন্দ্রই।

সৃষ্টির প্রকরণগত দিক ছাড়াও বিষয়গত বৈচিত্র্য রক্ষা করার কথাও ভেবেছেন বারবার। তাঁর 'আজ কোথায় যাবেন' গল্পসংকলনটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। নিত্যনতুন বিষয়ভাবনার কথা চিন্তা করে লেখক জানিয়েছেন, "... তুমি একজন লেখক। তা, তোমার কাছে প্রেমিকা ছাড়া আর কিছুই নেই? তোমার ঘরে মা আছে, বাবা আছে, ভাই বোন সব আছে। অথচ লিখতে গিয়ে শুধু প্রেমিকা আসছে কেন? মাকে নিয়েও তো লিখতে পার। বুড়ো বাবা বা ছোকরা বাবার কথা লিখে দাও। অ্যাঁ, প্রেম তো তাদের সঙ্গেও হয়। নয় কি? সাহিত্য একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই লোকে বলে।" (প্রতিবিম্ব সাহিত্য পত্রিকা)

আসলে ব্যক্তিজীবনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অবাধ কল্পনা এবং কল্পনার স্বাধীনতা জ্যোতিরিন্দ্রের রচনাকে উৎসাহিত করেছে বেশি। কল্পনার প্রসারবিহীন নিছক প্রেমিক-প্রেমিকা বা আমি তুমির গণ্ডিতে আবদ্ধ সাহিত্যকে 'ড্রয়িংরুম সাহিত্য' বলে আখ্যা দেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি এ-ও বলেন, "একজন লেখক তার অভিজ্ঞতা থেকেই লেখে। তার জীবনযাপন, মেলামেশা, স্টাডি, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বাইরে সে লিখতে পারে না। আবার শুধু শুকনো অভিজ্ঞতা দিয়েই লেখা যায় না, এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই ইমাজিনেশন—ইনট্যুশন। ইমাজিনেশন না থাকলে, কল্পনা করতে না পারলে, দূরদৃষ্টি না থাকলে, মানুষ বুঝতে না পারলে—মানবচরিত্র লেখা খুব দুরূহ। আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে লিখি। যে মানুষ বা দৃশ্য বা ঘটনা আমি দেখি—তারাই আমার লেখার বিষয় হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিই আমার কল্পনা—এটা এমন হলে কেমন হতো। এসবের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে আমার দেশজ রূপ, আবহমানের ধারা, ঐতিহ্য। সব কিছু মিলিয়েই লেখা সাহিত্য কোনটার থেকে কোনটা আলাদা নয়। আমার জীবন, ধ্যানধারণা, ঐতিহ্য, সাহিত্য সবই জড়িত; সবের মাঝেই সবার প্রতিফলন।' (আমার সময় এবং আমার লেখালেখি : নতুন সময়)

লেখার পরিধি বিস্তারের জন্য ব্যাপক পঠন-পাঠনের প্রয়োজন রয়েছে বলেও কোনোদিন স্বীকার করেননি এই ছন্নছাড়া মানুষটি। তবে যখন যেমন খুশি মতো দেশি-বিদেশি ও সমসাময়িকদের লেখা পড়তেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সবথেকে বেশি তাড়িত করেন সম্ভবত জীবনানন্দ। বিমুগ্ধ বিস্ময় এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি জীবনানন্দকে একপ্রকার অনুধাবন করেছেন বলা যায়। জীবনানন্দ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, "তাঁর প্রতিটি কবিতা, বিশেষ ক'রে তাঁর শব্দচয়ন আমাকে এমন নাড়া দিতো যে এক-একটি কবিতা প'ড়ে এক-একটা গল্প লেখার প্রেরণা পেতাম। কোন কবিতা পড়ে কোন গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম তা এখন হারিয়ে ফেলেছি, আপনাদের বলতে পারবো না, কিন্তু এই যে শিল্পসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য শব্দচয়ন ক'রে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করতেন, আমারও ইচ্ছা হ'তো ঠিক ঐরকম শব্দ সাজিয়ে একটি ক'রে গল্প লিখি। উনি যেন প্রায় আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন, তুমি ঠিক এইভাবে গল্প লেখো।" (কালপুরুষ : প্রসঙ্গ : নৈশভ্রমণ)

যাই হোক, এবার আমরা জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পগুলির আলোচনায় যেতে পারি। অর্জুনের মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করার মতোই দুরূহ দুঃসাহসী যে শরসন্ধান ছোটগল্প সৃষ্টির

প্রধান শর্ত, জ্যোতিরিন্দ্রের লেখনী অনুসরণ করে ছুঁয়ে দেখতে পারি সেই অভিপ্রেত সত্যের মুখ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংকলনগুলি ক্রমানুসারে এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল।

১. শালিক কি চড়ুই (১৩৬১) : নায়ক নায়িকা, খুকী, চড়ুইভাতি, বধিরা, ভোলাবাবুর ভুল, খেলোয়াড়, চামচ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।
২. প্রিয় অপ্রিয় (১৩৬৪) : কৈশোর, গিরগিটি, আটপৌরে, বুটকি-ছুটকি।
৩. খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর (১৩৬৭) : কেষ্টনগরের পুতুল, পঙ্গু, মাছধরার গল্প, নীল পেয়ালা, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর।
৪. পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা (১৩৬৮) : তিন বুড়ি, গোঁয়ার, বৃষ্টির পরে, আপেল, সমুদ্র, উপহাস, মৌসুমী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা।
৫. শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা (১৩৭০) : শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ।
৬. ছিদ্র (১৩৮৩) : ছিদ্র, সোনার চাঁদ, বুনো ওল, ক্ষুধা, হিংসা।
৭. আজ কোথায় যাবেন (১৩৬৭) : সোনালি দিন, আম কাঁঠালের ছুটি, দুই শিশু, লেডিজ ঘড়ি, আরশোলা, গোধূলি, ভালো ছেলে খারাপ ছেলে, চশমখোর, জিয়নকাঠি মরণকাঠি, আজ কোথায় যাবেন, গোপন গন্ধ।
৮. শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৮৩) : নদী ও নারী, শালিক কি চড়ুই, মঙ্গলগ্রহ, তারিণীর বাড়ি বদল, ট্যাকসিওয়ালা, চোর, বনের রাজা, গিরগিটি, তিনবুড়ি, সমুদ্র, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, ভাত, আলোর পাখি, সেই ভদ্রলোক, জীবন, ছাতা, অজগর, সামনে চামেলী।
৯. গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড (১৩৮৯) : তাঁকে নিয়ে গল্প, এক ঝাঁক দেবশিশু, মহড়া, কেমন হাসি, হার, মাছি, ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা, সুখী মানুষ, সংহার, ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার, গাছ, মিষ্টি জ্বালা, বাবু, চাওয়া, নিঃশব্দ নায়ক, বন্ধুপত্নী, মঙ্গলগ্রহ, দৃষ্টি।
১০. গল্পসংগ্রহ ২য় খণ্ড (১৩৮৯) : তারিণীর বাড়ি বদল, মেয়ে শাসন, দুপুরে গল্প, মৌচাক, টুকরো কাপড়, প্রতিনিধি, নৈশভ্রমণ, দিগদর্শন, রাক্ষসী, পতঙ্গ, শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ, মহিয়সী, বনের রাজা।
১১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প (১৩৬৯) : নদী ও নারী, রাইচরণের বাবরি, সমুদ্র, বৃষ্টির পরে, বনের রাজা, বন্ধুপত্নী, গিরগিটি, শ্বাপদ, তারিণীর বাড়ি বদল, মঙ্গলগ্রহ, চোর, নীল পেয়ালা, চন্দ্রমল্লিকা, পার্বতীপুরের বিকেল, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, পতঙ্গ, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা, জ্বালা, সামনে চামেলী, গাছ।
১২. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প (১৩৯৮) : কালো বৌদি, আপন ভাই, ম্যাজিক, ফুল ফোটার দিন, রূপকথার রাজা।

পর্বগত বিন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্প রচনার মূল তিনটি বিষয় নিঃসন্দেহে

সমাজভাবনা, প্রকৃতি এবং ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বনির্ভর নর-নারীর জটিল সম্পর্কের কাহিনী। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাঁর রচনার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। জীবনকে তিনি দেখেন বিবিধ রেখায়। বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রতিটি চরিত্র, প্রতি ঘটনার ময়নাতদন্ত করেন নির্মম নিরাসক্ত ভূমিকায়। আদতে সবরকম ভাববিলাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার প্রাণকেন্দ্র। তাঁর সৃষ্টির আবর্তটিকে তুলে ধরতে অজস্র অসংখ্য গল্পের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয়গুলি আলোচনা করব এখানে।

তারিণীর বাড়ি বদল

সমাজ-সমস্যামূলক বাস্তব ঘটনা নির্ভর কাহিনী। চরম দারিদ্র, পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা এবং অন্যের দুঃখ নিপীড়ন দেখে আত্মতৃপ্তি জাত 'ক্যাথারসিস' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ধরা পড়েছে। আদতে গল্পের বিষয় কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজ, মধ্যবিত্তের অবক্ষয়।

প্রেসকর্মী তারিণী একদিন দুপুরে হঠাৎই প্রেসের কাজে না বেরিয়ে স্ত্রী-পুত্রকন্যা সহ ঘর-সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র একটি ঠেলাগাড়িতে তুলতে থাকে। কিন্তু কেন যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে—এই প্রশ্নে সমালোচনার ঝড়ে মুখরিত হয় পাড়া-প্রতিবেশীর দল। তারিণীর আর্থিক সঙ্গতি, তার ক্রমবর্ধমান সন্তানসংখ্যা ও মেকি আত্মসম্মানবোধ প্রসঙ্গে চাপা বিদ্রূপ এবং কটাক্ষপাতে উচ্ছ্বসিত হয় মানুষগুলি। অথচ সরাসরি তারিণীকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে এগিয়ে যায় না কেউ। প্রসারিত করে না সাহায্যের হাত।

আদতে যুদ্ধ-পরবর্তী দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষের বাজারে আট-দশটি সন্তানের পিতা তারিণীরা চাকরি চলে গেলে বা চাকরি থেকে হঠাৎ ছাঁটাই হলে কোথায় যায়, কী তাদের পরিণতি—তেমনই বাস্তব সমস্যার নির্মম দলিল এই কাহিনী। উল্লেখ্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সুবিখ্যাত 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের বীজ প্রোথিত ছিল 'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পে। 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর ব্যাঙ্ককর্মী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শিবনাথ এবং তাবিণী অন্তর্গত চরিত্রে একই আদলের। শিবনাথের ব্যাঙ্ক ফেল করেছিল। সন্তান একটি। স্ত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী। কিন্তু ঘটনাগত বিন্যাসে তারা একই মর্মযন্ত্রণার কথা বলে।

গল্পের শেষে আমরা জানতে পারি তারিণী কোথাও যেতে পারেনি। দু-কোঠা ঘরের একটি সচ্ছল পাড়া ছেড়ে শহর কলকাতার দুঃস্থ দুরতিগম্য, মুমূর্ষু এলাকা বেলেঘাটা তার গন্তব্য ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সেই ঠিকানায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ পৌঁছনো সম্ভব হয়নি তারিণীর। পথেই গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তাদের।

যুদ্ধোত্তর কালের দুর্বল পঙ্গু আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সহায় সম্বলহীন তারিণীর এই মৃত্যু অনিবার্য ছিল। কাজেই সেটা বড় কথা নয়। তার বাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে বকেয়া টাকার জন্য মুদিদোকানি, কয়লাওয়ালা এবং গয়লানির নাছোড় উপদ্রব, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, ঠেলাগাড়ির জিনিসপত্র ফেলে মাড়িয়ে নিষ্ঠুর উল্লাস, নিরপেক্ষ দূরত্বে নির্বাক প্রতিবেশীর উদাসীন অবস্থান, মালবোঝাই গাড়ি তারিণীর একাই টেনে নিয়ে যাওয়া, গাড়ির পেছনে ঠেলা দিতে দিতে তার স্ত্রী ছেলেমেয়ের নীরব পথচলা, চালচিত্রে একটি কুকুর ও তারিণীর ছেড়ে যাওয়া অংশটুকু বারবার শুঁকে দেখা—এই সব দৃশ্যই গল্পের আত্মাটুকু ধরিয়ে

দেয়।

সর্বোপরি সামান্য বেতনভুক প্রেসের কর্মচারী তারিণী দত্ত যখন বলে, 'টাকা পাবে কোর্টে গিয়ে নালিশ করো, খবরদার, মালপত্রের গায়ে হাত দিয়ো না, ফ্যামিলীম্যান, আমি ভদ্রলোক, এই—এই''—তখন 'ভদ্রলোক' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তের দৈন্য ও শব্দের আড়ালে শ্লেষটুকু ছড়িয়ে পড়ে শতধাবিদীর্ণ হয়ে।

তবু দারিদ্র, অন্ধকার, মৃত্যু বা শ্লেষই এ গল্পের শেষকথা নয়। নিষ্ঠুর উদাসীন অনুভূতিশূন্য নির্জীব এক সামাজিক প্রেক্ষাপট গল্পটির মর্মকথা—''দেখা গেলো, অদূরে লম্বা টর্চ হাতে তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরের দরজার তালা খুলতে-খুলতে বাড়িওলা নতুন কোনো এক ভাড়াটাকে বাড়ির জলকল পায়খানা ও রসুইঘরের চমৎকার ব্যবস্থার কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শোনাচ্ছে।'' কাহিনীতে সার্বিক নিঃস্বতার এক মূক আর্তনাদ ধরা পড়েছে লেখকের নির্মোহ নির্বেদ বিশ্লেষণে।

মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বর্ণনা, মর্মভেদী সংলাপ চয়নে লেখকের মুন্সিয়ানা এ গল্পের আরো এক প্রাণ-সম্পদ। কাহিনীকে বিশ্বস্ততা দান করেছে তাঁর শব্দযোজনার সঠিক শরসন্ধান।

উদাহরণস্বরূপ—''কুনো ডেকচি, মশারি, ছাতা, লণ্ঠন, মাদুর, বালিশ, জুতো, ফুটো একটা কড়াই। একটা ফানুস, রং-চটা ফাটল-ধরা গণেশের মূর্তি, দুটো হাতি, গামলা, ইঁদুর-মারা কল, বাক্স, জীর্ণশীর্ণ একটা স্যুটকেশ।'' সামান্য এক প্রেসকর্মীর সংসারজীবনে এর থেকে বড় সম্পদ আর কী থাকতে পারে।

গল্পের শেষে শিয়ালদহ প্রত্যাগত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তারিণীর মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে জনৈক প্রতিবেশীর মন্তব্য—''কিন্তু ও কি জানতো না, ঠেলা যখন ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তখন তার আগে থাকতে নেই, পিছন ধ'রে চলাই নিরাপদ, সবাই তা করে।''—আদতে স্রোতের মুখে প্রবল আত্মসম্মানবোধ অর্থাৎ জেদের বশে কাজ করা আত্মহত্যারই সামিল। শব্দের চোরাস্রোত যেন সেই ইঙ্গিত করে। শেষ মুহূর্তে পাওনাদারদের ভয়ে ঠেলাওয়ালা গাড়ি চালাতে রাজি না হওয়ায় তারিণী দুঃখে কষ্টে ভেঙে পড়েনি। সাহায্যপ্রার্থী হয়ে থমকে দাঁড়ায়নি পাড়ার মানুষজনের দরজায়। দাঁড়ালে হয়তো কেউ কিছু সাহায্য করতে পারত। কিন্তু প্রবল আত্মসম্মান নত হতে দেয়নি মধ্যবিত্তের প্রতিভূ তারিণীকে। মধ্যবিত্তের সেই অসহায়তা, অক্ষম আস্ফালন তথা মধ্যবিত্তের সংকটের দিকটি গল্পের চরিত্রের মুখে পরম বিস্ময়ে প্রকাশ করেছেন লেখক।

চোর

গল্পে পেঁপেগাছ একটি চরিত্র, যা আদ্যন্ত বিষয়ভাবনার কেন্দ্রে আবর্তিত। পেঁপেগাছ এখানে প্রতীকী। সুকুমারদের বাড়ির অপরিমিত বৈভব এবং ঐশ্বর্যকে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের দৈন্য-দুর্দশার পাশাপাশি চরম বৈপরীত্যে প্রকট করে তোলে এই গাছ। বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার মায়ায় আচ্ছন্ন হয় গল্পের কথক কেরানির ছেলে কিশোর মিণ্টুও। সুকুমারদের বাড়ির চাকর মদন বিশ্বাসঘাতকতা করে পেঁপেচারাটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে

বলে একটুও রাগ হয় না তার। বরং বন্ধুত্বের সূত্র ধরে সুকুমারদের বাড়ি যায় সে। সুকুমারদের বাগানে সতেজ সজীব পেঁপেগাছের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয়, "কেবল চাকরি না, আমাদের রান্নাঘরের পিছনের ছায়া-ঢাকা স্যাঁতসেঁতে জমির চেয়ে ওর বাড়ির রোদালো বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে, তাতে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু অবাক লাগল নিজের কাছে, মদনের ওপর আমি এতটুকু রাগ করতে পারলাম না। কি, তারপর যখনই সুকুমারদের বাড়িতে গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত দীর্ঘছত্র পেঁপে গাছটা আমাকে বড় বেশী টানতে লাগল। সকাল নেই বিকাল নেই সুকুমারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,—এদিকে সুকুমারের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু আমার চোখ ওদিকে— যেন গাছটাকে দেখে দেখে আর আশা মিটত না!" বলা বাহুল্য, এই তৃষ্ণার্ত ব্যাকুলতার স্বরূপ কী, বালকের উপলব্ধিতে তা ধরা পড়ে না।

কিন্তু অবচেতনের গভীর গোপনে কিশোর মনও নাড়া খায় একদিন। সুকুমারের সঙ্গে গল্প করতে করতে এক দুপুরবেলা পেঁপেগাছের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ঘোর কেটে যায় মিন্টুর। শিহরন লাগা ভয়ে ছুটে আসে নিজের বাড়িতে। তার বোধ বলে, "...মদন পেঁপেচারাটা চুরি করে নিয়ে যায় নি। আমার বারবার মনে হচ্ছিল পেঁপেচারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, নাহলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।"

একটি ছোট্ট পেঁপেচারা এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও কাহিনীর মূল প্রোথিত আরো গভীরে। তা হল আর্থিক অসমতাজাত শ্রেণীবৈষম্য ও একটি বালকের ঐকান্তিক বোধোদয়।

স্কুল পড়ুয়া কিশোর বালক মিন্টু জানত না "বৈভবের মার" কাকে বলে। দারিদ্র কী, জানত না তাও। অর্থাৎ একাধিক চাকর-চাকরানি, ড্রাইভার, গাড়ি ও রোদালো উন্মুক্ত বাগানসহ ব্যারিস্টারের তিনতলা বাড়ির পাশে ছোট্ট টিনের ঘরে বেড়ে ওঠা মিন্টুর দারিদ্রজনিত দুঃখবোধ ছিল না। স্কুলে যাবার পথে রাস্তার নর্দমায় ছোট্ট সামান্য এক পেঁপেচারা দেখেই অতি সহজে পুলকিত হয় তার কাঁচা সবুজ মন। বড়লোকের বাড়ির দশ টাকা মাইনের চাকর মদন তাদের বাড়িতে এসে কাজে ঢুকলে ছোট্ট চারাগাছটির মতো তাকেও সাগ্রহে বরণ করে সে।

স্কুলে সহপাঠী হয়েও ব্যারিস্টারের ছেলে সুকুমার গরিব মিন্টুর সঙ্গে কথা বলে না। হয়তো সে কারণে সুকুমারদের বাড়ির খারিজ হয়ে যাওয়া চাকর মদনের সঙ্গে, তার চাপা ঈর্ষা ও ক্রোধের সঙ্গে কিংবা বড়লোকের বাড়ির সমস্ত গাছপালা নষ্ট করে দেবার প্রসঙ্গে সাময়িক একাত্মতা অনুভব করে মিন্টু। কিন্তু বিপরীত ঘটনাপ্রবাহে মদন যখন সুকুমারদের বাড়িতে পুনর্বহাল হয় এবং এক ঝড়ের রাতে মিন্টুর যত্ন করে লাগানো পেঁপেচারাটা চুরি করে বড়লোক সুকুমারদের প্রশস্ত বাগানে পুঁতে দেয়, ঠিক সেই মুহূর্তে কাহিনীর ঘূর্ণিপাকে ভিন্নমাত্রায় আবর্তিত হয় মিন্টুর ধ্যান ধারণা। দীর্ঘ ছ'মাসের ব্যবধানে

ঘটনাচক্রে সুকুমারের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটে যাওয়ায় তাদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করে মিন্টু। ধীরে ধীরে আটকে পড়ে ঐশ্বর্যের গোলকধাঁধায়। প্রতিটি 'সোনাঝরা বিকেলে' সাদা পাথরের বাটিতে আপেল- আনারস সমাহারে শাড়ি গয়না ভূষিতা স্বাস্থ্যবতী সুকুমারের মায়ের আহ্বান-আপ্যায়ন ভুলিয়ে দেয় তার রোগা মায়ের কথা। ভুলিয়ে দেয় মদনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং পেঁপেচারা উৎপাটনের দুঃখ-অপমান। একটি পেঁপেচারার স্থান পরিবর্তন যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অর্থকৌলীন্যের মহিমা।

সামান্য কয়েকটি সূক্ষ্ম মোচড়ে কোনো চমক ছাড়াই কাহিনীর শীর্ষ-বিন্দুতে এইভাবে পৌঁছে যান জ্যোতিরিন্দ্র। বর্ষার রাত, যজ্ঞডুমুরের গাছ, গাছের ছায়ায় ঢাকা মিন্টুদের চার পাঁচহাত অন্ধকার টুকরো জমি— এসবই সেখানে অন্তর্লীন বাস্তবতার নিখুঁত সম্পাদনায় ঘটনার বিশ্বস্ত সূত্রধার। মিন্টু এখানে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত চরিত্র। প্রকৃতির সঙ্গেই তার নিভৃত প্রণয়। এই প্রকৃতির সাহচর্যেই মনোলগে তার অন্তিম সংলাপ— 'আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।' আদতে পেঁপেচারা এক 'মহৎ চোর'। একটি ছোট্ট ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় তার প্রত্যয়ভূমি। মিন্টুর প্রখর সংবেদনশীলতাই 'চোর' গল্পের একমাত্র বাস্তুজমি। যে জমিতে দাঁড়িয়ে ঐশ্বর্যের চটুল হাতছানিকে উপেক্ষা করা যায়।

নদী ও নারী

গল্পের নীলিমা সেই নারী, যে নদীর মতোই নিরবচ্ছিন্ন স্রোতস্বিনী। নিয়ত বহমান। স্থবিরত্ব তার কাম্য নয়। দুর্যোগ দুর্বিপাকে ভেসে আসা তাবৎ আবর্জনা নিরাবেগ স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে। স্বামীর প্রতি প্রেম-প্রীতি-সেবা-মমতায়, সর্বোপরি স্বামীর বিপর্যয়ে নিজের প্রতি দোষারোপ করায় সে একদিকে যেমন বিষাদঘন রোমান্টিক আর্তিতে পূর্ণ এক নারী, অন্যদিকে নদীর মতোই উদ্দাম, কলুষমুক্ত।

নীলিমা বন্দুক হাতে শিকার করে। বঁড়শিতে মাছ ধরে। পচা ডিমের জন্য সবজিওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে। আবার পঙ্গু অন্ধ স্বামীর আরোগ্য কামনায় বছরের পর বছর নিরলস সেবায় জীবন কাটিয়ে দেয় নৌকায়। বিচ্ছিন্ন প্রান্তরে। তার অবসাদমুক্ত বলিষ্ঠ মন এক কঠোর সংকল্পের দড়ি ধরে হেঁটে চলে মৃত্যুর বিপরীতে। সেবা-সাহচর্যে লগ্ন থাকে জীবনসঙ্গীর বেদনায়। জীবনকে আঁকড়ে ধরার অদম্য স্পৃহায় নিজেকে সচল রাখে নীলিমা।

গল্পের পার্শ্বচরিত্র সুরপতি-নির্মলা দূর থেকে তাকে দিনভর পর্যবেক্ষণ করে। কখনও 'ফাঁপা বেলুন', 'কচি খুকি', 'রণরঙ্গিণী', 'ফ্যাশানের ফানুস' বিশেষণে চিহ্নিত করে এবং ভেবে স্বস্তি পায় না 'এ কোন জাতের মেয়ে'। সেই বিচিত্ররূপিনী নীলিমা আদতে নদীপ্রান্তরের ধূ-ধূ বালির চরের মতোই অন্তর্গত চরিত্রে এক নিঃসঙ্গ মানুষ। নদীর মতোই বিচিত্রগামী চরিত্রটির মানসভূমি লেখক যেন আড়ম্বরহীন অনায়াস দক্ষতায় ছুঁয়ে যান আপাত সত্য শ্লেষোক্তিগুলির মাধ্যমেই।

উল্লেখ্য, কোনো জোরালো ভাষায় নীলিমার সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করার আগ্রহ নেই লেখকের। কাহিনী বিস্তারের ধারাস্রোতে প্রচ্ছন্ন কুশলতায় জুড়ে দিয়েছেন এক একটি

অমোঘ বাক্যবন্ধ। একটি নারীর শরীরী বর্ণনায় জানিয়ে দিয়েছেন তার চারিত্রিক গঠন।— 'মধ্যাহ্ন আকাশের মতন স্বচ্ছ প্রখর চাউনি', 'চিবুক দু-দিকে ঈষৎ চাপা', 'পুরুষের মতন', 'একটু ধারালো', 'শক্ত', '...হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতাবাঘের মতন।' 'শিস দিতে দিতে বালির উপর দিয়ে তরতর করে সে চরের ওদিকটায় নেমে গেল। ছোট ডিঙি, কেউ নেই সঙ্গে, নিজের হাতে বৈঠা ফেলে দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে ভেসে পড়ল।'

'নদী ও নারী' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমগ্র গল্পসংকলনে তাঁর প্রথমদিকের রচনা। 'নদী ও নারী' সম্ভবত এক শীর্ষস্থানীয় গল্প যা কেবল প্রকৃতি ভাবনায় নয়, সূক্ষ্ম নিবিড় ব্যঞ্জনার গৌরবে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। এক নারীর সদা-উচ্ছল প্রকৃতি এখানে বহিঃপ্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে মিলেমিশে একাকার। তার উচ্ছলতায় পরিপার্শ্ব চঞ্চল হয়। নিষিদ্ধ কৌতূহলে আলোড়িত হয় রাক্ষসী পদ্মার বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মতোই। কিন্তু নারীটি ভ্রূক্ষেপহীন। চলার পথে বাধাস্বরূপ তাবৎ শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ, আবর্জনাকে বিরামহীন গতিতে স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীর মতোই নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায়।

আবার, জোয়ার-ভাঁটার মধ্যবর্তী স্তব্ধ-নদীর ঢেউহীন স্রোতহীন নীরব বিষণ্ণতাও কি কম ব্যঞ্জনাময়! নীলিমার বিবাহিত জীবনের এক বছরের মধ্যেই ক্রেনে কাটা পড়ে এবং নার্ভে চোট লেগে অন্ধ চলচ্ছক্তিহীন স্বামীর সঙ্গদানে যে গভীর বিষাদ ঘনীভূত হয়, তার বেদনা আচ্ছন্ন করে পাঠককেও। সুরপতি-নির্মলার অদম্য কৌতূহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে 'ক্রেনে কাটা পড়ে' শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার স্থির শূন্য দৃষ্টি এবং ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর দীর্ঘশ্বাস যথেষ্ট মনে হয় আমাদের। ছোটগল্পের সংযত আঙ্গিকে সংগ্রাম ও বেদনাঘন শূন্যতার আবহ তৈরি করতে শব্দবিক্ষেপের এই কৃপণতাই যেন লাবণ্য দান করে গল্পশরীরে।

সমুদ্র

গল্পের বিষয় প্রকৃতির বিশাল অখণ্ড রূপের প্রেক্ষাপটে চেতনার অবলুপ্তি ও সত্তার বিমিশ্র আবিষ্কার। গল্পের মুখ্য চরিত্র সস্ত্রীক পুরী বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রের সংস্পর্শে সহসা দিশাহারা হয়ে পড়ে। প্রাত্যহিক ভাবনাচিন্তাগুলো বিপরীত খাতে বইতে শুরু করে তার। তুচ্ছ মনে হয় নিজেকে। তুচ্ছ মনে হয় দৈনন্দিনের টুকরো অথচ প্রিয় সুখানুভূতিগুলি। প্রকৃতির বিস্তৃত তটে দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুকণার মতো। সংসারজীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গ এমনকি স্ত্রী হেনার সঙ্গসুখও অসহ্য মনে হয় তার। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অনুভব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সে।

"...আমার মনে হয়েছে পৃথিবীটাকে কেউ নতুন করে তৈরী করছে; ঢালাই গড়াইয়ের কাজ চলছে; বা অদৃশ্য কোন শক্তি এই সৃষ্টি ভেঙে দিচ্ছে—দূর থেকে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে, ভাঙতে ভাঙতে ক্রমে এখানে চলে আসবে সেই শব্দ। এই ঘরের ভিত ভাঙবে, দেয়াল ভাঙবে। ভয়ে বুক কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল; আবার আশ্চর্য এক সুখ একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে আমি কান পেতে ছিলাম। ...কষ্ট হচ্ছিল, হেনার জন্য। ...আমরা

যে সমুদ্রের কত কাছে রয়েছি, কথাটা ভুলে গিয়ে কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানার গর্তে নিশ্চিন্ত আরামে একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে ঘৃণা হচ্ছিল।" গভীর রাত্রে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্তাল টানাপোড়েন না দেখে বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে যে হেনা, তাকে দেখে এক ধরনের অনুকম্পাও বোধ করে নায়ক। অনুকম্পা ক্রমে বিরক্তি বা বিতৃষ্ণার রূপ নেয়। সুন্দরী স্ত্রী হেনাকে একটু কাছে পাওয়ার জন্য তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনবার জন্য কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের বাড়িতে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে যে মানুষটি, পুরীর হোটেলের বিছানায় সেই স্ত্রীকে তার নিছকই মাংসপিণ্ড মনে হয়। গুরুত্ব হারায় গভীর রাতের গোপন ইচ্ছেগুলোও। বরং জানালায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রর গর্জন শুনতে শুনতে নিজেকে এক মহান আবিষ্কারকের ভূমিকায় দেখে ফেলে সে—"বলতে কি প্রথম রাত্রেই মনে হয়েছে আমি বড়— অনেক বড়; সৃষ্টি ও লয়ের গূঢ় গম্ভীর শব্দ শোনার অধিকার আমারই আছে, তোমার নেই; তুমি ছোট—অনেক ছোট; সমুদ্রকে তুমি বোঝ না, চেন না। প্লেনের শব্দ বাতাসের সোঁ সোঁ— তা বটে। কেবল কান পেতে শোনা নয়, জানালার বাইরে চোখ মেলে দিয়ে আমি বিরাটের আশ্চর্য রূপ দেখে নিলাম।"

কিন্তু কোনো কোনো আবিষ্কার আবিষ্কারককেও গ্রাস করতে চায়। সমুদ্রপ্রীতির সর্বনাশা নেশায় আপ্লুত হতে হতে একসময় সমুদ্রের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে চরিত্রটি। এই সম্পৃক্ত হওয়ার পিছনে ইন্ধন জোগায় গল্পের আর এক বিচিত্র চরিত্র মামা।

পুরীতে ভাগ্নে বীরেনের হোটেলে খদ্দের সংগ্রহ করে দেওয়াই মামার জীবিকা। সেই সূত্রেই সকলের মামা। কুড়ি বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করতে করতে আপন মনের কল্পনায় ক্রোধ-ঘৃণা-বিদ্বেষের মিশ্রণে সমুদ্রকে এক জীবন্ত রাক্ষসরূপে দেখে এই মামা। সংক্রামক রোগের মতো এই মনোবিকার মামা ছড়িয়ে দেয় গল্পের কথক নায়কের মধ্যে। —"কি, বিশ্বাস করছেন না? আমার আপনার মতো তার ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা রুচি সব-কিছু। ওই দেখুন কেমন রাক্ষসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।"

সাদা জুঁইফুলের মতো সমুদ্রের ফেনা মামার দৃষ্টিতে 'সাদা শক্ত ধারালো দাঁত'। তাই মাছভাজা, সিঙাড়া, রুটি, কেক, ডিমের বড়া ছাড়াও ভাগ্নের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটি সমুদ্রকে উপহার দেন মামা। এমনকি খাদ্য হিসেবে সমুদ্রে বিসর্জন দেন নিজের স্ত্রীকেও।

মামার প্ররোচনায় বিহ্বল চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত স্ত্রী হেনাকেও ঠেলে নিয়ে যায় সমুদ্রে— "...মাথাটা ঝিমঝিম করছিল, যেন নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আমার, টের পেলাম। একটু একটু করে এগোই। হাঁটু থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সুঠাম বাঁকা রেখায় কামনার আশ্চর্য রামধনু ফুটিয়ে হেনাও জলের দিকে পা বাড়ায়।...ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিই। মুঠ আলগা করি না যদিও, কেননা আঁকশির মতো বাঁকানো শক্ত আঙুলগুলি দিয়ে আমি বারবার ওর বাহু ও গ্রীবার নরম মসৃণ মাংস অনুভব করছিলাম, অনুভব করতে ভাল লাগছিল। বালুর শেষ প্রান্তে চলে গেছি আমরা। আমাদের সামনে ধু-ধু সমুদ্র ছাড়া আর কিছু নেই; সাদা কঠিন হিংস্র দাঁতের হাঁ নিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে ঢেউ, পিছনে আর একটা, আর একটা...।"

প্রকৃতি এবং মনস্তত্ত্বের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। একদিকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবনের ব্যাপ্তি অনুভব, অন্যদিকে সুস্থ স্বাভাবিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটিয়ে মনোবিকলনের শিকারে পরিণত হওয়া। আদতে এ গল্পের নায়ক নিঃসন্দেহে 'সমুদ্র'। প্রকৃতি এখানে নিজেই একটি চরিত্র। এই সমুদ্র কেবল চেতনার বিস্তার ঘটায় না, চেতনাকে গ্রাসও করে। কিন্তু এই অনুভূতি তো মানুষেরই কল্পনা। কল্পনার আয়ু ক্ষণস্থায়ী। তাই প্রকৃতির ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপে মোহাবিষ্ট ক্ষণবিহ্বল মানুষটি চেতনায় ফেরে একসময়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রতিরোধ প্রবণতায় প্রাণরক্ষা করে হেনাও। সামুদ্রিক উদারতায় সৌন্দর্যদর্শনের সুস্থ মানসলোকে ফিরে যায় দুজনে।

লেখকের বিমুগ্ধ প্রকৃতিপ্রেম এবং প্রকৃতিতে মানবসত্তা আরোপের একটি দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—''কতক্ষণ এভাবে বসে বসে ঘুমোচ্ছিলাম কে জানে; বোধ করি নীলাম্বরের পেয়ালা-পিরিচ ধোয়ার শব্দে এক সময় ধড়মড় করে জেগে মেরুদাঁড়া টান করে সোজা হয়ে বসলাম,...—একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর, সমুদ্রের ওপর, আর সেই পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা রঙের রৌদ্র। আর সেই রোদ শুষে নিতে লুঠ করে নিতে ঢেউয়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে; তারা কলরব করছে, ছুটছে, ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে রূপার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল; যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে বলে নীল পেয়ালা থেকে চুঁইয়ে পড়া সবটুকু আলো শুষে নিতে পেরে ওধারের জল শান্ত গম্ভীর হয়ে আছে।''

জ্যোতিরিন্দ্রের ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বনির্ভর গল্পগুলিতে নারী-পুরুষের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাদা-খাদকের। 'মাংস' শব্দের বারংবার প্রয়োগ ওই সম্পর্ককে রূপকের চেহারা দেয়।

পতঙ্গ

এই পর্যায়ের এক উল্লেখযোগ্য গল্প। এক আদিম রমণী ও কৈশোরোত্তীর্ণ যুবকের সদ্য জাগ্রত অসহায় যৌনবাসনার পরিণতি কাহিনীর বিষয়। অধ্যাপক চক্রবর্তীর স্ত্রী রূপা যেন ঘনান্ধকার জঙ্গল থেকে উঠে আসা কোনো চরিত্র। রিপুর তাড়না তার কাছে একমাত্র সত্য। বত্রিশ বছরের অধ্যাপক অপেক্ষা ছাত্র পলাশ কিংবা নিশীথের লাজুক নরম মাংস তার কাছে অধিক লোভনীয়। ছলনার আশ্রয়ে যে কোনো কৌশলে খাদ্য সংগ্রহ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।

পলাশের দিক থেকে ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। অধ্যাপক চক্রবর্তীর ছাত্র সতেরো বছরের পলাশ সহজে চঞ্চল হয়। ভালোবাসায় আপ্লুত হওয়া কিংবা ঘৃণায় জ্বলে ওঠা তার বয়সের ধর্ম। লাস্যময়ী যুবতী রূপার সান্নিধ্য বিস্তারের আগে পর্যন্ত গোলমোহর ফুলের গাছ থেকে খসে পড়া সোনাঝরা সকাল মুগ্ধ করেছিল তাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে রূপা এসে জাগিয়ে তুলল তার শরীরী চেতনা, সবটুকু মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হল রমণীর

প্রতি। অধ্যাপকের সি আই টি রোডের ফ্ল্যাটের বাইরে চোখ রাখার অবকাশই রইল না পলাশের—"গোলমোহরের সোনাকে পিতল করে দিয়ে রূপা হাসির মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছে জানালার এপারে, যখন তখন। জানালার ওপারে ফাল্গুনের দিনগুলি কার জন্য আসত আমি বলতে পারিনি, অন্তত আমার জন্য তো নয়ই, রূপার জন্যও না। চক্রবর্তীর জন্য? হয়তো তা-ও না। কেননা যতটা সময় তিনি ঘরে থাকতেন রূপার ভুরুর বাঁক, চিবুকের গোল, চোখের রং, গ্রীবা ও কোমরের মোচড় খাওয়া মোচড় দেওয়াগুলি দেখতেন। আমি লক্ষ্য করেছি। ইতহাসের নোট লিখতে বসে কলম থামিয়ে, কে জানে, হয়তো অত্যাচারী তৈমুর কি তোঘলকের রক্তক্ষরা কীর্তিকাহিনী কিছুক্ষণের জন্য ভুলতে চেয়ে অঞ্জন স্থির মুগ্ধ দুটি চোখ মেলে রূপার পিঠময় ছড়ানো চুলের অরণ্য দেখেছেন, অরণ্য-মর্মর শুনেছেন। আমিও দেখেছিলাম, শুনছিলাম। কাজেই বাইরেটা আমাদের কাছে অদৃশ্য ছিল অশ্রুত ছিল।..." কাজেই পলাশ যৌবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা উদ্দামতা ও অস্থিরতা নিয়ে অসহায় পতঙ্গের মতো আত্মসমর্পণ করেছে সর্বভুক অগ্নিস্বরূপিণী রূপার হাতে।

অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে তাঁর কুড়ি বছরের তরুণী পত্নীর নিয়মিত পুরুষবিহারের কথা অধ্যাপকের অজানা ছিল না। ঘরে বসে ইতিহাসের নোট লিখতে কলম থামিয়ে স্ত্রীর রূপসম্ভার, চলতে ফিরতে বিচিত্র বিভঙ্গ তিনিও লক্ষ করেন, মুগ্ধ হন। ঘনীভূত সন্দেহের সত্যতা যাচাই করতে প্রহরায় রেখে যান তাঁরই ছাত্র কৈশোর উত্তীর্ণ পলাশকে। হয়তো কলেজের চতুর্থবর্ষের ছাত্র নিশীথের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রথম বর্ষের নরম, লাজুক মনের সীমান্তরক্ষীটিকে বেশি বিশ্বস্ত মনে হয় তাঁর। কিন্তু শিকারির গোত্রবিচার নেই। অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে নিভৃত দুপুরে রূপা পলাশকেই প্রলুব্ধ করে। আহ্বান জানায়—"ও আমায় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। হাত ধরে টেনে বাথরুমের ভিতর নিয়ে গেল। তারপর দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। আমি কাঁপছিলাম ভয়ে নয়, উত্তেজনায়। 'এসো এসো' মুখে শব্দ ছিল না আর, ওর জলভরা দুই চোখে, নগ্ন নিষ্কম্প দেহে সেই আমন্ত্রণ লেখা ছিল। আমার মাথাটা ওর বুকের মধ্যে টেনে নিল রূপা।"

যৌনতা যখন পাপ ও অপরাধ আক্রান্ত, তখন তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে আরও একটি শব্দ— 'হত্যা'। তাই পলাশ, নিশীথ ইত্যাদি একাধিক পুরুষের সঙ্গে রূপার ধারাবাহিক ব্যভিচার নির্দিষ্ট করে দেয় তার বধ্যভূমি।

ভূতগ্রস্ত অশরীরীর মতো পলাশ মোহিনী রূপার রক্তের স্বাদ নিতে ফিরে ফিরে আসে গোলমোহর গাছ বেষ্টিত সি আই টি রোডের ফ্ল্যাটে। আবিষ্কার করে রূপার বাথরুমে অন্যপুরুষ নিশীথের উপস্থিতি। নিশীথ চলে গেলে পাঁউরুটি কাটা ছুরি দিয়ে রূপাকে খুন করে পলাশ। রূপমুগ্ধ প্রেমিক পরিণত হয় খুনিতে।

কিন্তু খুনটা পলাশের কাছে মুরগি জবাইয়ের মতো অতি সাধারণ এক স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়। তাই অধ্যাপকের কাছে তার বিবৃতি—" বৌদি মুর্গী খাবে, একটা মুর্গী কেটে দিয়ে এলাম।" এই মনোবিকলনই গল্পের বিষয়।

আলোচ্য গল্পে 'কেটলিতে ফুটন্ত জল' চিত্রকল্পে সংগুপ্ত যৌনবাসনা বা আবেগতাড়িত

যৌনাচার ব্যাখ্যা লেখকের অননুকরণীয় শৈলীর এক উদাহরণ। "যেন আমার শরীরটা একটা গরম কেটলি। তখন রূপার স্টোভের ওপর চাপানো কেটলির জল যেমন ফুটছিল আমার চামড়ার নিচের রক্তও সেভাবে শব্দ করে ফুটছিল। কপালের ওপর হাত রাখলাম,.. হাতের তেলো দিয়ে নিজের পেটের গরম অনুভব করে পরে হাতটা দুই উরুর ভিতর গুঁজে দিয়ে আমি মরার মতো পড়ে রইলাম।

পরদিন। সেই দুপুর। স্টোভের ওপর বসানো কেটলির জল শব্দ করছে। চক্রবর্তী কলেজে গেছে। আমি কলেজ কামাই করলাম।"—ডায়েরিতে পলাশের এই স্বীকারোক্তি একাধারে একই চিত্রকল্পে রূপা ও পলাশ, বিকারগ্রস্ত দুই নর-নারীর মানসচিত্র বুঝে নিতে সাহায্য করে।

মহড়া

বিবাহিত জীবনে পারস্পরিক দাম্পত্য প্রেমের অভাবও মানুষকে পরিণতির কোন্ অতলে টেনে নিয়ে যেতে পারে, মনস্তত্ত্বনির্ভর তেমনই এক বিচিত্র কাহিনী 'মহড়া'।

গল্পের নায়ক চিত্ততোষ। তার ঠোঁটদুটো সবসময় নড়ে। দু'হাত পকেটে ঢোকানো। কী যেন বিড়বিড় করে আপনমনে। রাস্তায় তাকে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বুঝি টাকা গুনছে। আদতে তা নয়। কারণ মানুষ লোক দেখিয়ে টাকা গোনে না কখনও।

সমগ্র গল্পে লেখক চিত্ততোষের এ হেন বিকারের একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উত্তরটা শেষ পর্যন্ত দেননি। একটা ইঙ্গিত মাত্র রেখেছেন। যেন পাদপূরণ করবার দায় পাঠকের। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্প রচনার বৈশিষ্ট্য এটাই। তাঁর গল্পে পাঠকের চিন্তার স্বাধীনতা অবাধ। জোর করে বাইরে থেকে নির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য তিনি পাঠকের উপর চাপিয়ে দেন না। অর্থাৎ কোনো ঘটনা বা চরিত্রই অবাঞ্ছিত বা আরোপিত নয় তাঁর কাহিনীতে। কয়েকটা পয়েন্ট, গল্পের তথা জীবনের বিচিত্র গতিপথের কিছু বাঁক চিনিয়ে দেন কেবল। তাঁর গল্পের চরিত্ররা আপনমনে স্বতঃস্ফূর্ত চলাফেরা করে। তারপর পরিক্রমা শেষে একটা গন্তব্যে হয়তো পৌঁছয় কিংবা পৌঁছনো হয় না। শ্যাওলার মতো অবিরত ভেসে বেড়ানো, নয়তো তলিয়ে যাওয়াই তাদের অন্তিম পরিণতি।

'মহড়া' গল্পে চিত্ততোষের অবিরত ঠোঁট নাড়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে লেখক তার সীমিত আয়-এর কথা বলেছেন। কখনও অফিসে তার ইনক্রিমেন্ট বা সম্ভাব্য প্রমোশনের উল্লেখও করেছেন। নয়তো পাওনাদারের কাছে ধার কিংবা চিত্ততোষ নিজে কাউকে বড় রকমের কিছু ধার দিয়েছে কি না. সে কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো যুক্তিই ধোপে টেকেনি শেষ পর্যন্ত।

চিত্ততোষের গোপন দুঃখ অন্য জায়গায়। তার সহকর্মীরা যখন উদ্বৃত্ত অর্থ রোজগারের ধান্ধায় ওভারটাইম নিয়ে ব্যস্ত, সে তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আসে। এসে দেখে গিন্নি বাড়ি নেই। থিয়েটার কিংবা মার্কেটিং-এ গেছে। বাড়ি ফিরে জলযোগের ব্যবস্থাও নেই। অথচ অফিসে দু'খানা টোস্ট এবং এক কাপ-চা চিত্ততোষের দৈনন্দিনের আহার। কাজেই শুকনো মুখে রাস্তায় বেরিয়ে সান্ধ্য কলকাতায় চিনেবাদাম দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ।

দৈনন্দিন চাহিদার অপ্রাপ্তিজনিত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে তখন সামান্য একটা ঘষা সিকির জন্য নিরীহ চিনেবাদামওয়ালাকেই আক্রমণে উদ্যত হয় সে।

গল্পের শেষে চিত্ততোষকে এক যাত্রা-থিয়েটারের সাজ-পোশাক বিক্রির দোকানে ঢুকতে দেখা যায়। নকল একজোড়া গোঁফদাড়ি মুখে এঁটে আয়নার সামনে ট্রায়াল দিতে থাকে সে। মহড়া, কিন্তু কিসের মহড়া? কোনো খুন কিংবা ভীষণ কোনো অন্তর্ঘাতের মহড়া।

লেখক এখানে প্রশ্ন রেখেছেন, কী জাতের বেদনা নিয়ে সে অর্থাৎ চিত্ততোষ পুড়ছে। সমগ্র গল্পে এবং কাহিনীর শেষ পর্যন্ত পাঠককে এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েই তিনি গল্প শেষ করেছেন। অর্থাৎ তার এই অন্তর্ঘাতমূলক ভীষণ সিদ্ধান্তের কারণ কী? মানুষ কখন, কেন অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে?

আদতে চিত্ততোষের এই বেদনার নাম 'নিঃসঙ্গতা'। এক অবহেলিত আত্মার যন্ত্রণাও বলা যায়। প্রাক্ বিবাহিত জীবনে এমন বিকারগ্রস্ত ছিল না সে। বিয়ের পর পরই তার 'ভ্রমরকৃষ্ণ' কালো গোঁফদাড়ির মতোই 'সেলিবেসি'র জীবনের অন্তর্নিহিত সুখ বিদায় নিয়েছে। স্ত্রী অমিতার কাছে চিত্ততোষের অবস্থান গালা আঁটা খামের মতো।— "গালা আঁটা খামের মুখের মতন তার দুই ঠোঁট সেঁটে থাকে একবারও ফাঁক হয় না।"

অমিতা এসে চিত্ততোষের সংসারে যাবতীয় ধারদেনা শোধ করে দিয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য, সংসার সহযাত্রীর ভালোবাসার ঋণ শোধ করে না সে। সংসারে প্রবেশমাত্র সে চিত্ততোষের শখের গোঁফদাড়ি কাটিয়েছে। হরণ করেছে মানুষটির মত প্রকাশের স্বাধীনতাও। কিন্তু ভালোবাসার মানুষটির জন্য তার কোনো ত্যাগস্বীকার নেই। নিজের দিক থেকে কোনো শখ বিসর্জনের তাগিদ নেই। কাজেই স্ত্রীর আবির্ভাবে যে গোঁফদাড়ি বিসর্জন দিতে হয়েছিল, স্ত্রীর অবহেলা, উদাসীনতা কিংবা আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে আবার তা-ই সে মুখে পরে নেয়। কারণ—"ঝোপঝাড়ের ভেতর একটা খরগোশের নড়াচড়া বোঝা যায়। গোঁফদাড়ির আড়ালে মানুষের ঠোঁটনাড়া বোঝা যায় না। চিত্ততোষ এখন গোঁফদাড়ি পরেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে সে—বেহিসেবী। মনে হয় তার ঠোঁট আর নড়ছে না।" গল্পের শেষে যাবতীয় অস্থিরতা নকল গোঁফদাড়িতে ঢেকে নিয়েছে চরিত্রটি। তাই শুরুতে যে ঠোঁট নড়ছিল তা এখন নির্লিপ্ত। কারণ এখন চিত্ততোষ এক ঠাণ্ডা মাথার খুনিতে পরিণত।

একটিমাত্র চার অক্ষরের শব্দ 'ভালোবাসা'—যার যোগ-বিয়োগজনিত কারণে মানুষ শয়তানে পরিণত হতে পারে কিংবা ঈশ্বর। এই তথ্য জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর একাধিক রচনায় নানা ঘটনার মোড়কে জানাতে চেয়েছেন— যা সর্বকালে সর্বযুগে প্রাসঙ্গিক।

দাম্পত্যজীবনে চিত্ততোষ সুখী নয়। সে কারণে পরিপার্শ্বে যাবতীয় সুখের উপচার অর্থহীন। পৃথিবী তার কাছে তেতো হয়ে গেছে। কাজেই খুনের মহড়া।—"যেন পৃথিবীর সব মানুষকে খুন করতে পারলে সে এখন সুখী হয়। গোটা পৃথিবীর ওপর সে ক্রুদ্ধ, বীতশ্রদ্ধ। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।"

সাধারণ এক পথচারীর সামান্য ঠোঁটনাড়া এবং গার্হস্থ্যজীবনের অ-সুখকে অবলম্বন

করে অপরাধজগতের মূল মনস্তত্ত্বটি ধরিয়ে দেন লেখক। একটি মাত্র উপমার প্রয়োগনৈপুণ্যে এক শূন্য, নিঃসঙ্গ এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত জীবনের ছবিকে প্রাঞ্জল করে তোলেন—"চৈত্রের হাওয়া লাগা বাঁশপাতার মতন তার অধরোষ্ঠ কাঁপছে।" বৈশাখ, শ্রাবণ অথবা ফাগুন দিনের খুশির আবহ নয়, চৈত্রের রুক্ষ বিবর্ণতার মতোই চিত্ততোষ নামক মানুষটি একযোগে ক্ষোভ- দুঃখ-ঘৃণা-ঈর্ষা-আক্রোশজনিত অস্থির উত্তেজনায় কাঁপছে।

ব্যবহারিক জগতে চিত্ততোষের মতো অসুখী মানুষ আমরা অনেক দেখেছি। প্রেমহীন, ভালোবাসাহীন এক আপোসমূলক সহাবস্থান তাদের জীবনসত্য। হয়তো সকলেই তারা খুনের মহড়া দেয় না। সকলেই ঘাতক নয়। সে ক্ষেত্রে তারা কেউ নিরুদ্দিষ্টের খাতায় নাম লেখাতে পারে। কেউ জীবনের মূলস্রোত থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্নতা এমনই মর্মঘাতী যে, মানুষটি আপন আত্মার ডাকও শুনতে পায় না (তখন তাকে পাগল বলা চলে)। আবার কেউ কিংবা অনেকেই চিত্ততোষের মতো শেষ পথটি বেছে নেয়। এ ছাড়া আরো একজাতের মানুষের কথা বলা যায়, যাদের অবস্থান সুরের জগতে। যাবতীয় যন্ত্রণার মুক্তি ও আশ্রয়লাভ তারা স্বক্ষেত্রে নিবারণ করে থাকে। কিন্তু একজন যথার্থ শিল্পরসিকও ঘাতকের ভূমিকায় রূপান্তরিত হতে পারেন। এমন অজস্র প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কেন, কীভাবে, সে প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত আজো অমীমাংসিত।

সার কথা হল, সুর এবং অসুর—দুই বিন্দুতে মানুষের অবস্থান। বলা বাহুল্য, জটিল মানবচরিত্রে দ্বিতীয়টির প্রভাব বুঝি বা বেশি। চিত্ততোষের আয়নায় জ্যোতিরিন্দ্র সেই তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বসাধারণ অথবা ব্রাত্যজনকথারই প্রতিফলন ঘটান। ব্যতিক্রমী ভুঁইফোড় কোনো চরিত্রের কথা নয়।

কেমন হাসি

এক হাসিরই বিবিধ বর্ণনা দিতে পারেন জ্যোতিরিন্দ্র। শব্দভেদে গোত্রভেদে হাসির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারান্তর মানবচরিত্র নির্ধারণে কতখানি সহায়ক, তার যোগসূত্র ধরিয়ে দেন তাঁর একাধিক রচনায়।

'কেমন হাসি' গল্পে উত্তমপুরুষে কথকের মন্তব্য—"হুঁ, হাসি নিয়ে আমার গবেষণা। আমার বৌ কেমন করে হাসে, আমার অফিসের বড় সাহেব কেমন হাসে, বড় সাহেবের টাইপিস্ট লায়লা কেমন করে হাসে ও কতভাবে হাসে।" কথক সুব্রতর জবানিতে হরেক হাসির বর্ণনা যেন লেখকেরই গবেষণাজাত উপলব্ধির প্রকাশ। মুচকি, মদির, মোহন, শোভন, দেঁতো, ভেতো হাসি ছাড়াও বাঁদরের মতন খিচখিচ, ভাল্লুকের মতন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ হাসি, দেখন হাসি. কানে শোনার মতো হাসি এমনকি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখার মতো হাসির কথা আমরা জানতে পারি।

কেন্দ্রীয় চরিত্র সুব্রত, স্ত্রী মধুমিতা, টাইপিস্ট লায়লা এবং অফিস বস মি. মুখার্জিকে ঘিরে এই কাহিনীর বিস্তার।

প্রথমে লায়লা—লায়লা সুব্রতর পূর্বপরিচিত। কিন্তু টাইপিস্ট লায়লা তার ভিন্ন রূপ।

আগের লায়লা ছিল লাল চুল, থপথপে, ড্যাপসা শরীর, পিটপিটে চোখের মেয়ে। সে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে হেরে গিয়ে প্রথম হেসেছে তারপর কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছে। কিন্তু টাইপিস্ট লায়লা অন্য মানবী। তার কালো চুল, তন্বী শরীর, দীঘির মতো বিশাল চোখ। নবতম তাৎপর্য হল—লায়লা এখন কেবল হাসে, কাঁদে না। সে হাসির আবার ভিন্ন রীতি। দেখন হাসি, চোখে হাসি, আঙুলে ছুঁয়ে দেখার মতো হাসি।

মধুমিতা—অফিসে লায়লার উপস্থিতি সুব্রতর নবপরিণীতা মধুমিতার মানসলোকে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ দীর্ঘ কুড়ি বছর তার স্বামী এক পাড়ায় ফটিকচাঁদ মিত্তির লেনে এই মেয়ের সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু লায়লার টাইপে অজস্র বানান ভুল শুনে মধুমিতা আশ্বস্ত হয়। প্রতিদিন স্বামীর কাছে লায়লার ভুলের খবর শুনে তৃপ্তিসূচক হাসে এবং সাহেবের সামনে নালিশ করে লায়লাকে বরখাস্ত করানোর পরামর্শও দেয়।

সুব্রত—ডিগ্রিধারী সুব্রত হাজারটা দরখাস্ত দিয়ে, বিস্তর অনুনয় বিনয় ও কাঠখড় পুড়িয়ে যে চাকরি জোগাড় করেছে, হায়ার সেকেণ্ডারি ফেল লায়লার টাইপিস্টের চাকরি তাকে বিস্মিত করে। লায়লার ভুল সংশোধন করে চাকরি রক্ষার জন্য লায়লাকে সতর্ক করে দেয় সে। কিন্তু লায়লা জিভে কামড় দিয়ে হাসে। নালিশের জন্য সুব্রত সাহেবের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু সহসা সাহেবের ঘরে দু'রকম দু'টো হাসির শব্দ শোনে। একটা 'কিচকিচ' অন্যটা ময়দার ডেলার মতো 'হড়হড়' করে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা হাসি।

সাহেবের ঘরে ঢুকে সুব্রতও হাসতে থাকে। সে হাসি আবার গলার কাছে আটকে যাওয়া চড়কমেলার ডুগডুগি বাজার মতো হাসি।

তিনটি হাসির নামকরণও নির্দিষ্ট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। মুখার্জির ভাষায় সুব্রতর হাসি গাধার মতো এবং সুব্রতর ভাষায় সাহেব ভল্লুকের মতো ও লায়লা অবিকল ছুঁচোর মতো হাসছে।

এখন তিনটি বিচিত্র হাসির তাৎপর্য গবেষণায় যে অর্থ প্রকাশ পায়, তা হল— ১. লায়লা বনাম ছুঁচো বনাম স্বৈরিণীর চতুর হাসি। ২. মি. মুখার্জি বনাম ভল্লুক বনাম লাম্পট্যের হাসি। ৩. সুব্রত বনাম গাধা বনাম আহাম্মকের হাসি।

হাতের তালুর সাহায্যে বোল তুলে চড়কমেলায় ডুগডুগি বাজানো হয়। গল্পের কথক সুব্রত যেখানে হাওয়ায় তুফান তুলে বড় সাহেবের ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসতে চেয়েছিল সেখানে সাহেবের ঘরে লায়লাকে দেখে ও সাহেব এবং লায়লার হাসি শুনে তার নিজের অট্টহাসি গিলে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অকস্মাৎ ধাক্কা লাগার মতোই চপেটাঘাত খাওয়ার অনুভূতি হয়। গলায় আটকে যায় তার অট্টহাসি। সুব্রতর হাসি তখন নিছক দন্তপ্রদর্শন। বোকা-বোকা। গাধার মতো।

'কেমন হাসি' গল্পের পরিণতিতে আরো মর্মান্তিক হাসির আভাস। কিন্তু তার আগে মধুমিতার রূপান্তর ও লায়লার প্রতিরূপে পরিণত হওয়ার কাহিনী জেনে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুব্রত অফিসের বস মুখার্জিকে ভল্লুকের মতো এবং লায়লাকে ছুঁচোর মতো বলায় সমস্বরে আরো জোরে হাসতে থাকে দু'জনে। কাজু ও কফি সহযোগে আপ্যায়ন করে সুব্রতকে। স্বামীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে মধুমিতা আগের লায়লার মতো নাকে ঘোঁৎ শব্দ তুলে হাসে। তারপর বিছানায় শুয়ে কেঁদে বিলাপ করতে থাকে। তার ধারণা হয় সুব্রত এবং মি. মুখার্জি লায়লাকে নিয়ে ফুর্তি করছে। কাজেই তার হার। তাই প্রথমে হাসি তারপর কান্না।

স্বামীর সঙ্গে কথাও বন্ধ করে দেয় মধুমিতা। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অফিস থেকে যখন সুব্রতর চাকরি বরখাস্তের নোটিশ আসে, সেই নোটিশ পড়ে মধুমিতা হাততালি দিয়ে জলতরঙ্গ মেঘতরঙ্গের তালে হাসতে থাকে নাচতে থাকে। মধুমিতার দেখাদেখি সুব্রতও হাসতে থাকে। কিন্তু কেন? উত্তরটা কথকের জবানিতেই জানা যাক—"...কারণ দেখলাম মধুমিতার জলতরঙ্গ হাসির সঙ্গে মেঘতরঙ্গ নাচের সঙ্গে তাল দিয়ে বাড়ি ভাড়া রেশন হরিণঘাটার দুধ ইলেকট্রিক বিল মুদিখানা ধোবাখানা কাগজওয়ালা মায় মোড়ের মাথায় সিগারেটের দোকান হাততালি দিয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে। সবকটা হাসি আমি চোখে দেখছিলাম মনে শুনছিলাম আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারছিলাম। তখন নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। তারপর সেই কখন থেকে চৈত্রের খরায় ময়দানে দাঁড়িয়ে পাঁজরা ঝাঁঝরা করে হা-হা-হা-হা হাসছি।"

'ম্যাজিক রিয়ালিজম্' বা জাদু বাস্তবতার প্রয়োগে চরিত্র এবং ঘটনার অন্তর্লীন সত্য তথা অন্তর্বাস্তবতা চিত্রণের অভিনব এই পদ্ধতি গল্পবয়নে এক বৈচিত্র্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করে। কৌতুক মিশেলে ধরা পড়ে সুব্রতর আত্মোপলব্ধি। ভীষণ দুর্যোগ কিংবা ঝড়ে চারপাশের প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে যেমন বিধ্বংসী তাণ্ডবনৃত্য চলে, সুব্রতর চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার খবরে অসহায় মধ্যবিত্তের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ ব্যবহারিক জগৎ ও জীবনধারায় তেমনই ভয়াবহ এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

গল্পে বিষয়গত অভিনবত্ব নেই। তবে সাধারণকে অসাধারণত্বের ব্যঞ্জনাদানে এবং একটি গুরুগম্ভীর সামাজিক অবক্ষয়ের খণ্ডাংশকে এমন সূক্ষ্ম মিমিক্রির আকারে পরিবেশন করায় জ্যোতিরিন্দ্রের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর শব্দের ফলা এতই ধারালো এবং লক্ষ্যভেদী যে পূর্বমুহূর্তেও বোঝা যায় না ঠিক কখন কোন্ অভিঘাতে তিনি পাঠককে পৌঁছে দেবেন উৎকর্ষের চরম বিন্দুতে।

সুখী মানুষ

কে কতদিন বাঁচে সেটা বড় কথা নয়, কীভাবে বাঁচে, সেটাই কথা। ব্যক্তি বিশেষে, চরিত্রভেদে, পরিবেশ প্রেক্ষিতে প্রতিটি মানুষে জীবনধারা ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু প্রতি জীবনক্রম, তার আজন্মলালিত ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে একটা মতাদর্শে পৌঁছয়। সেই মতাদর্শ সত্যের নৈর্ব্যক্তিক মুখ। আমরা জানি—'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'। কিন্তু মোহবিদ্ধ আচ্ছন্ন মানুষ কখনও দুঃখটাকে সারসত্য জেনে নিজের ছায়াকে বড়

করে দেখে। কখনও কেউ সেই ছায়াকে উপেক্ষা করে পাশ কাটিয়ে সুখী হয় বা হতে চায় তার সীমিত গণ্ডির মধ্যে।

তেমনই এক 'সুখী মানুষ' মুরারী। তার ঠিক চরম বৈপরীত্যে অবস্থান শৈশবের বন্ধু সারদাবাবুর।

ব্যক্তিজীবনে ও কর্মজীবনে আগাগোড়া সফল সারদা। বাড়ি, গাড়ি, ছেলেমেয়ের উচ্চপদে চাকরি—অর্জন করেছেন সবই। অন্যদিকে বেমালুম ব্যর্থ মুরারী। মুরারীর অসুস্থ স্ত্রীর ঠিকানা স্যানেটোরিয়াম। মেয়ে অকাল বিধবা এবং ছেলে বাইশ-তেইশেই বখাটে, উপার্জনহীন। মুরারী নিজেও কিছু কৃতী পুরুষ না। ওকালতি পেশায় ব্যর্থতাদরুন অফিসে সামান্য বেতনে এক সাধারণ চাকরিতে তার যোগদান। তারপর ছাঁটাই কর্মীদের দলে পড়ে বেকার। অর্থদায়ে পৈতৃক বাড়িও বেচে দিতে হয়েছে মুরারীকে। কিন্তু পরিস্থিতি নত করতে পারেনি তাকে। মুরারী সদাহাস্যময়।

সারদার দৃষ্টিতে মুরারী 'এক জ্বলন্ত অনিয়ম'। বস্তুতপক্ষে অজানা বিষাদে আক্রান্ত সারদা আনন্দলাভের উপায় স্বরূপ খেলা, থিয়েটার, সিনেমা, তীর্থদর্শন, দেশভ্রমণ—কিছুই বাকি রাখেননি। উৎসাহ বা আবেগ খুঁজে পান না কোনো কিছুতেই। এমনকি মুরারীর মতো যৌবনদীপ্ত স্বাস্থ্যও তাঁর গত। তাঁর মনে একটাই প্রশ্ন— "তবে কোথায় আনন্দ, কিসে আনন্দ এবং কতটা আনন্দ লাভ করলে মুরারীর মতন ব্যর্থ বিপর্যস্ত একটি মানুষ হো-হো করে হাসতে পারে। বন্ধুর বাড়ি চড়াও হয়ে একটানা দু'ঘণ্টা বসে গল্প করতে পারে!"

অনুরূপ প্রশ্ন পাঠকেরও। তীব্র সমস্যাজর্জরিত দিনগত পাপক্ষয়ের গ্লানিতে ধ্বস্ত প্রতিটি মানুষ। সত্যানুসন্ধানী জ্যোতিরিন্দ্র সেইসব বেদনাতাড়িত গভীর জীবনবোধ-সঞ্জাত প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে চলেন কিংবা নিরুত্তর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন পাঠককে। হয়তো সমাধান নেই। লেখক সে চেষ্টাও করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ক্লীব সমাজকে আঘাত করা। সে ক্ষেত্রে কেবল কয়েকটি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে পাঠককে জীবনসত্য অনুসন্ধানে ব্রতী করাই তাঁর উদ্দেশ্য— পরোক্ষে যা আত্মানুসন্ধানও বটে।

আদতে ব্যবহারিক মন সহসা এই অনুসন্ধানের মর্মলোকে উপনীত হতে চায় না। হাজারো কৌতূহল তার। হাজারো প্রশ্ন। হেঁয়ালি নয়, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কাজের পিছনে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করাই তার সহজাত প্রবৃত্তি। কাজেই মুরারীর সদানন্দ রূপ বা দুঃখসহনের উৎসকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ বলে অনুমান করেন সারদা। আবার মুরারীর স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে কোনো এক শ্যালিকার মেয়ের উপস্থিতির খবরে সংশয়াচ্ছন্নও হন। মোহভঙ্গের পাশাপাশি অনুভব করেন মোহভঙ্গজনিত বেদনা।

মুরারী কিন্তু স্বজন-বন্ধু-প্রতিবেশীর এই নিষিদ্ধ কৌতূহল অথবা নীরব তীর্যক প্রশ্নের মুখে ভ্রূক্ষেপহীন। কাজেই রটনার সত্যতা যাচাই করতে সারদার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও যখন এক অনুক্ত প্রশ্নচিহ্নের মতো হাজির হন মুরারীর দরজায়, স্বভাব-বৈরাগী মানুষটি অক্লেশে মেলে ধরে নিজেকে। গল্পে গল্পে জানা যায়, আগের দিন ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে 'রূপালী ঝালরের মত বৃষ্টি'র ঝরে পড়া দেখতে গিয়ে মুরারী কুকুরের কামড় খেয়েছে। কিন্তু

সেটা তার কাছে বড় কথা নয়, বৃষ্টি ভেজার আনন্দ ষোলআনা উপভোগ করাই তার কাছে শেষ কথা। বন্ধু সারদার উদ্দেশে মুরারীর বক্তব্য—"ছোট ঘর-ঘিঞ্জি তো ভাল—আজ সকালে টেলিগ্রাম পেয়েছি। রাধারাণী, আমার স্ত্রী ক'বছর ধরে স্যানেটোরিয়ামে পড়ে আছে তুমি জান। মাঝখানে একটু ভাল হ'য়ে উঠেছিল। আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে খবর পেলাম— কাল রক্তবমি হয়েছে— দুঃসংবাদ, কিন্তু তা বলে বিকেলের এই রক্তিম আকাশ আশ্চর্য রং আমি কম উপভোগ করছিলাম কি—...।"

বাস্তবিক কোনো অবস্থাতেই মুরারীর শোক-সাগরে নিমজ্জিত না হওয়া কিংবা আঘাত ভুলে থাকার স্বাভাবিক প্রবণতা তার দিক থেকে এতই ঐকান্তিক, এতই স্বাভাবিক যে, মুরারীর সুখ সম্ভাবের উৎসমুখ সম্পর্কে তার শ্যালিকা কিংবা নারী সংসর্গের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায়। স্বয়ং লেখকও অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করেননি।

গল্পের বৈঠকখানায় একবারমাত্র শ্যালিকাব প্রবেশ (জলখাবারের প্লেট হাতে) ও প্রস্থান কোনো ঢেউই তোলে না সারদা এবং পাঠক হৃদয়ে। নতমুখ সারদা তখন প্রশ্নহীন।

একইসঙ্গে লেখকের নির্মাণবীতির কুশলী দক্ষতার কাছে প্রশ্নহীন হয়ে পড়ি আমরাও। কেননা তিনি কেবল অল্পে সুখী হওয়া কিংবা সুখী হওয়ার সহজাত প্রবণতার কথা বলেন না। সুখের উৎসমুখ খুঁজে ফেরা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন, দূষণমুক্ত জটিলতাবর্জিত এক হৃদয়ের কথা—যা সঞ্চয়ে রাখলে সুখের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। সুকুমার রায়ের 'রাজার অসুখ' গল্পটি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত এক সহায় সম্বলহীন গাছতলার ভিক্ষুকটির জীবনদর্শন নির্ধারণ করে সুখের সংজ্ঞা। বস্তুত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেগ নয়, গাছতলায় নৈর্ব্যক্তিক জীবনযাপনের প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সুখের কারণ ব্যক্ত করেন লেখক।

'সুখী মানুষ' গল্পেও প্রকৃতির কোলে আশ্রয় সন্ধানের নির্দেশ দেন জ্যোতিরিন্দ্র। সাধক কবির মতোই তিনি নিজেও যেন খুঁজে ফেরেন আনন্দের উৎসমুখ। খুঁজে ফেরে তাঁর কাহিনীর কুশীলবেরা। সেই সঙ্গে আমরাও। খুঁজতে খুঁজতে সারদার মতো আমরাও জানতে পারি—"সুখ অসুখ। টাকার এপিঠ ওপিঠ। টাকাটা গড়িয়ে চলে। তারপর এক সময় এক দিকে কাত হয়ে পড়ে যায়। হয়তো তখন সুখের পিঠটা ওপর দিকে থাকে। দুঃখের দিকটা চাপা পড়ে যায়। আমরা তখন ভাবি সুখটা সব। দুঃখটা কিছু না। দুঃখ নেই। মানুষ চিরসুখী। কিন্তু তা কি হয়। আবার গড়িয়ে গড়িয়ে চলা। এবং এক সময় কাত হয়ে পড়া। এবার অসুখের দিকটা ওপরে। আর তাই দেখে আমরা মাথায় হাত দিয়ে ভাবি। দুঃখী চিরদুঃখী এই মানুষ।"

গল্পের শুরুতেই সারদা তার আবাল্য বন্ধু মুরাবী সম্পর্কে বলেছেন, 'মুরারী মানুষ না।' আরো একটু বিস্তার ঘটিয়ে বাক্যবন্ধকে আমরা উপস্থাপিত করতে পারি এইভাবে যে, মুরারী কোনো পূর্ণবয়স্ক মানুষের নাম নয়। আদতে শিশুর মতো চির অনুসন্ধিৎসু মন এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ যে সত্যের দরজা খুলে দেয়— তারপর সুখ বা আনন্দ-র উৎস খুঁজতে যাওয়ার প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে পড়ে। কারণ দর্শন তো এ কথাও বলে, সুখের পিছনে যত ছোটা যায়, ততই হারিয়ে যেতে থাকে সুখ।

সামগ্রিক বিচারে এ কথা বলা যায় 'সুখী মানুষ' গল্প মুরারী নামক এক চরিত্রের উপকথা—যার দরজায় দুঃখ কড়া নাড়ে অবিরত। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করায় যথেষ্ট আগ্রহী নন মানুষটি। রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণময় পৃথিবীর আনন্দধ্বনি শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় কান পেতে থাকেন তিনি। খুলে রাখেন চোখ। দুঃখ-সুখ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিত নন তিনি। সারদার মতো গভীর চিন্তা বা দার্শনিক তত্ত্বকথা আচ্ছন্ন করে না তাঁকে। দুঃখসাগর থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অনর্থক হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি তাঁর অনিবার্য ক্রিয়া নয়। বরং এক সাধারণ মানুষের মতো সহজ হৃদয়ে বিশ্ব প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য সম্ভার আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা নিবারণই তাঁর জীবনের ঐকান্তিক আকুতি।

সংহার

বস্তুজগতে বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্য সংগ্রহ প্রাণীর স্বধর্ম। সৃষ্টির আদিকাল থেকে স্বতঃসিদ্ধ এ নিয়ম। আবার তাগিদ বা প্রয়োজন শব্দটা আপেক্ষিক, এও নিশ্চিত। মানুষ নিজেই জানে না কিসে তার প্রয়োজন এবং কতটা। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর রূপান্তর ঘটতে পারে এবং অবশ্যই মাত্রাবোধ। কাজেই কেন, কীভাবে খাদ্যসংগ্রহ, এ প্রশ্ন মাথায় রেখেও বলা যেতে পারে—কোন্ পরিস্থিতিতে করে। সেক্ষেত্রে 'সংহার' এবং 'সংহারক'-এর সংজ্ঞাও নিঃসন্দেহে পরিবর্তনযোগ্য।

'সংহার' এক বন্ধ কারখানার ছাঁটাই কর্মীর পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহের কাহিনী। আবার এ কাহিনী সুখী-সমৃদ্ধ স্বাভিমানী কিশোরীমোহনেরও গল্প। এ গল্প এক টিকটিকির। শিকার ধরার সময় যে প্রাণীটি নিঃস্পন্দ, স্থির, সতর্ক। আবার শিকার গ্রাস করার পর চরম উদাসীন। গল্পের কথক জানিয়েছেন, "...এত নীরব স্থির নিঃস্পন্দ থাকতে জানে সে। হুঁ নিরীহ উদাসীন অন্যমনস্ক।" ...বিত্তবান কিশোরীমোহনের দৃষ্টিতে জনৈক পাখিওয়ালা এবং টিকটিকি—দুই-ই কুচক্রী শয়তান। দরজা খোলা খাঁচার ভিতর একটি পাখি রেখে বাইরের পাখিদের প্রলুব্ধ করে পাখিওয়ালা। বনের কোনো পাখি এসে খাঁচাতে ঢুকলেই পাখিওয়ালার পরিকল্পিত পথে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বন্ধ হয়ে যায় খাঁচার দরজা। অদ্ভুত উপায়ে শিকার করা এই পাখি সে বিক্রি করে দেয় বাজারে। কিশোরীমোহনের ভাষায় এই পাখিওয়ালা 'সংহারক'।

গল্পটি শেষ হয়েছে দুটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং একটি মাগুর মাছ বধের পরিকল্পনায়। প্রথম মৃত্যু : কিশোরীমোহনের অন্যমনস্কতায় তাঁরই পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে টিকটিকির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

দ্বিতীয় মৃত্যু : জনৈক পাখিওয়ালার। দীর্ঘদিন খাঁচায় পাখি ধরা না পড়ায় লোকের বাড়ি চুরি করে পালাতে গিয়ে কিশোরীমোহনের গাড়ির চাকার সঙ্গে সংঘর্ষজনিত কারণে।

তৃতীয় : আয়ুর দৈর্ঘ নিরঙ্কুশ রাখতে প্রেসার এবং ডায়বেটিস-এর প্রতিরোধ কল্পে বাজার থেকে ত্রিশটি কালো চকচকে পরিপুষ্ট মাগুর মাছ এনে কিশোরীমোহনের উত্তেজিত হয়ে পড়া।

গল্পের পরিণতিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে 'সংহার' শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা কী। কিংবা

যে কোনোরকম 'বধ'-কেই 'সংহার' আখ্যা দেওয়া যায় কি না। কারখানার ছাঁটাই কর্মী বেকার মানুষটির পাখি ধরে ব্যবসা করা ছাড়া উপায় ছিল না। যদিও শিকার সে বাজারে বিক্রি করে আসে, হত্যা করে না। অন্যদিকে টিকটিকি নিছক মনুষ্যেতর প্রাণী। পোকামাকড় তার একমাত্র খাদ্য। পাখিওয়ালা এবং টিকটিকির প্রাণহানিকে কিশোরীমোহন 'পাপের বেতন মৃত্যু' অভিধায় চিহ্নিত করেন। অথচ মনের অস্বচ্ছ আয়নায় ধরা পড়ে না তার আপন স্বরূপটি।

কোথাও কোনোখানে তিনিও খাদকের ভূমিকায়। গল্পের কথক বন্ধুর কাছে মাগুরমাছের আসন্ন পরিণতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে খুশির উত্তেজনায় তিনি চোখ বড় করে ফেলেন। কথকের ভাষায়—"মানুষটার চোখ দুটো দেখতে আমার ভয় করছিল।" কারণ সে চোখ এক ঘাতকের—যা টিকটিকির থেকেও ভয়ংকর। শিকার নিঃশেষ করার কিংবা কল্পিত সংহারের উল্লাসে একইরকম উদাসীন, অন্যমনস্ক।

ছোট্ট একটি গল্প, তুচ্ছ কিছু উপকরণের সাহায্যে অত্যন্ত মুন্সিয়ানায় লেখক ফুটিয়ে তোলেন এক নিখুঁত সমাজচিত্র। অকৃত্রিম ভাষায় জানিয়ে দেন শিক্ষাভিমানী, স্বার্থপর, কপট, আত্মকেন্দ্রিক, আচ্ছন্ন-চৈতন্য মানুষের কথা।

তৃতীয়পক্ষের সমালোচনায় সতত মুখর, আত্মপক্ষসমর্থনকারী আপামর মানুষ—যারা প্রাণীহত্যার কুফল সম্পর্কে, পরিবেশবাদী আন্দোলনের উপযোগিতা প্রসঙ্গে সভা-সমিতি-মিছিলের জোয়ার ডেকে আনে, মনের গহন কোণে তারাও কি অন্ধকারের যাত্রী নন! পথ-চলতি কোনো দুর্ঘটনা অথবা অপঘাতজনিত মৃত্যুতে চরম উদাসীন মানুষের আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য 'সংহার' শব্দটির সবরকম ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করাই লেখকের উদ্দেশ্য। লেখক ইঙ্গিত করেছেন বৌদ্ধিক চাতুর্যের মায়াজাল বিস্তারে সম্মোহন সৃষ্টির গোপন গুহ্য ছবিটির প্রতিও। কিশোরীমোহন চরিত্রটির আয়নায় তারই প্রতিফলন।

নামকরণে 'সংহার' তাই ব্যাপকার্থে তথাকথিত সম্প্রদায়ের গল্প—যাঁরা প্রতি অধঃস্তনকে সংহার বা বিনাশের স্পৃহায় অর্ধসিক্ত স্বার্থের জিহ্বা প্রসারিত করে অতি সঙ্গোপনে বসে থাকেন একটি শিকারের আশায়। তারপর শিকারকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার (exploit) করে প্রলম্বিত করেন আপনার আয়ু। পদোন্নতিজনিত. বিত্তজনিত কখনো খ্যাতিজনিত। কিশোরীমোহন ওরফে তাবৎ আত্মগর্বী, সহানুভূতিশূন্য মানুষই সে ক্ষেত্রে সংহারক।

ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার

আমরা জানি জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার নায়ক এক অস্থির সময়। অস্থিরতাসঞ্জাত স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা, নাম না জানা আতঙ্ক এবং নিষ্ঠুর উদাসীনতার শিকার তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টি নিছক কতকগুলি বাস্তব ঘটনার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নয়। বরং তাঁর অনন্য শব্দসম্ভারের ধাঁধায় গল্পের মধ্যে গল্পকে খুঁজে নিতে হয়।

আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত কোনো নিটোল কাহিনীবয়ন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন পথচলতি কোনো নগণ্য মানুষের তাৎক্ষণিক কোনো অনুভূতির কথা। সেই অনুভূতি নিছক বাস্তবতার গণ্ডি পেরিয়ে কখনো অন্তর্বাস্তব, কখনো অধিবাস্তব জগতের সন্ধান দেয়—যেখানে মানুষটির যাবতীয় তুচ্ছতা হঠাৎই পেয়ে যায় বিশালত্বের মহিমা।

এখানেও এক নিষ্ঠুর কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনবেদ ধরতে চেয়েছেন লেখক—যা তাবৎ মধ্যবিত্ত চেতনার প্রতিনিধি সূচক।

আমরা এও জানি জীবন কোনো ইচ্ছাপূরণের গল্প নয়। বরং প্রতি পদক্ষেপে ইচ্ছের টুঁটি চেপে ধরার মূক আর্তনাদ। অথচ বেড়ালেরও হাঁচবার সাধ। 'ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার' গল্পের টি মজুমদার সেই মধ্যবিত্ত বা বিত্তহীনদের প্রতিনিধি এক মনুষ্যেতর প্রাণী প্রায়, যিনি তাঁর নিতান্ত শ্রীহীন দীর্ণ জীবনেও কিছু সময়ের জন্য হাঁফ ছেড়ে প্রাণভরে বসন্তের শুদ্ধ বাতাসে ফুসফুস পূর্ণ করতে চান। ডলি, মলি, জুলি এখানে রঙিন প্রজাপতির প্রতীক—টি মজুমদারের হৃদয়ের কক্ষপথে যাদের আনাগোনা বসন্ত বাতাসে সুরভিত ফুল পাখি মুখরিত গুঞ্জনের মতোই প্রাঞ্জল কাব্যময়, বৈচিত্র্যের স্বাদবাহী।

কিন্তু এ গল্প নিছক টি মজুমদারের নয়। তথাকথিত আত্মসুখী, উদাসীন অবজ্ঞার নির্মোকে ঢাকা কৃত্রিম জগতের আববণ উন্মোচনেরও গল্প। কাজেই টি মজুমদারের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক জানিয়ে দেন, দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আমাদের চোখে দেখা দৈনন্দিনের যাতায়াত পথে মানুষটির চলাফেরা প্রায় প্রতিদিন। কখনো বাসস্টপে বাসের অপেক্ষায়, পার্কে ল্যাং খাওয়া পায়ে ডেটল তুলোর ব্যান্ডেজ দিতে, পাইস হোটেল থেকে খেয়ে বেরিয়ে আসার সময় কিংবা কোনো মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে অ্যাটাচি হাতে নিষ্ক্রমণরত টি মজুমদারকে দেখা গিয়েছে বহুবার।

আবার টি মজুমদারকে আমরা দেখেও দেখি না।—এই একটি বাক্যের মধ্য দিয়ে লেখক যেমন আমাদের, অর্থাৎ পাঠক তথা সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে গল্পের অন্যতম চরিত্রের সামিল করে নিয়েছেন, তেমনই তির্যক অঙ্গুলি নির্দেশে জানিয়ে দিয়েছেন নাগরিক চেতনার মূঢ় অন্ধত্বকে।

দীর্ঘ কুড়ি বছর প্রত্যক্ষ করেও একটা মানুষ, তার সুখ-দুঃখ আমাদের কাছে অপরিচিত থেকে যায়। কারণ আমাদের দৃষ্টি একমুখী। দৃষ্টির উদারতা নেই আমাদের। আমরা আলাপিত হবার আগ্রহই বোধ করি না। টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙালির অংশ আমরা। আমাদের প্রত্যেকের আছে চাহিদাপূরণের দৌড়। স্ট্যান্ডে বাস এসে দাঁড়ালে যেমন করে হোক অন্যকে পিছনে ফেলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

'ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার' গল্পে যে নির্বেদ জীবনসত্য আমাদের নাড়া দেয় তা পরপর সাজালে দাঁড়ায়—

ক. ভিড়ের মিছিলে কেউ কারো খবর রাখে না।

খ. যদি কখনো খবর রাখার প্রশ্ন ওঠে, একটি মানুষ অর্থাৎ টি মজুমদারকে দাঁড় করাতে হবে নির্জনতার মুখোমুখি। নগর কলকাতার জনারণ্য ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত কোনো শহরতলি— 'বাঁশদ্রোণী', 'বামনগাছি' কিংবা 'বেড়াচাঁপা' জাতীয় কোথাও।

গ. এইভাবে প্রাত্যহিক চেনাজগতের বাইরে একান্তে মুখোমুখি হলে দেখা যাবে তার কপালে একটা কাটা দাগ—জন্মক্ষত। অবদমিত বাসনার ক্ষত। নিছক sexual urge-এর মাপকাঠিতে বিচার্য নয় এই বাসনাজনিত ক্ষত। এ সেই চিরন্তন অভীপ্সা। অন্যের চোখের আলোয় নিজেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেখবার ইচ্ছা। প্রাত্যহিক তুচ্ছতার গ্লানি ছাপিয়ে অন্য এক দৈত্যসমান (আমরা যাকে দ্বিতীয় সত্তা বলি) বিশাল টি মজুমদারকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা।—"দেখি চোখের পলকে পাঁচ ফুট লম্বা রোগা মানুষটা একটা বটগাছের মতন বিশাল প্রকাণ্ড মূর্তি ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, কপালটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে, হাত দুটো এত লম্বা দেখাচ্ছিল, ধর্মতলার মোড়ের সাঙ্গুভেলী চায়ের দোকানের উঁচু ছাদটা অনায়াসে ছুঁতে পারে তখন, পা বাড়ালেই সোজা ওয়েলেস্‌লি চলে যায়। কী কাণ্ড। পায়ের জুতো জোড়া আর জুতো মনে হচ্ছিল না, যেন দু'পায়ে দুটো লাইফবোট পরে আছে, হাতের অ্যাটাচিটাকে মনে হচ্ছিল গদরেজ মার্কা ঢাউস আলমারি।"

ঘ. টি মজুমদার হেন মধ্যবিত্ত মাত্রই কপালে বহন করে থাকেন একটা দাগ। আজীবন। কারণ তাঁদের সকলের জীবনের গল্প হরেদরে এক। কোনো বৈচিত্র্য নেই। এবং এই সত্য যখন জানা হয়ে যায়, তখন উল্লিখিত মানুষটিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কাজেই লেখক ওরফে কথক বলেন—"আমি জানি, আমার একদিন এমন হয়েছিল, বাঁ কপালের পুরনো ক্ষতচিহ্নটা দেখতে দেখতে আমার মতন আপনিও মজুমদারের শৈশবের কথা, বাল্যের কথা ভাবছেন। ...কেননা, তখন আপনার নিজের শৈশব, পিছনে ফেলে আসা কোমল দিনগুলির কথা মনে পড়তে পারে।...আপনার বুকে ব্যথা জাগবে। এবং অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মানুষটার সঙ্গে আপনি একাত্মতা অনুভব করবেন।"

ঙ. টি মজুমদারের প্রতিরূপে আমরা। আমাদের প্রত্যেকেরই স্ত্রী ছেলেমেয়ে, ছোটখাটো চাকরিসহ একটা সংসার আছে। একে অন্যের জন্য প্রতীক্ষাও আছে। তা সত্ত্বেও এই অসুখজনিত ক্ষত। কারণ সংসারের ঘানিতে অবিরত পিষ্ট হতে থাকা কলুর বলদের মতো একঘেয়ে জীবনে আসন্ন বার্ধক্যের চেতনা। চেনা ছকের বাইরে জীবনের রোদ-রস সব আস্বাদনের আগেই বেলাশেষের ডাক।—"ধেড়ধেড় করে বয়স বাড়ে, বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের অসুখটাও বাড়ে, কানের কাছে রাতদিন শিঙা ফুঁকে কে যেন কেবল চেঁচিয়ে বলছে, গেল গেল আর একটা বসন্ত গেল, আর একটা চৈত্র কাবার, কিছুই পেলে না তুমি চাঁদ, কেউ কাছে এল না, ডলি, মিলি, জুলি, লিলি. নেলি, চামেলিরা ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে—"।

এ পর্যন্ত আলোচনায় বলা যায়, মানবজীবন কেবল এক বা একাধিক তত্ত্বের সমষ্টি নয়। কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র যে 'ম্যাজিক আই' বা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে জনৈক টি মজুমদার তথা আপামর মধ্যবিত্তের 'গোপন ক্ষত' দেখে ফেলেছেন, তা দেখার চোখ সর্বজনে থাকে না। বলা যাক, ব্যক্তিক অথবা নৈর্ব্যক্তিক—সর্বসাধারণের জীবনপর্যায়ের কোনো ক্ষেত্রেই নিছক তত্ত্বকথা অনুধাবনের অবকাশ নেই। অনুরূপ কারণেই নিজেকে দেখা (আত্মানুসন্ধান) কিংবা পরিপার্শ্বে বিচরণকারী অসংখ্য টি মজুমদারকে একান্তে আলাদাভাবে

দেখার অবকাশও অর্থহীন। কারণ অবশ্যই আত্মকেন্দ্রিকতা। লেখকের ভাষায় এ এক মারাত্মক ব্যাধি—"আমরা সকলেই এই রোগে সংক্রামিত। হাজার দিন একটা মানুষকে এখানে সেখানে দেখছি, কিন্তু যেহেতু সাক্ষাত পরিচয় নেই সেই কারণে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা বলি না, কি জানি যদি আমাদের আত্মসম্মান ক্ষয়ে যায়।"

বস্তুত এই আত্মকেন্দ্রিকতা এবং অদ্ভুত মনোবিকলনের ফসল অধিকাংশ মানুষের কাছেই নির্জনতার স্বাদ, গোপনে একা কিংবা অন্যকে পরখ করার অনুভূতি অজ্ঞাত। সেক্ষেত্রে লেখকের 'একাত্মবোধ'-এর তত্ত্ব হয়তো তাদের জীবনে প্রয়োগযোগ্য সত্য নয়। কিন্তু টি মজুমদারের মতো তাদের মনের আঙিনায় বসন্তের আকাঙ্ক্ষা সত্য। আরো সত্য ওই কাটা দাগ।

শৈশব, কৈশোর, যৌবনের অমূল্য সময়গুলি সাংসারিক চাহিদার বৃত্তে খরচ করে প্রৌঢ়ত্ব কিংবা বার্ধক্যের সীমায় উপনীত মানুষগুলির সুতীব্র হাহাকাব তখন ডলি মলি তথা যৌবনের চিরবসন্তের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষায় কিংবা আপনার চিরপরিচিত ক্ষুদ্র তুচ্ছ রূপ ঝেড়ে ফেলে অনন্যঅসাধারণ হয়ে ওঠার অভিলাষে মরীয়া হয়ে ওঠে। আর তখন নির্জনতা প্রার্থীত না হলেও শহর কলকাতায় উদ্ভুত পরিস্থিতি উদ্ভট কোনো নির্জনতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় নিঃসঙ্গ মানুষগুলিকে।

—"বলা নেই কওয়া নেই গাড়ি ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে যায়, রাস্তায় চরছিল হাজার মানুষ, হঠাৎ সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, দোকানপাট দুদ্দাড় বন্ধ হয়ে গিয়ে বড় বড় তালা ঝুলতে লাগল, পথের দুপাশে বাড়িগুলিকে মনে হয় তখন সাদা সাদা কঙ্কাল, লাইট পোস্টের মাথার আলোগুলি ভূতের চোখ হয়ে জ্বলতে থাকে, ধারে কাছে গাছটাছ থাকলে মনে হবে গাছের মাথায় ভূতের ফিসফিসানি চলছে, আপনার গায়ে একফোঁটা বাতাস লাগছে না, অথচ পাতাগুলি কেমন ফুরফুর করে নড়ছে। রকমসকম দেখে আপনার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, আড়ষ্ট হয়ে যাবেন, যেদিকে চোখ ফেরাবেন সব খাঁ খাঁ করছে।"

বাস্তবিক রাজনৈতিক দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা হঠাৎ বিস্ফোরণজনিত কারণে অঘোষিত কারফিউ-কবলিত কলকাতা শহরের এমন নির্জন (ভূতে ধরা কলকাতা) চেহারা আমবা প্রত্যক্ষ করেছি বহুবার। হয়তো তেমনই কোনো শ্মশান-সম স্তব্ধ নির্জনতায় বিচিত্র মানবচরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। যে মানুষ বিয়াল্লিশটা বছর মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ টি মজুমদারের মতো যত্রতত্র উঞ্ছবৃত্তি করে নেংটি ইঁদুরের জীবন যাপন করেছে— সেও শহরের শ্মশানভূমিতে, শব্দহীন সময়ের অন্তহীনতায় হঠাৎ সুযোগ বুঝে অতিমানবের উচ্চতায় পৌঁছে গেলে তারই মতো দলচ্যুত, কেন্দ্রচ্যুত কোনো ইঁদুর দেখলে দৈত্যের মতো ক্ষমতার আস্ফালন দেখাতে শুরু করে।

প্রশ্ন রাখা যায়, 'ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার' তা হলে একাত্মবোধক কোনো চৈতন্যোদয়ের গল্প, না মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রতিভূ অতৃপ্ত মানুষগুলির চেনা-গম্বুজের সীমানা ছাড়িয়ে হঠাৎই কিছু হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধের গল্প!

এ প্রশ্নের নিরসন জরুরি ছিল না লেখকের কাছে। তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এই বলে—যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নির্জন প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, যদি

বড় (বিত্তবান) এবং বুড়ো হয়েও ফেলে আসা দুরন্ত শৈশবের মতো এক সহজ শিশুমন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লালন করা যায়, তা হলে হয়তো বা নস্টালজিক চেতনাবিধুর মানুষ পারস্পরিক দুঃখ বা ক্ষত ছুঁয়ে যেতে পারেন এবং হয়ে উঠতে পারেন অনন্য ক্যাথারসিস জনিত আত্মীয়তার শরিক।

'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা'

এক বা একাধিক প্রাণ যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে প্রশ্নচিহ্নের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কমবেশি দার্শনিক চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমরা। সেই দর্শনচিন্তা কখনো ঈশ্বর অভিমুখী, কখনো না-ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী কিংবা সংশয়বাদী—প্রত্যেকেই বোধহয় একটা নির্বেদ অনুভূতির স্তরে একসময় উপনীত হন, যখন এ কথা ভাবতে দ্বিধা থাকে না যে, পরম করুণাময় কিংবা চরম নিষ্ঠুর অদৃশ্য কোনো ক্রীড়নক এই পৃথিবী, এই খেলাঘরে আমাদের দিনযাপনের মেয়াদ নির্ধারণ করে চলেছেন। সেখানে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। আমরা সেই অদৃশ্য শক্তি বা সময়ের হাতের পুতুলমাত্র অর্থাৎ—''নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে / নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।''

'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা' এমনই কোনো গূঢ় উপলব্ধির মর্মকথা। গল্পের পটভূমি একটি হাসপাতাল। সবাই রক্তহীনতায় ভুগছে অর্থাৎ অ্যানিমিয়া। গল্পের কথক রোগীদেরই একজন—ঠনঠনের মহামায়া প্রেসের কর্মচারী উমাপদ নন্দী। অকৃতদার। নিতান্ত অভাবী। হাসপাতালে একই সঙ্গে প্রফেসর, জোতদার, উকিল, ঘড়ির দোকানের মালিক, স্কুল-মাস্টার, রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের কর্মচারী—সকলের একত্র বাস। কেউ ফ্রি বেডে, কেউ ক্যাবিনে।

হাসপাতালটির অদ্ভুত নান্দনিক সৌন্দর্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। রোগের চিন্তায় মানুষগুলি যাতে আরো মুমূর্ষু না হয়ে পড়েন—সেকারণ প্রফুল্ল রাখার বিচিত্র উপকরণে সজ্জিত হাসপাতালের ঘরগুলির দেওয়ালে একসঙ্গে সাতটি রঙ এমনভাবে চিত্রিত, মনে হবে—'মেঘের কোলে রোদ' উঠে রামধনুর ইন্দ্রজাল ফুটে বেরোচ্ছে। সিলিং-এ পদ্মবনের ফ্রেসকো। মধ্যিখানে হংসমিথুন। মেঝেতে সবুজ ঘাসের গালিচার মতো কার্পেট, জানালায় মানিপ্ল্যান্ট। এ ছাড়াও ডানলোপিলোর গদি, মাথার উপর সিলিং ফ্যান, পরিষ্কার ধবধবে বিছানা, কাশ্মিরী কম্বল কিংবা—পাতলা সুতির চাদর মায় এয়ারকুলার মেশিনটি পর্যন্ত। রোগীদের জন্য আড়ম্বরের যাবতীয় আয়োজন এখানে সম্পূর্ণ।

বলা বাহুল্য, রোগীদের শুশ্রূষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিতেও শিল্পের ছোঁয়া। যেমন শরীরে রক্ত ঢোকাবার জন্য সবুজের ওপর চিরচিরে সাদা রেখাযুক্ত টিউব যেন 'বনজ ওষধিলতা'। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ—হোলি খেলার 'পিচকিরি', থার্মোমিটার হ'ল 'সোনার কাঠি রুপোর কাঠি', ভাত খাবার প্লাস্টিকের থালাগুলি দেখলে 'চন্দনকাঠের রেকাবী'র কথা মনে পড়ে। প্রস্রাবের বোতল যেন 'সাদা ধবধবে খরগোশের বাচ্চা', টকটকে জবা রঙের বিশাল বেডপ্যান দেখলে মনে হয় 'চকচকে একটী কাচের ভাণ্ডে এত রক্ত বুঝি টলমল করছে'।

কিন্তু পরিপার্শ্বে রূপকথার পরিমণ্ডল রোগীদের কাছে চরম তামাশা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কারণ হাসপাতালের ভিতর এবং সারা কলকাতা শহরে রক্ত নিঃশেষিত হওয়ার খবর। রক্তহীনতার বিবর্ণ বিষণ্ণতায় যখন রোগীদের ঘরের তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করেছে তখন বাইরের আকাশ ফাল্গুন মাসের ধবধবে জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে। কোকিলের ডাক, গন্ধরাজের গন্ধে মাতোয়ারা রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীর বৈচিত্র্যময়তায় আপ্লুত নীরক্ত মানুষগুলির মনে হয় স্বয়ং ঈশ্বরও তাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন— "চাঁদের আলো ঝরিয়ে কোকিলের ডাকে দশদিক আমোদিত করে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রসিকতা করে।"

রসিক ঈশ্বর, রসিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, রসিক ডাক্তার নার্সদের তাবৎ আমোদপ্রিয়তা তখন তাদের কাছে হয়ে ওঠে একমাত্র 'স্পেসিফিক মেডিসিন'। খরগোশের বাচ্চার মতো সাদা প্রস্রাবের বোতল, লাল টকটকে বেডপ্যান এবং লাবণ্যময়ী সিস্টারদের শ্বেত পায়রার মতো শরীর নির্গত সুগন্ধী নির্যাস নিয়ে পরস্পরের মধ্যে রসিকতাই তখন রুগ্ন জীবনে একমাত্র সাইকোথেরাপির কাজ করে, লেখকের ভাষায় যার আর এক নাম 'সালসা' সংগ্রহ।

ঈশ্বরের কৌতুকপ্রিয়তা এবং দ্বিতীয় বিধাতা অর্থাৎ লেখকের কল্পনাপ্রিয়তা যেন একযোগে দানা বেঁধেছে গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে। রক্তের অভাবে মৃত্যুর অন্ধকারে ঢলে পড়ার অন্তিম মুহূর্তেও রক্তসম্পর্কিত নানা গল্প ফেঁদে রসিকতায় মত্ত থাকে তারা। কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই যেন তাদের বুঝিয়ে ছেড়েছেন—রসেবশে থাকাই বেঁচে থাকা বা সজীব থাকার একমাত্র পথ্য।

কাজেই রাম-রাবণের যুদ্ধ তথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অযথা রক্তপাত— প্রয়োজনে পিপে ভরে রক্ত এনে সমস্যা সমাধানের কথা, গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে হিটলারের মানুষ খুন, এমনকি কলকাতার বাজারে অজস্র পাঁঠা-খাসী-গরু জবাই-এর ফলে রক্তের অপচয়, প্রসঙ্গত— জীবজন্তুর রক্ত থেকে সিন্‌থেটিক ব্লাড তৈরি এবং মেডিক্যাল সায়েন্সের সেই উন্নতি দেখে ওঠার আগেই নিজেদের মৃত্যুর সম্ভাবনা হরিষ-বিষাদে আলোচনা করে দিনযাপনের গ্লানিকে সহনীয় করে তোলে তারা।

কিন্তু 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা' কেবল নীরক্ত মানুষগুলির বেঁচে থাকার তাগিদে তাৎক্ষণিক আমুদে প্রয়াসজনিত গল্প নয়। রক্তশূন্যতাজনিত ভয়াবহ মৃত্যুর প্রতিরোধকল্পে আশা-নিরাশা, আনন্দ-বিষাদ এবং অনিশ্চয়তার নানা আঘাটায় ঠেক খেতে খেতে অবশেষে এক দার্শনিক প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার কাহিনী।

এই দর্শন বা উপলব্ধি গল্পে যেন রূপকের চেহারা নিতে চায়।—যার মর্মার্থ হল

১. এই পৃথিবী এক খেলাঘর।

২. এই খেলাঘরে আমরা অর্থাৎ উমাপদ নন্দী এবং সম্প্রদায় ও আমরা তথা তাবৎ মনুষ্যসমাজ নিছক পুতুলমাত্র।

৩. ধনী দরিদ্র—নির্বিশেষে সকলের আয়ু এখানে পূর্বনির্দিষ্ট।

৪. মৃত্যু অনিবার্য জেনেও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে চিরআনন্দের এক উৎসমুখ খুলে

রাখাই পুতুলরূপী মানুষগুলির একমাত্র ধর্ম।

আবার, যেহেতু এই পৃথিবী এক খেলাঘর, অতএব প্রতিযোগিতা। এবং সেক্ষেত্রে ডুয়েল লড়ার জন্য পুতুলরূপী মানুষের বৈপরীত্যে বিদ্যমান পুতুলরূপী রাক্ষস।

মমতা এবং বিবেকবুদ্ধি শূন্য বিষয়সর্বস্ব মানুষই রাক্ষস—স্বার্থগন্ধজারিত নিঃশ্বাসে ও ক্রিয়াকলাপে দূষিত এই পরিমণ্ডল হল গ্যাসচেম্বার।

গল্পের ভিতরে গল্প বলার প্রবণতার মতো শব্দের নিহিতার্থের গভীরে আরো ভিন্ন এক অর্থ ধরিয়ে দেন সত্যদ্রষ্টা শিল্পী। তা হল—রাক্ষসের রক্ত মানুষের কোনো কাজেই আসে না—"রাক্ষসের রক্ত দিয়ে আমরা করতাম কি। গ্রুপে মিলত না।"

—"মানুষের তাজা রক্ত না হ'লে আমাদের মতন অ্যানিমিক রোগীদের বাঁচানো যায় না।"

—"গ্যাসের বিষে সব রক্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়।"

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ এবং মানুষের ভোগবাসনার বা রসনাতৃপ্তির প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত যে অনর্থক রক্তপাত ঘটে চলেছে, তা যদি না বন্ধ কবা সম্ভব হয়, তা হলে মুমূর্ষু মানুষগুলির মতো একদিন সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি রক্তশূন্যতাজনিত বিবর্ণ ধূসর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কারণ প্রকৃতি ও মানবসভ্যতার ভারসাম্য পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল—এ তো বলাই বাহুল্য। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় "ইকোলজি"।

গল্পের নাম 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা'। এতক্ষণ খেলাঘরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক স্ট্রিটের জুতোর দোকানের মালিক চিনদেশের মানুষ ওয়াং এবং খেলাঘরের পুতুলগুলি অর্থাৎ ভুতু কোবরেজ, কেদার পাণ্ডে, কাশী মিত্তির, পরেশ বাকুলী, বগলা মাস্টার, মহিম হালদার-এর কথাও অল্পবিস্তর জানা প্রয়োজন। কারণ কথক উমাপদ নন্দীর হৃদয়ে যে দর্শন চিন্তার প্রকাশ তা প্রত্যক্ষত এবং পরোক্ষে এদেরই ক্রিয়াকলাপের ফসল।

বলা যেতে পারে—'আমরা' কেবল সমষ্টিগতভাবে গল্পের চরিত্ররা নয়। 'আমরা' অর্থে এ গল্পের পাঠক—প্রতিটি চেতনবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

ওয়াং সেই এসকেপিস্ট কবি-দার্শনিক, যিনি সিনিকের মতোই স্বার্থের ফনা তোলা নীরক্ত পৃথিবীর বর্ণহীনতা অপেক্ষা মৃত্যুর অন্ধকারকে শ্রেয় মনে করেন।

একদিকে কথক উমাপদ নন্দী এবং তার মতো আরো অনেকে নিতান্ত অভাবের কারণে বাইরে থেকে রক্ত আনার কথা কল্পনা করতে পারে না। অন্যদিকে মুড়াগাছার জোতদার অর্থগৃধ্নু মহিম হালদার—আত্মীয়-স্বজন-স্ত্রী-পুত্রের বিকৃত লালসার কারণে বিত্তের বিনিময়ে রক্ত সংগ্রহ করার পথ যার বন্ধ। আবার ওয়াং—যাকে স্যাৎ (চিনা ভাষায়) বা ব্লাড দেওয়ার লোকের অভাব নেই, রক্ত নেবার দিনটিও যার নির্দিষ্ট, বিনা নোটিশে একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যায় তাকে।

এই বৈপরীত্য, রক্তের সম্পর্কের এই ক্ষণভঙ্গুর রূপ (মহিম হালদারের পরিবার পরিজন যার পরিচয়) যেন উমাপদ ও তার সঙ্গীদের মৃত্যুভয়জনিত বিষণ্ণতা কাটিয়ে ঈশ্বর নির্দিষ্ট পরম কৌতুকানুভূতির আস্বাদ এনে দেয়।

—"...রক্তের অভাবে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে পচে গলে মবার চেয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে মরে যাওয়া ঢের বেশী গৌরবের। দুঃখের বিষয়, হেসে কেউ মরে না। পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই।"

কিন্তু চরিত্রগুলির পরিহাসপ্রিয়তা ছাপিয়ে কথকের দুঃখ বিষাদই যেন বড় হয়ে ওঠে। এই বিষণ্ণতা মৃত্যু চিন্তাজনিত নয়, যতটা গভীর উপলব্ধির শূন্যতাবোধজনিত। ওয়াং-এর আকস্মিক মৃত্যুর পর তার আত্মার সঙ্গে উমাপদ নন্দীর কথোপকথনে যেন এই বোধেরই প্রতিধ্বনি—"অল ব্যাড ব্লাড। অল পলিউটেড—পৃথিবীর সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। বুঝেছ বাবু। দিস ইজ এ উইকেড ওয়ার্লড—অল ম্যান করাপটেড হি-হি।"—এ যেন সব থেকেও সর্বস্ব খোয়ানো ভিখিরির মতো মুখ কালো করে 'উইটিবি' সেজে বসে থাকা মহিম হালদারের হেরে যাওয়া মুখ দেখে উমাপদ নন্দীর নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া। রক্ত পাওয়া না পাওয়া জনিত তীব্র দ্বন্দ্বের উত্তর।

এখানে লেখকের দার্শনিক অভিব্যক্তি সিনিসিজম-আক্রান্ত হলেও কোথাও যেন অস্তিবাদের সুব শোনা যায়। বস্তুত পক্ষে আমাদের নিয়ত প্রবহমান জীবনে প্রশ্নোত্তরের ধাঁধা যেহেতু কোনো একরৈখিক গতির অনুগামী নয়, সেইহেতু ওয়াং কথিত সার্বিক দূষণের ঘটনাও একমাত্র সত্য নয়।

এই 'আমরা' যারা তাবৎ মনুষ্যসমাজের অন্তর্গত—একটি দূষণমুক্ত পৃথিবীর সন্ধানের প্রয়াস আমরাই করতে পারি। সেক্ষেত্রে ওয়াং এবং ওয়াং-এর অন্তর্গত চরিত্রই হতে পারে মনুষ্যত্বেব আদর্শ।

জোতদার মহিম হালদারের সমান্তরাল রেখায় এক সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চবিত্র এই ওয়াং। একজন (মহিম) বিত্তবৈভবের গৌরবে মুখর, উদ্ধত, আড়ম্বরপ্রিয়। সহযাত্রীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশায় অনাগ্রহী। অন্যজন (ওয়াং) বিনয়ী-নম্র-নীরব। ঠনঠনের চল্লিশ টাকা মাইনের নিতান্ত দীন কর্মচারীটির সঙ্গেও কথা বলে মনের তৃপ্তি খোঁজেন।

ভিজিটিং আওয়ার্সে জোতদারেব আত্মীয়বর্গের চোখ ধাঁধানো পোশাক, পারফিউম, হাত ভর্তি খাবার—বিত্ত জাহির করার তীব্র নমুনা। অন্যদিকে ওয়াং-এর আত্মীয় বন্ধুর দল নিতান্ত সাদাসিধে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসে, বেরিয়ে যায়।

কাহিনীর শেষে তাই সার্বিক চেতনায় সমৃদ্ধ উমাপদ নন্দীর প্রত্যয়—আমাদের দৈনন্দিন জীবন-আহৃত ভয়-আতঙ্ক-বিষাদ পূর্ণ বিকল চিত্তকেও প্রবলভাবে নাড়া দেয়—"ভিতরে পা দিয়ে আমার মনে হল, একটা খেলার জগৎ, প্রকাণ্ড খেলার আসরে ফিরে এসেছি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে পুতুলগুলি দিব্যি গালগল্প জুড়ে দিয়েছে। বগলা মাস্টার তার লাল টুকটুকে বেডপ্যানের গায়ে হাত রেখে মুখে একটা অবোধ হাসি লুকিয়ে কাশী মিস্তিরকে ডেকে বলছে, আমার জিম্মায় এখন অনেক রক্ত, উকিলবাবু। শিগগির আর মরছি না। হেঁ-হেঁ।"

বস্তুতপক্ষে শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পের পরিণতিতে পাঠককে সেই নাম-না-জানা খেলাঘরে নিয়ে যান, যেখানে শ্রেণী বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। সৃষ্টিকর্তা তাঁর ইচ্ছেমতো সেখানে জাগতিক কিংবা পরমার্থিক—সবকিছুর আয়ু নির্ধারণ করেন। বিত্তের আয়ু, অহং

সর্বস্বতার আয়ু, জীবনের আয়ু।

এবং মুমূর্ষু মানুষগুলি আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান চিত্তের বিশেষ অবস্থাতেও ধনী-নির্ধন, জীবন-মৃত্যুর এই অসারতা সম্যক উপলব্ধি করে নিজেদের মধ্যে রসিকতায় লিপ্ত হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর মতো জীবনের আর এক সত্য খুঁজে পায়। হয়তো সেই সত্যদর্শনের অপর নাম ঈশ্বরদর্শন। যেন ঈশ্বর নির্দেশিত পথে নিজেরাও বেডপ্যানের টকটকে লাল রঙকে রক্তের প্রতিতুলনায় দাঁড় করিয়ে নশ্বর জীবনে ক্ষণিক বেঁচে থাকার আনন্দঘন রেশটুকু ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়। খুঁজে ফেরে তৃপ্তির আস্বাদ। এই অনুসন্ধান, এই সেন্স অফ হিউমার-ই মনুষ্যত্ব—যা রক্তকে শুদ্ধ রাখে।

জ্যোতিরিন্দ্র : উপন্যাস অবিন্যাস

"এই পৃথিবীর এ এক শতচ্ছিদ্র নগরী।
দিন ফুরুলে তারার আলো খানিক নেমে আসে।
গ্যাসের বাতি দাঁড়িয়ে থাকে রাতের বাতাসে।
দ্রুতগতি নরনারীর ক্ষণিক শরীর থেকে
উৎসারিত ছায়ার কালো ভারে
আঁধার আলোয় মনে হতে পারে
এ-সব দেয়াল যে-কোনো নগরীর;
সন্দেহ ভয় অপ্রেম দ্বেষ অবক্ষয়ের ভিড়
সূর্য-তাবার আলোয় অঢেল রক্ত হতে পারে
যে-কোনো দিন; সে কতবার আঁধার বেশি শানিত হয়েছে;
বাহক নেই—দুরন্ত কাল নিজেই বয়েছে
নিজেরই শব নিজে মানুষ,
মানবপ্রাণের রহস্যময় গভীর গুহার থেকে
সিংহ শকুন শেয়াল নেউল সর্পদন্ত ডেকে।
*   *
মানুষ মানী জ্ঞানী প্রধান হয়ে গেছে; তবুও হৃদয়ে
ভালোবাসার যৌনকুয়াশা কেটে
যে-প্রেম আসে সেটা কি তার নিজের ছায়ার প্রতি?
জলের কলরোলের পাশে এই নগরীর অন্ধকারে আজ
আঁধার আরো গভীরতর করে ফেলে সভ্যতার এই অপার আত্মরতি;
চারি দিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হয়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।"

(অনন্দা : শ্রেষ্ঠ কবিতা : জীবনানন্দ দাশ)

তিনি ছোটগল্প রচনা করেন। ছোট্টবেলা থেকেই তার প্রস্তুতি। কিন্তু উপন্যাস লেখেন। আগাগোড়া না ভেবেই। তাই সেখানে বিস্তৃতি আছে। বিন্যাস কম। কিছু কিছু উপন্যাসে বিস্তৃতিও নেই। সেগুলিকে বড় গল্প বা নভেলেট বলা চলে। আদতে জ্যোতিরিন্দ্র উপন্যাস লেখেন সম্পাদকের নির্দেশে। গল্প সৃষ্টি করেন হৃদয়ের আহ্বানে। তবু গুটিকয় উপন্যাস বিস্তৃতি এবং বিন্যাস রক্ষায় অসাধারণ শিল্প-পরিচয় বহন করে। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় একজন হৃদয়-তাড়িত মানুষ কোনো রচনাতেই হৃদয়ের নির্যাস থেকে বঞ্চিত রাখতে পারেন না তাঁর পাঠককে। হয়তো সে কারণেই লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যে উপন্যাস না হলেও তাঁর লেখা পড়তে হয়। কিছু জানার জন্য। কিছু ভুল-ত্রুটি শুধরে নেওয়ার জন্য।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পর্বগত বিন্যাসে তাঁর হৃদয়জ্বালা (১৩৭৯), নীলরাত্রি (১৩৮০), দ্বিতীয় প্রেম (১৩৭৮), লাস্ট চ্যাপ্টার (১৩৭৯), সাঁকোর ওপরে মীরা ও সপ্তরথী (১৩৮৩) ইত্যাদিকে বলা যায় ছোট উপন্যাস।

অন্যদিকে বৃহদাকারে তাঁর সর্বাধিক প্রচলিত উপন্যাস বারো ঘর এক উঠোন (১৩৬২), মীরার দুপুর (১৩৬০), সূর্যমুখী (১৩৫৯) ইত্যাদি। এ ছাড়াও লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল ঝড় (১৩৭৬), রাবণবধ (১৩৭৯), নিশ্চিন্তপুরের মানুষ (১৩৬৭), নীড় (১৩৭৬), সমুদ্র অনেক দূর (১৩৬৯), শেষ বিচার (১৩৮৪), গ্রীষ্মবাসর (১৩৬৭), লড়াই (১৩৭৮), নাগকেশরের দিনগুলি (১৩৭২) এবং এই তার পুরস্কার (১৩৭৯) ও প্রেমের চেয়ে বড় (১৩৭৩)। এ ছাড়া আরো অনেক অপ্রয়োজনীয় অখ্যাত উপন্যাস রচনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য নয় সেগুলি। তবে ভাষাপ্রকরণের বৈশিষ্ট্যে সেগুলি ধরিয়ে দেয় লেখকের অন্তর্নিহিত চরিত্রের স্বরূপটি।

উল্লেখ্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর নায়কেরা প্রায়শই মানসিকভাবে অসুস্থ, বিপত্নীক ও একগুঁয়ে স্বভাবের (রুদ্রনাথ—'হৃদয়জ্বালা', নীরদ—'নীলরাত্রি', অসুস্থ দেহমনের হীরেন—'মীরার দুপুর', 'বসন্তরঙিন' উপন্যাসের নায়ক মুকুন্দ, 'রাবণবধ' উপন্যাসের নীহার চৌধুরী প্রমুখ)।

নারীদের মধ্যে অনেকেই হয় স্বামী-পরিত্যক্তা, নয় বারবিলাসিনী (রেবতী—'বসন্তরঙিন', মালা—'নীলরাত্রি', দীপ্তি—'বারো ঘর এক উঠোন')।

অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত স্বামীর কাছেই ফিরে গিয়েছে। তবে ভুলের অন্তে ভালোবাসার জাগরণে নয়, নিদারুণ অসহায়তায়। আত্মরক্ষা বা অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে। (রেবতী—'বসন্তরঙিন', মালতী—'হৃদয়জ্বালা', মালা—'নীলরাত্রি')।

স্বামী থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষে তীব্র আসক্তি (মালতীর ছুতোর মিস্ত্রী মধুর প্রতি—'হৃদয়জ্বালা', রেবতীর ছেলের বয়সী দোকান কর্মচারী রাখালের প্রতি—'বসন্তরঙিন,' মালার নীরদের প্রতি—'নীলরাত্রি', মীরার অমরের প্রতি আকর্ষণ—'মীরার দুপুর')।

কিন্তু জলের যেমন কোনো চরিত্র হয় না, জ্যোতিরিন্দ্রের রচনাও অনুরূপ। চরিত্রহীন। কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে বিচার্য নয় তাঁর রচনা। অন্তত বাহান্নটির মতো উপন্যাসের নিরিখে ইতিবাচক কাহিনীও রচনা করেছেন তিনি। হয়তো সীমিতসংখ্যক।

কিন্তু গুণগত মানে তুলনাবিহীন। বস্তুত 'এই তার পুরস্কার' এবং 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসে আমরা অন্য জ্যোতিরিন্দ্রকে দেখি, যিনি সমস্তরকম মানসিক দ্বিধা, অসুস্থতা ও অবসাদ কাটিয়ে অনন্ত সৌন্দর্য-সাধনার কথা বলেছেন। এই সাধনার অপর নাম সত্যানুসন্ধান। প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি উপন্যাস আলোচনা করলে বৈশিষ্ট্যগুলি সম্যক উপলব্ধি করা যাবে।

রাবণবধ

উপন্যাসটি পুরাণাশ্রিত নামকরণে, মূলত শয়তান ও ঈশ্বরের দ্বন্দ্বকথা। ঈশ্বর এখানে স্বঘোষিত। শয়তানই নিজেকে ঈশ্বরের শিরোপা দেয়। আবার, নিজের কল্পিত জগতে সহসা পথ হারিয়ে দেবত্ব হারিয়ে ভাগ্যবিড়ম্বিত চরিত্রটি প্রাণ দিতে বাধ্য হয় বাস্তব পৃথিবীরই কোনো ক্ষুধার্ত ধর্ষিত কিশোরী-মানবীর হাতে—যাকে লেখক 'ঈশ্বরী'রূপে চিহ্নিত করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে ছদ্মবেশী রাবণ নীহার চৌধুরী ওরফে এন সি জানেন, তাঁর আপাতমধুর ব্যক্তিত্ব, অমায়িক বাহ্যপ্রকৃতি, সুপুরুষ চেহারা এবং বছরভর পাড়ার পূজা, অনুষ্ঠান, ভোট ও টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠার খাতে মোটা অঙ্কের চাঁদা প্রদান তাঁকে সমাজ সংসারে দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে চলবার পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র দিয়েছে। এই পাসপোর্ট এতটাই সংশয়হীন যে এন সি-র স্ত্রী উৎপলার মৃত্যুতে পাড়া প্রতিবেশীর তরফে দশ-বারোজন শ্মশানযাত্রীও জুটে যায় অক্লেশে।—" ...যদি ধূর্ততা অসাধুতা পুঁজি করে জগতের সুখ-সুবিধাগুলি বেশি ভোগ করা যায় তো তিনি সকলের চেয়ে বেশিই ভোগ করছেন। দু ভাবেই। মাত্রার অতিরিক্ত ভদ্র পালিশ নীরব অমায়িক শান্ত থেকে লোকের সম্মান শ্রদ্ধা ষোল আনা আদায় করছেন এবং চরম স্বার্থপর অভদ্র লম্পট ও খল হয়ে তাঁর যা প্রাপ্য যা কাম্য ভোগ করে নিচ্ছেন।" (পৃ. ১৭)

রাবণের আধুনিকতম সংস্করণ নীহার চৌধুরী বা এন সি কে আদ্যন্ত চিনে ফেলা দুষ্কর। তাঁর চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক কুশল কপটতা। যাবতীয় কুকর্মকে যুক্তির বৈভবে আড়াল করাই তাঁর স্বভাবধর্ম।

এন সি চরিত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল, মূলত তিনি সমকামী। Opposite sex-এর প্রতি কোনো আকর্ষণ তিনি অনুভব করেন না। প্রত্যাশা চরিতার্থ করতে বন্ধুপুত্র কিশোর বাবলুকে চাকর বনাম প্রমোদসঙ্গী হিসেবে ব্যবহার করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে লৌকিক যুক্তি হল বন্ধুর অকালপ্রয়াণে তার কিশোরপুত্র বাবলুকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করা ও বন্ধুর সংসারে সাহায্য করা। সমকামিতার যুক্তি হল, "পুরুষের প্রেম। কিশোরীর কুণ্ঠা জড়তা কি সলজ্জ আত্মসমর্পণ নয়। সেখানে সবটাই কেমন আবেগের কুয়াশায় ঢাকা, সব কিছু ভেজা স্যাঁতসেঁতে। নীহারবাবু এ জিনিস পছন্দ করেন না। চুমু খেয়ে বন্ধুর মতন হেসেছে বাবলু। যেন কাঁসার বাসনের গায়ে টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঠুন্ করে শব্দ হল। শুকনো খটখটে পরিচ্ছন্ন আওয়াজ। একটা হাত মেলানোর ভাব। জলে টোকা দিয়ে জল ছিটানো হাত ভেজান নয়।" (পৃ. ১০)

দ্বিতীয়ত, 'বিবাহ' বা বিয়ে করাকে এন সি 'অ্যাকসিডেন্ট' মনে করেন। দুর্ঘটনা মাত্র। মেয়েরা তাঁর কাছে 'মোজা' বিশেষ। একবারের বেশি দু'বার ব্যবহারযোগ্য নয়। দাম্পত্যপ্রেম তাঁর কাছে লেবুর সঙ্গে তুলনীয়। কাজেই অবাধ ভ্রষ্টাচারের যাবতীয় স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্য বিয়ে তাঁর কাছে নিছক একটা পাসপোর্ট মাত্র। লৌকিক আচারের ছাড়পত্র বিশেষ। সে ক্ষেত্রে মোজা যদি শিকলে পরিণত হয়, তবে তা অবশ্য পরিত্যাজ্য। এবং উপেক্ষা তার পরমধর্ম। এ ব্যাপারে স্ত্রী উৎপলার বিপন্ন ক্ষোভ স্পর্শই করে না তাঁকে। সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য করেন উৎপলাকে। কোনোরকম বাগ্‌বিতণ্ডা নয়। আইনসিদ্ধ স্ত্রীব সংস্পর্শ এড়াতে এন সি জানালা দিয়ে পুকুরের রাজহাঁস দেখতে থাকেন। পুকুরে স্নানরত বউ-মেয়েকে দেখেন। আদতে তিনি রাজহাঁস দেখছেন, না মেয়েদের আদুড় শরীর দেখছেন, স্ত্রীর এহেন সন্দেহ চিৎকার চেঁচামেচির উত্তরেও নির্বাক তিনি। এই নীরবতা ও উদাসীন উপেক্ষা দিয়ে উৎপলার সংশয়কে আরও খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করাই উদ্দেশ্য তাঁর। স্বভাবতই চবম নীরবতার উত্তরে বিক্ষিপ্ত উৎপলার সরব চিৎকার, সংসারযাপনের যাবতীয় আসবাব ভেঙে ছিঁড়ে নষ্ট করে আক্রোশ প্রকাশ, পাড়া প্রতিবেশীব চোখে ছিটেল, মাথা পাগলা মেয়েছেলে বা পাগল প্রতিপন্ন করে তাকে। আর নৈঃশব্দ্য-বিলাসী নিষ্ঠুর এন সি সর্বজনের সবটুকু সহানুভূতি আদায়ে সিদ্ধকাম হন অনায়াসে।

তৃতীয়ত, নিজেকে ছাড়া পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে ছুঁচো, ইঁদুর, বাঁদর, পিগ্‌মি, চোর ও ভিক্ষুকের সমান মনে করেন এন সি। বাড়িতে ভিখিরির উপদ্রব এড়াতে তাঁর সাধের অ্যালসেশিয়ান টমি-কেটিকে বেঁধে রাখেন বারান্দায়। যথারীতি এড়িয়ে চলেন পাড়ার প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের সংস্পর্শ। কারণ তাঁর মতে বৃদ্ধদের সঙ্গে কথা বলা মানে রোগভয় বা মৃত্যুভয় ডেকে আনা। কারণ এদের মুখে সবসময় রাজনীতির কচকচি ও দীর্ঘশ্বাস। আবার এদেরই ছেলেরা ব্যবসার কালো টাকায় ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এসব দেখে এন সি-র মনে হয়, ''কালোটাকায় এক একজনের গাড়ি বাড়ি, পোষাক ফ্যাশান, অথচ মুহুর্মুহু সুনীতির উদ্‌গার। কাজেই এটা চোখ বুজে ধরে নেওয়া যায় অনিয়মটাই এখন নিয়ম অসঙ্গতিটাই সঙ্গতি। যেমন নীহারবাবু নিজে। ... তাঁর ওপরটা পালিশ ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। এটা তাঁর মুখোস। আসলে তিনি ধূর্ত প্রবঞ্চক দুশ্চরিত্র স্বার্থপর।'' (পৃ ১৬)

চতুর্থত, অসম্ভব মাংসপ্রীতি এন সি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাছ-মাংস ছাড়া আর সব খাদ্যই তাঁর কাছে রুগির পথ্য। তাই স্ত্রী উৎপলার মৃত্যুর পরদিনেও ঘরে মাংস আসে। এমনকি গিন্নির অসুখের দিনগুলোতেও বাবলুকে হরেকরকম মাংসের খাবার তৈরির নির্দেশ দেন এন সি। নিজে হাত লাগান। শুধু তা-ই নয়—''আহার মৈথুন—দু কাজেই নীহারবাবুর চেহারা এক রূপ ধারণ করে, সেই চিবুক চোয়ালের সংকোচন প্রসারণ, কণ্ঠমণির ঘন ঘন উত্থান পতন— ...অর্থাৎ এটাও প্রসন্নতারই নামান্তর।'' (পৃ. ৭৭)

খাওয়ার সময় মাংসের হাড় চিবুতে গেলে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ হয় তাঁর। এ ব্যাপারে এন সি-র অভিমত, মেয়েদের নিয়মিত ঋতুস্রাবের মতো পুরুষের ঘামঝরানো স্বাস্থ্যের

লক্ষণ। তাই সহর্ষে খান এন সি।

পঞ্চমত, এবং সর্বোপরি এন সি-র 'অবিকল্প আত্মরতি' কাহিনীর আগাগোড়া, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট এক পরিণতির পথে টেনে নিয়ে চলে তাঁকে। তিনি নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। সেই জগতে তিনি স্বয়ং এবং বাবলু ছাড়া প্রাণের আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে এন সি-র স্বপ্নদৃশ্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—"একেবারে খাঁটি সীসার রঙের আকাশ। ...আর ঐ যে, প্রাণ বলতে শব্দহীন ধূসর অন্ধকার জগতে একমাত্র আমি, শয়তান বলতে ঈশ্বর বলতেও আমি, ...আমার ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ফুটফুটে সুন্দর একটা পাখি সেখানে আমদানী করলাম. .ভেসে ভেসে চলল।" (পৃ. ৪১-৪৩)

আদতে রাবণবধ উপন্যাস বিকারগ্রস্ত মরবিড (morbid) মানুষের উপকথা। কিন্তু বিকারগ্রস্ত মানুষ শাসকের আসনে বসলে কিংবা সচ্ছল সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের হলে পরিণতি কী ভয়ংকর হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় এন সি-র স্বপ্নদৃশ্যে। সীসা রঙের আকাশ ও সীসা রঙের সমুদ্র বানিয়ে গোটা পৃথিবীকেই ধূসর অন্ধকার জগৎ বানাতে চান তিনি। বয়ঃসন্ধির নিষ্পাপ কিশোর বাবলু সেখানে 'শ্বেতপায়রা'। কারণ বাবলু ছেলেও না মেয়েও না। পিউবারটি বা বয়ঃসন্ধির নিষ্পাপ কিশোর সে। কাজেই সে পবিত্র। এরপর পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে গেলে 'শয়তানের চর' হয়ে যেতে পারে বাবলু। তা-ই এন সি-র জগতে কোনো মানুষ থাকবে না। পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ থাকতে পারে। তাই 'শ্বেতপায়রা'-রূপী বাবলু কুমীর-রূপী এন সি-র পিঠে ভেসে বেড়াবে। বাস্তবিক স্ত্রী উৎপলার মৃত্যুর পর ঘরের চার দেওয়াল ও মেঝে তিনি প্রকৃতই সীসা রঙে ভরিয়ে তোলেন।

এন সি-র মাংস খাওয়ার দৃশ্যে বাবলুর অনুভূতিও যেন একই কথা বলে—"বাবলু সবচেয়ে বেশি অভিভূত হয় জেঠুর বুকের লোমের মাথায় বিন্দু বিন্দু মাংসের ঝোল দেখে। তার যেন মনে হয় এগুলি তাজা রক্তের ফোঁটা। যেন জেঠু কাঁচা মাংস খেয়েছে। চিবুক বেয়ে কস বেয়ে টাটকা গরম রক্ত বুকের ওপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন হুট করে বাবলুর চিন্তাটা, জেঠু যেমন বলছিল, তাঁর সেই স্বপ্নের জগতে চলে যায়। প্রকাণ্ড কুমীর হয়ে জেঠু সমুদ্রে ভাসছে। একটা সাদা পায়রা হয়ে বাবলু কুমীরটার পিঠের ওপর চুপ করে বসে আছে। স্বপ্নটা ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়াচ্ছে. নিজের মনগড়া জগতে জেঠু একদিন কুমীরের প্রকৃতি নিয়ে একলা ঘোরাফেরা করবে, আর তখন কাঁচা মাংস, মানুষের মাংসই চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে, তাজা রক্তের ফোঁটা তাঁর বুকের লোমে আটকে থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মতন চিকচিক করবে।" (পৃ. ৭৮)

সাম্রাজ্যবাদী একনায়কতন্ত্রের ধারক কিংবা সামন্ততান্ত্রিক প্রভু—শাসক তথা শোষক শ্রেণীর যে কোনো একটি আসনে বসিয়ে দেওয়া যায় এন সি-কে। মাংসের হাড় চিবিয়ে খাওয়ার সময় তার বুকের লোমে লেগে থাকা ঝোল তাই এখানে রক্তের সঙ্গে তুলনীয়। সেই রক্ত, যা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের শ্রম, ঘাম ও চোখের জল দিয়ে তৈরি। যে রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠে ধনীর স্বপ্নসৌধ।

এন সি-র গিটারের সুর এখানে রোমসম্রাট নীরোর কথা মনে করিয়ে দেয়। রোম পুড়ছে, নীরো পিয়ানো বাজাচ্ছে। এদিকে এন সি-র গিটারের সুরে পুড়তে পুড়তে, রক্তে রিমঝিম বাজনা শুনতে শুনতে ছুটে আসে বস্তিবাসী ভিখিরির কিশোরী মেয়ে বিমলি। শিকারি বাঘের হাতের মুঠোয় চলে আসে এক 'সবুজ ডাঙ্গার পাখি'। সুরের জালে আটকে পড়ে ছোট্ট পাখির মতো নরম শরীরের কিশোরী ঝুপড়ির মেয়ে বিমলি। 'সবুজ ডাঙ্গার উপাসক' বাবলু তাকে নিয়মিত এন সি-র বাড়ির ডিম রুটি মাংস-এর ভাগ দিত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে বিমলি নিজেই খাদ্য হয়ে ধরা দেয় নরখাদকের হাতে। আর বাবলু দেখে একসময় স্ত্রীর উপস্থিতিতে এন সি যেমন ঘরের দরজা বন্ধ করে আদরে-অত্যাচারে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন, বাবলুর উপস্থিতিতে বন্ধ ঘরে বিমলিকে নিয়ে একইরকম রক্তের খেলায় মেতে ওঠেন এন সি। দরজার ফুটোয় কান চেপে বাবলু শুনতে পায়, "...উঁহু, তুমি ভিকিরিও নও রাজকন্যাও নও, তোমার গায়ে অন্য গন্ধ তোমার চোখে অন্য রূপ, তুমি ঈশ্বরের দূত—এই বয়েস, এই সেই আশ্চর্য সময়! ...এটা থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড, ওটা অ্যাড্রিন্যাল, এখানটায় পিটুইটারী, যখন হর্মোনিক সিক্রেশন শুরু হয়, যখন রক্তের মধ্যে জরায়ুর মধ্যে...।" (পৃ. ১১৮) এই ভাবে সুরের জালে শব্দের জাদু-মায়ায় সম্পন্ন হয় একটি ধ্বংসের মহিমা।

আদতে শাসকের নাম বদলায়, রূপ বদলায়, চরিত্র বদলায় না। তারা কখনো সুরের আড়ালে, শব্দের আড়ালে, কখনো পোশাকের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। একটি ধ্বংসের-বীজ বোনা হয় এইভাবে। সাম্রাজ্যের কিংবা মনুষ্যত্বের। রাবণ এবং নীরো—দুই শোষকের চেহারা। হিংস্রতা, পররাজ্যলোলুপতা ও ভোগের চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি। এন সি-ও তাই মানুষের গড়া এই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চায়। বানাতে চায় নিজস্ব জগৎ।

কিন্তু 'ধ্বংস' বা 'পতন' শব্দটি উপন্যাসে ভিন্নমাত্রা পেয়েছে লেখকের কুশলী বিশ্লেষণে। অসুন্দরের প্রবল প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা যে ঢেকে রাখা যায় না, এন সি এবং কিশোর বাবলুর সমান্তরাল চরিত্র চিত্রণে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন লেখক। বাবলু যেন প্রকৃত অর্থেই এন সি-র স্বপ্নে দেখা 'শ্বেতপায়রা'। স্রোতস্বিনী জলের মতো পরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ তার ভালো-মন্দ বোধ। পিতৃবন্ধু এন সি-কে সে দেখে বিরাটত্বের মহিমায়। তাঁর মাংসপ্রীতি তার কাছে 'কুমীরের মানুষ চিবিয়ে খাওয়ার' নামান্তর মনে হলেও সে দুঃখ পায়। এই বাবলু এন সি-র ছাঁচে ঢালা পুতুল মাত্র। আবার যখন উত্তরের জানালা খোলা পায়, তখন গাঢ় নীল আকাশ সবুজ প্রান্তর ও পাখি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তখন জেঠুর সীসা রঙের স্বপ্ন ছেড়ে সবুজ দ্বীপের সন্ধানে বাস্তবিক এক শ্বেত-পায়রা হয়ে যায় বাবলু। এন সি-র দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার অবসরে বাবলুর এই সবুজ দ্বীপের সন্ধানে যাত্রা ও সবুজ ডাঙ্গার পাখি ভিখারিণী বিমলির ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ উপন্যাসে এক রূপকের চেহারা নিয়েছে।

কিন্তু সুন্দরকে আকাঙ্ক্ষা করলেও বাবলু জানে না অসুন্দরের প্রতিরোধ। অসুন্দরের বিনাশের উপায়ই বা কী। 'অন্ধকারের বাজনার টানে' ছুটে আসা ধর্ষিতা বিমলির প্রতিতুলনায় তার মনে পড়ে মায়ের কথা। মনে পড়ে এন সি-র মতোই মায়েরও খাদ্য

লোলুপতার কথা। এন সি-র থালার পাশে পড়ে থাকা ছিবড়ে হাড় এবং মায়ের খাবার থালার পাশে ডাঁটাচিবুনো ছিবড়ের স্তূপ সমার্থক মনে হয় তার কাছে। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের প্রয়োজনে বাবলুকে স্কুল ছাড়িয়ে এন সি-র জিম্মায় ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণেও সে ঘৃণা করত মাকে। অনুরূপভাবে বিমলিকেও এন সি-র ফাঁদে পা রাখতে দেখে সমগ্র মেয়েজাতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে বাবলু। ধর্ষিত হওয়ার পরদিনও বিমলিকে ফিরে আসতে দেখে ঘৃণা বোধ হয় বাবলুর। তার মনে হয়, "অন্ধকারের বাজনার টানে অন্ধকারে ছুটে গেছে। অন্ধকারে তলিয়ে গেল।" (পৃ. ১৩২) তার আরো মনে হয় এ যুগের রাবণদের বধ করা যায় না।

বস্তুতপক্ষে বিহ্বল বিপন্ন কিশোর অসুন্দরের প্রতিরোধ না জানলেও ক্ষতি ছিল না। সারা পৃথিবীকেই যারা অন্ধকার সমুদ্র বানাতে চায়, অন্ধকারের সেই রাজা মারণাস্ত্র নিজেই তৈরি রাখে। প্রয়োজন কেবল সেই অস্ত্র ধারণ করার মতো নিষ্কলুষ পবিত্র একটি হাত। ভিখিরির মেয়ে বিমলি, যে ছেলেও না মেয়েও না, যে কিনা ঈশ্বরের দূত—যেন ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতেই এন সি-রই কেনা মাংস কাটা নতুন 'দা' বা অস্ত্র দিয়ে বিমলির রাবণবধ।

এক অশুভ শক্তি, শয়তান বা সাম্রাজ্যবাদীর পতন অথবা ধ্বংসলীলা এইভাবে সম্পন্ন হয় উপন্যাসে। জয় হয় সুন্দরের। শয়তান ও ঈশ্বরের পার্থক্য জানে না দুই কিশোর-কিশোরী। জানেন তাদের সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয় বিধাতা—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাই কেবল একটি ধর্ষণ আর যাবতীয় ব্যভিচার উপন্যাসের শেষ কথা নয়। শেষ কথা বলেছে ঝুপড়িবাসী বিমলি। শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিনিধি বিমলি ও তার মা-বাবা—"সব ভিকিরি এক না, সব ভিকিরির মেয়ে বেশ্যা না।" (পৃ. ১৩৪)

বলা বাহুল্য, ভিখিরির মেয়ে বা বেশ্যা ধর্ষিত হলে আজো এ দেশের সমাজ বিশেষ আলোড়িত হয় না। কারণ তাদের বাসভূমি রাস্তা। পথের সন্তান তারা। তাই ধর্ষিতারা চরিত্রহীন। সমাজ-সংসারের যাবতীয় শেয়াল, কুকুর ও নরবাক্ষসের ঠোক্কর খেয়ে অবিরত রক্তস্নান এবং রক্তটীকা নিয়ে তাদের বাঁচা-মরা। ধর্ষণের পর বিমলির অচৈতন্য দেহ পেঁপেঝোপ-বাসকঝোপের জঙ্গলে ফেলে আসার নির্দেশ দেন এন সি। অবলীলায় মন্তব্য করেন, "কলকাতার পুলিস জানে রাস্তার ভিখিরি মেয়েদের গায়ে এমন অনেক রক্ত-টক্ত লেগে থাকে, ডাক্তাররা জানে। তুই ওখানে ঘাসের-ওপর শুইয়ে দিয়ে চলে আয়।" (পৃ. ১২১)

সমাজ-সংসার উদাসীন হলেও লেখক অবিচার করেননি তথাকথিত আবেদনহীন নগণ্য চরিত্রগুলির প্রতি। শক্তির হাতে অসুর নিধন করিয়ে 'ধ্বংস'-কে এক ব্যাপকার্থ দান করেছেন—যার অপর নাম বিনাশ।

খলনায়ক হয়েও বিশিষ্টতা অর্জন সম্ভব। মানুষের কাছে না হোক, সাহিত্যের অঙ্গনে। এ কথা প্রমাণ করেছে রামায়ণের রাবণ। বাল্মীকি সৃষ্ট চরিত্রটির একটাই ডায়নামিক দিক যে, সর্বকালে সর্বযুগে এর অবস্থান। অথচ ঠিক টাইপ চরিত্র বলা যায় না। কারণ টাইপ চরিত্র কখনো কেন্দ্রীয় চরিত্রের আসন লাভ করতে পারে না। একজন

মানুষ কতখানি শয়তান হলে যাবতীয় ছল চাতুরি, কপটতা দেবত্বের মোড়কে পরিবেশন করতে পারে—নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবনশক্তির তেমনই এক ভয়ানক কারিগর এই রাবণ। দেশকালভেদে শিল্পী-সাহিত্যিকের দল তাই রাবণকে বিষয় করেছেন সৃষ্টির নবতম তাৎপর্যে—ভীষণ রূপী এক নররাক্ষসের নিরিখে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'রাবণবধ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এন সি বা নীহার চৌধুরী সেই ছদ্মবেশী রাবণ—যাকে দেখে আমরা ভয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে শিহরিত হই। ঘৃণায় চোখ বন্ধ করি। আবার তার বিনাশে কিশোর বাবলুর মতোই হতবাক্ হই। অন্ধকারের রাজার মৃত্যুতেও বিহ্বলতা কাটে না। বাস্তবে শত শত রাবণের বধ কি আদতে সম্ভব? এই প্রশ্ন, এই হতাশা ছোট্ট এক কালির আঁচড়ের মতো লেগে থাকে মনে। কিন্তু লেখক জানিয়েছেন, সম্ভব। এটাই সত্য। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেই তিনি শক্তি জোগান পাঠকমনে।

শেষ বিচার

উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র সমাবেশ নিঃসন্দেহে এক অস্থির সময়ের অসুস্থ মানসিকতার শিকার। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলমন্ত্র কী? একটা মানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার হবে, না নিছক হেসে খেলে ফুল-পাখি দেখে বেড়াবে কিংবা বিপ্লব করবে—এবম্বিধ নানা প্রশ্নের সমাহার 'শেষ বিচার' উপন্যাস। একইসঙ্গে প্রেম ও প্রেমহীনতার প্রশ্ন, যৌনবিকার, বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিষাদ, আত্মহত্যা যুক্ত হয়েছে উপন্যাসের বিষয়ভাবনার সঙ্গে। যুক্ত হয়েছে 'সেক্স' এবং 'সেক্স পার্ভার্সন'-এর দূরত্ব নির্ধারক সীমারেখার প্রশ্নটিও।

উপন্যাসেব নায়ক রঞ্জন দত্ত ওরফে রঞ্জু কিন্তু তার সতেরো বছরের জীবনবোধে উদ্ভূত এতগুলি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করে উঠতে পারেনি। আর, পারেনি বলেই শেষ পর্যন্ত রিভলভাবের গুলিতে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

সতেরো বছরের জীবনেই কিশোরটি জেনেছে প্রেমহীন যৌনবিকার। জেনেছে 'এলিয়েনেশন'। একই পরিবারের মানুষ হয়েও পৃথক ভূখণ্ডে এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বাস করার নিঃসঙ্গ অনুভূতি। দেখেছে একদা বিপ্লবীর বিভ্রান্ত অভাবী নতমুখ। জীবনসমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান সে করতে পারেনি। কিন্তু জীবনের সঙ্গে মরণপণ লড়াইয়ে বিহ্বল পাঠককে জানিয়ে দিয়েছে জীবনের সারসত্য হল মনুষ্যত্ব এবং ভালোবাসা। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতায় লগ্ন হয়ে থাকা ভালোবাসা।

'শেষ বিচার' উপন্যাস তাই একাধারে প্রেম, অপ্রেম, ভালোবাসা ও মনুষ্যত্বের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশক। আবার যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের যুগধর্ম এলিয়েনেশন (alienation) বা বিচ্ছিন্নতাবাদেরও কাহিনী। আর বিচ্ছিন্নতার অনিবার্য ফসল বিষাদময়তা চরিত্রগুলির মতো পাঠককেও আচ্ছন্ন করে কাহিনীর পরিণতিতে।

উপন্যাসে রঞ্জুর অবস্থান এক 'টিকটিকি'র মতো। সরীসৃপ সুলভ নিঃশব্দ,

নৈর্ব্যক্তিক। কিশোর বয়সের চপল উচ্ছলতা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক আশি বছরের বৃদ্ধ ঠাকুর্দা বঙ্কিম দত্তর নিশ্ছিদ্র প্রহরা বেষ্টিত। 'অম্বুজা নিলয়'-এর প্রতিটি সদস্য কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মিশবে, কী প্রসঙ্গে কথা বলবে—সবই বিচারক দাদু বঙ্কিম দত্তর নিয়ন্ত্রণাধীন। রঞ্জুর পিতৃবন্ধু ও একদা স্বদেশি রুদ্রেন্দুর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেও আতঙ্কিত হন বঙ্কিম দত্ত। গৃহবন্দি রাখার নির্দেশ জারি হয় রঞ্জুর উপর। আবার আশ্বস্ত হন তার বন্ধুর বাবা-কাকারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত্রী শুনে। বৃদ্ধের এ হেন শাসনের বিড়ম্বনায় অস্থির রঞ্জু নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ে দিদির ননদ, বয়সে বড় ও বিবাহিত যুঁই-এর সংস্পর্শে।

অম্বুজা নিলয়ের ভারি গুমোট আবহাওয়ায় হঠাৎ হঠাৎ যুঁই-এর উপস্থিতি বসন্ত বাতাসের মতো মনে হয় তার। রঞ্জুর যৌবনসন্ধির প্রথম জাগরণ যুঁই, লোডশেডিং-এর অন্ধকারে কিংবা বাথরুমে নানান ছলে তাকে আদর করলে খারাপ লাগে না তার। বরং চাপা উল্লাসে প্রশ্রয় দেয়। ঠাকুর্দা বঙ্কিম দত্তের মেকি শিক্ষা-সংস্কৃতি-আভিজাত্যের অভিমান ও কঠোর শাসন থেকে মুক্তি পেতে ক্ষোভ-আক্রোশ-উল্লাসে বেপরোয়া হয়ে ওঠে সে—"রঞ্জু মজা পায়। সে দেখছে যুঁইদির চোখে বড় বড় হাঙর কুমীর ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুলটুলের নামগন্ধও নেই। রাজহাঁস নেই। ..প্যাশনের আগ্নেয়গিরি হয়ে যুঁইদি খাবার টেবিলে বসে আছে। ..তাই জেদ করে নিজেকে পুড়তে দিচ্ছে সে। এবং আর একটু পুড়বে বলে যুঁইদির শায়ার সঙ্গে পা-টা েকিয়ে গরম সীসার মতন পায়ের ডিমটা চেপে ধরে রাখল। জেদ করে আজ সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থেকে ভেন্টিলেটারের কাছে চড়ুই দুটোর রতিক্রীড়া দেখছিল। সব মিলিয়ে ভিতরে একটা উল্লাসবোধ করছে সে এখন। মনের ভার কেটে গেছে।" (পৃ. ১২৮-১২৯)—উপন্যাসের এই পর্বে শুরু রঞ্জুর মনোবিকলন।

কারণ সে দেখেছে তাদের বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির মতোই আভিজাত্যের অহঙ্কারে গর্বী রাসভারী বঙ্কিম দত্তও কেমন যুঁই-এর আগমনে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠেন। সমস্ত বিধিনিষেধ ভেঙে সহসা উপস্থিত হন খাবার টেবিলে। কারণে অকারণে আদিরসাত্মক রসিকতা করেন। কৌশলে নাতনির কাঁধ, থুতনি, কণ্ঠা ছুঁয়ে দেন। বয়ঃসন্ধির (adolescence) অনুভূতি দিয়ে এই আদরের নিহিতার্থ তৈরি করে নেয় রঞ্জু—"এবার যুঁইদির চিবুক ছেড়ে দিয়ে তার চকচকে মসৃণ গলার ওপর বুড়ো মরা আমপাতা রঙের শুকনো খসখসে হাতটা রাখল। ...রঞ্জু কি কিছু বোঝে না! সব বোঝে। এই যে যুঁইদিকে নিয়ে কাণ্ডটা করছে বুড়ো এখানে সেকস ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাট্টা-মস্করার আড়ালে একটা অল্প বয়সের মেয়ের নরম শরীর ছানাছানি করার লোভ সামলাতে পারছে না। বুড়োর ঠোঁটের কোণায় লালা জমেছে। কপালের রগটা লাফাচ্ছে। রঞ্জু লক্ষ্য করে।" (পৃ. ১২৭)

কিন্তু রঞ্জুর এই মনোবিকলন চেতনার সার্বিক গ্রাস নয়। তাই একদা স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতৃবন্ধু রুদ্রেন্দুর সংস্পর্শে এসে ও বিপ্লবের ইতিহাস শুনে এক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে সে। আবার 'অবিকল ফুল ফোটার মতন' এক ভালোবাসাও লালন করে নিভৃত হৃদয়ের অন্তরালে। তারই বোন টুটুলের বান্ধবী গোপা ওরফে 'ফ্লেমিঙ্গো' সেই ভালোবাসার আধার

স্বরূপ বাস্তবিক একটি ফুলের মতোই বিকশিত হয়ে ওঠে, সৌরভ দান করে তাকে। শুধু তাই নয়, বাবা অমিয় দত্তর খেয়ালি প্রকৃতি, ছন্নছাড়া রোমান্টিক স্বভাবও আকর্ষণ করে তাকে। (পরিবারের অন্যান্য সদস্য অর্থাৎ সন্দেহপ্রবণ মা ও বোন টুটুন এবং দাদু বঙ্কিম দত্ত অপেক্ষা বাবা অমিয় দত্ত রঞ্জুর কাছে অধিক প্রিয়)। বস্তুত কর্মবিমুখ অসংসারী এই মানুষটির প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং ফুল পাখির নামের সঙ্গে মিলিয়ে বোনের এক-একটি বান্ধবীর স্বভাব অনুযায়ী নামকরণ আপ্লুত করে রঞ্জুকে। অমিয় দত্তর কবিস্বভাব সূক্ষ্ম এক ভালোবাসা সঞ্চারিত করে তার মধ্যে। তার মনে হয়—"বাবার উপমাগুলি মডার্ণ। তন্বিশ্যামা শিখরদশনা কি পক্কবিম্বধরোষ্ঠা ইত্যাদির ধারেকাছেও বাবা ঘেঁষে না। যেমন টুটুনের বন্ধুদের বেলায়। এক-একজনকে এক-একটি পাখির নাম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ব্যস, এদের সম্পর্কে এর বেশি কিছু বলার আর দরকারই পড়ে না। গোল্ডেন ফেঝান্ট বললেই ফার্ণ রোডের টুবলির শরীরটা চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে। যেমন নিজের মেয়ে টুটুনকে বাবা টুনটুনি বলে খালাস। এককথায় ওর বর্ণনা শেষ। কাঁকুলিয়া রোডের গোপা হল ফ্লেমিঙ্গো পাখি, একডালিয়া রোডের গৌরীর নাম পড়েছে সাতসয়ালী, রিজেন্ট পার্কের রুমির নাম ফটিকজল, রিচি রোডের চামেলীর নাম চন্দনা— আর একটা মেয়ে, কি যেন ওর আসল নাম, বাবা ডাকে বসন্তবউরি বলে।" (পৃ. ১৩২)

মনোজগতের তীব্র আলো-আঁধারির টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত এহেন রঞ্জু কিন্তু যুঁই-এর শ্বশুরবাড়ি কৃষ্ণনগরে পৌঁছে গভীর উপলব্ধিতে আত্মস্থ হয়। যুঁই-এর স্বামী গোপেনের স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, রঞ্জুর সঙ্গে সুহৃদসুলভ ব্যবহার, সর্বোপরি রঞ্জুর প্রতি যুঁই-এর দুর্বলতার কথা জেনেও স্ত্রীর অবাধ স্বাধীন বিচরণে হস্তক্ষেপ না করা—এ সব কিছুই তার কাছে গভীর তাৎপর্যে ধরা দেয়। আদতে অঢেল ঐশ্বর্য, উদার অকৃত্রিম স্বামী এমনকি উটকো প্রেমের অবাধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও রাত্রির অন্ধকারে কিংবা দুপুরবেলা স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে স্বল্পবাস পরিহিতা যুঁই-এর রঞ্জুর ঘরে গোপন হানা যেন তার যৌনবিকারকেই প্রকট করে তোলে কিশোর ছেলেটির কাছে। তীব্র অনিচ্ছায় কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে রঞ্জু। মনে মনে বলে— "ভয় না। বিবেক। দুপুর রাতে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল রঞ্জুর। পারেনি। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে শুয়ে থেকেছে। পাশের ঘর থেকে ঘুমন্ত গোপেন রায়ের ভুঁসভুঁস শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছিল। ঘুমের মধ্যে একটা লোকের বুকে ছুরি মারার মতন পাপ কিছু আছে! ভেবে রঞ্জু রীতিমত ঘামছিল।" (পৃ. ২৫৯)—বলা বাহুল্য, যুঁই-এর এই উদ্দাম যৌনবিকার (sex-perversion), সহবাসে অনিচ্ছুক রঞ্জুকে রিভলভার দেখিয়ে আত্মহত্যা করার ভান কিংবা স্বামীকে হত্যার হুমকি, এ সবই খুলে দিয়েছিল কিশোর রঞ্জুর বিবেকের গোপন দরজা।

বয়সে বড় বিবাহিত যুঁই-এর যৌন সান্নিধ্যে প্রাথমিকভাবে উল্লসিত হলেও সে ফিরতে চেয়েছিল ভালোবাসা ও বিপ্লবের কাছে। ফ্লেমিঙ্গো বনাম গোপা বনাম ভালোবাসা সম্পর্কে তার অনুভূতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—"অবিকল ফুল ফোটার মতন এই জিনিস। যেন রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি পাপড়ি মেলে দেওয়া। রঞ্জু তাই মনে করে। গায়ে গায়ে

লেগে আছে গাছের পাতারাও টের পাবে না একটা বোজা কলি কখন ফুটে উঠল, কখন আর একটি ফুলের কাছে বুকের সবটা খুলেমেলে ধরল। কথা নেই শব্দ নেই। তারা দু জনও কি একজন আর একজনকে মুখ ফুটে বলেছে যে, তোমাকে আমি ভালোবাসি। নিঃশব্দে সব হচ্ছে। এ জিনিস মুখে বলার দরকারই পড়ে না।" (পৃ. ১৭৩)

ভালোবাসার কাছে নতজানু রঞ্জু, প্রেমিক রঞ্জু মনের মধ্যে লালন করেছিল আরো এক ভালোবাসা তথা বিপ্লবের স্বপ্ন। পিতৃবন্ধু রুদ্রেন্দুর কাছে সে শুনেছিল শহীদ ক্ষুদিরাম, যতীন দাসের বিপ্লবকথা। শুনেছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার-এর আত্মত্যাগের কথা। বিনয়-বাদল-দীনেশের দুঃসাহসী রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের কথা। আরো শুনেছিল স্বাধীনোত্তর ভারতে অগুনতি ভিক্ষুক, বেকার আর দারিদ্রের জন্মকথা। জেনেছিল বিপ্লব শেষ হয়নি। ক্ষুধার্ত বেকাব মানুষ আজো বিপ্লব করে। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। সেই বিপ্লবের নাম নক্‌শাল আন্দোলন। তাই যুঁই-এর স্বামী গোপেনের রিভলভার চুরি করে একদা বিপ্লবী রুদ্রেন্দুর হাতে তুলে দিতে যায় রঞ্জু। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেন রুদ্রেন্দু। 'ঝাঁপি খোলা সাপ' দেখার মতো আঁতকে ওঠেন। কারণ তাঁর চোখে তখন কোনো বিপ্লবের আগুন নয়, স্বপ্ন নয়, চাপ চাপ দারিদ্রের অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে কিশোর রঞ্জুর ভুঁইফোড় স্বপ্ন।

অতঃপর চুরি করা বিভলভার জমা রাখতে যায় ফ্লেমিঙ্গোর কাছে। নানান ঘাত-প্রতিঘাতে বিহ্বল রঞ্জুর জীবনে শেষ আঘাত আসে মৃত্যুদুত রূপে। বাবা অমিয় দত্তকে আবিষ্কার করে ভালোবাসার মানুষটির ঘরে। আবিষ্কার করে অন্য গোপাকে—"রঞ্জু দেখছিল কালো কুচকুচে সাপের মতন বেণীটা কাঁধ বেয়ে ওর বুকের মাঝখানে এসে লুটোচ্ছে। মিনি পোশাক পরা। এত ছোট পোশাকে রঞ্জু আগে ওকে কোনদিন দেখেনি। ওর দুধসাদা উরু দুটো কত মোটা বিশাল দেখাচ্ছিল—ফ্রকপরা থাকলে যা মোটেই মনে হয় না। বাবার পিঠের ওপর চেপে বসেছিল ও। যেন চার পা হয়ে বাবা মিসেস গাঙ্গুলীর মোজায়েক করা তকতকে মেঝের ওপর ঘোড়া সেজেছিল। জানালার দিকে চোখ পড়তে ঝপ করে বাবা সোজা হয়ে দাঁড়াল। গোপা একপাশে সরে দাঁড়াল।" (পৃ. ২৯৭)

৩০৮ পৃষ্ঠার উপন্যাসে তেত্রিশ পর্বে এসে রঞ্জুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠক অর্থাৎ আমরাও যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। মনে হয় লেখক যেন সাজিয়ে গুছিয়ে একে একে নেগেটিভ পোর্ট্রেচার এঁকে চলেছেন। বস্তুত এমন একটি চরিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায় না, যে আশার কথা শোনায়। কাহিনীসূত্রে যুঁই-এর উদারহৃদয় স্বামী গোপেন, রঞ্জুর বন্ধু পার্থ, শোভেন, অমিত, টুবলি এমন অনেক চরিত্রের আনাগোনা উপন্যাসে। কিন্তু কোনোটাই বলিষ্ঠ নয়।

রঞ্জুর প্রকৃতি-প্রেমিক বাবা অমিয় দত্ত, যিনি দেশিবিদেশি বিভিন্ন পাখির নামকরণে মেয়ের বান্ধবীদের সুমিষ্ট সম্ভাষণ জানান, কবিতা লেখেন। ব্যারিস্টারি পাশ করেও ওকালতিতে না গিয়ে কলেজে চাকরি নেন। পরে ফ্রিলান্স সাংবাদিকতা, মাছ ধরা, পাখি পোষা ইত্যাদি—একটার পর একটা পেশা পরিবর্তন করে বাঁধা চাকরি ছেড়ে ভবঘুরে জীবনযাপন করেন, সংসারে সাশ্রয়ের কথা চিন্তাও করেন না। পরিবারে ব্রাত্য হলেও

যিনি রঞ্জুর চোখে পাঠকের চোখে ছিলেন আর্টিস্ট, শিল্পী—প্রত্যয়ের সেই ঘরটুকুও তাসের ঘরের মতো চুরচুর ভেঙে পড়তে দেখলে আমরা বিপন্ন হই, ক্লান্ত হই। মৃত্যু সে ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান কি না সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কেননা মাথার উপর বিশ্বাসের ছাদ ভেঙে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য। মহাপ্রলয়ের দিনে ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়েও বেঁচে থাকার জন্য যে যোগাভ্যাস প্রয়োজন, ভালোবাসার সেই প্রাণায়াম রপ্ত ছিল না সতেরো বছরের রঞ্জুর।

কিশোর রঞ্জু বয়সসুলভ চাপা কৌতূহল ও টিকটিকির মতো বিধিবদ্ধ সতর্কতায় দেখে ফেলেছিল সংসার গুহায় ক্রীড়ারত আদিম মানব-মানবীর কিছু নিষিদ্ধ দৃশ্য। সেই দৃশ্যপটে তারই প্রকৃতিপ্রেমিক বাউণ্ডুলে স্বভাবের বাবা, সন্দেহপ্রবণ মা, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ ঠাকুর্দা ও ভালোবাসার জন ফ্লেমিঙ্গো ওরফে গোপার আনাগোনা। সে-ই কেবল নিঃশব্দ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। দুঃখ সেজন্য নয়, মুখোশের আড়ালে এই খেলাটাকেই সে সহ্য করতে পারছিল না। কাজেই দুঃখ-বিষাদ-আচ্ছন্ন আশাভঙ্গের বেদনায় জর্জরিত রঞ্জু রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। প্রেমহীন বিশ্বাসহীন জগৎ থেকে একটি সরীসৃপের মতোই খসে পড়ে মৃত্যুর পাতাল গহ্বরে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জানিয়ে যায় বিচারের বাণী চিরকাল নীরবে নিভৃতেই কাঁদে। সব পাপ সব অন্যায়ের বিচাব পৃথিবীতে হয় না। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসার সার্বিক অভাব এবং অনাচারের 'শেষ বিচার' তাই মৃত্যু।

মৃত্যু প্রতিষেধক টীকা কপালে বহন করে না জ্যোতিরিন্দ্রের চরিত্ররা। তবে অনুতাপ জানে। জ্যোতিরিন্দ্র জানেন, একমাত্র হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা অনুতাপের আগুনেই ঘটতে পারে আত্মিক মুক্তি। জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার আবেদন তাই হৃদয়ের কাছে। বুদ্ধির আড়ম্বরপ্রিয়তায় নয়। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি ছেলের মৃত্যুতে অনুতাপ-জর্জরিত অশ্রুভারাক্রান্ত পিতা অমিয়কে। দেখি বারান্দার রেলিঙে ঝুলে পড়ে অমিয়র আত্মহত্যার চেষ্টা। আবার, ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বৃদ্ধ বিচারক বঙ্কিম দত্তর আস্ফালন—
"আমি বিচারক। কে কতটা দোষ করল অপরাধ করল তা আমি বুঝব...।" (পৃ. ৩০৮)
বুদ্ধির এই আস্ফালন বা 'বুদ্ধির বিকার'—জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার এ-ও এক চরিত্রধর্ম।

প্রসঙ্গত 'শেষ বিচার' উপন্যাসে আদ্যন্ত রঞ্জুর মনোবিকলন, বিষাদময়তা ও ভালোবাসার নিরিখে সেক্স (sex)-এর ভূমিকা অবশ্য বিচার্য। ১২৩ পৃষ্ঠায় লেখক জানিয়েছেন, "Sex is not the best thing in the world, or the worst thing in the world, but there is nothing else quite like it."

অর্থাৎ নর-নারীর সম্পর্কে যৌনতা অনিবার্য কিন্তু একমাত্র নয়। এই একটিমাত্র উক্তিই লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির মূলসূত্র ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বন্ধুদের সঙ্গে হিন্দি-ইংরেজি সিনেমা দেখে ইংরেজি বই পড়ে সেক্স-এর একটা পিঠ দেখেছিল রঞ্জু। কিন্তু জানা ছিল না তার অন্ধকার দিকটির ছবি। তাই অবরুদ্ধ যৌনবাসনার বিকৃত রূপ তাকে বেদনাহত করে। অনুভূতিহীন, প্রেমহীন বদ্ধ জলাশয়ে ক্রমাগত মাছিদের আনাগোনা তাকে ক্লান্ত ধ্বস্ত করে। রঞ্জু হারিয়ে ফেলে জীবনের 'কোড অব কনডাক্ট'। বস্তুত পারস্পরিক

বোঝাপড়ায় যথার্থ পরিভাষার অভাব যে সংযোগহীন বিচ্ছিন্নতার (communication gap and alienation) সৃষ্টি করে—তারই নির্মম বলি 'শেষ বিচার' উপন্যাসের কিশোর নায়ক রঞ্জু ও তাবৎ চরিত্ররা।

হৃদয়জ্বালা

উপন্যাসের বিষয় সমাজজীবনের গভীরতম কোনো সমস্যা নয়। ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বনির্ভর মানব-মানবীর জটিল গতিপ্রকৃতি নির্দেশক জ্যোতিরিন্দ্রের একাধিক রচনার অন্যতম উপন্যাস 'হৃদয়জ্বালা'।

কেন্দ্রীয় চরিত্র রুদ্রনাথ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরির দায়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। টাকা গচ্ছিত রাখে আশৈশব বন্ধু ডাক্তার নীলুর কাছে। প্রয়োজনমতো অতি সামান্য কিছু চেয়ে নেয় সংসার খরচের জন্য। কেমন মানুষ এই রুদ্রনাথ? কাহিনীর শুরুতেই লেখক জানিয়েছেন, "এক একটা মানুষকে দেখলে তাই মনে হয়। যেন কোনদিনই এই মানুষ কোনো যুদ্ধে হেরে যাবে না। তার জয় অবধারিত।...

বলা হচ্ছিল অন্য যুদ্ধ, জীবন সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কত রথী-মহারথী তলিয়ে গেল। বলে কি না বুদ্ধির প্যাঁচ। কেবল বাহুবল না। যুদ্ধের কলাকৌশল রপ্ত করা চাই। কিন্তু তাহলে কি হবে। অনেক কুশলী যোদ্ধা সংসার সমরাঙ্গনে হেরে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে, রোজই হচ্ছে, চারদিকে একবার চোখ বুলোলে যে কেউ এটা পরিষ্কার দেখতে পাবে। কাজেই যারা এসব দেখেছে, তারা রুদ্রনাথকে দেখে রীতিমত ঘাবড়ে যায়।" বস্তুত ব্যাঙ্ক তছরুপের দায়ে যার চাকরি যায় এবং হাতিবাগানের বাইশ টাকা ভাড়ার বাসা ছেড়ে নারকেলডাঙ্গার বস্তিতে উঠে যেতে হয়, যে রুদ্রনাথের কৃতকর্মের জন্য স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে, ছেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে গিয়ে রাস্তায় বোমার আঘাতে মারা যায় এবং যুবতী মেয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় ড্রাইভারের সঙ্গে—সেই রুদ্রনাথ বছরের বারোটি মাস যখন গলায় হলদে মাফলার জড়িয়ে বিডন স্ট্রিটের রাস্তা ধরে ঘাড় সোজা রেখে নির্বিকার দৃষ্টিতে হেঁটে যায়—জগৎ সংসারের যাবতীয় শোকতাপ অভাব অনটন অগ্রাহ্য করার জন্য সেই অকুতোভয় শক্তিধর মানুষটিকে দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

কাহিনীর বিস্তারে আরো জানা যায়, সকালে এককাপ মাত্র চা, দ্বিপ্রাহরিক আহারে পুঁইশাক, মুলোশাক, ডাল খেয়ে সংসারের ঝড়ঝাপটা গায়ে লাগিয়েও তার স্বাস্থ্য অটুট। রুদ্রনাথের পারিপার্শ্বিকের ধারণা এক গ্লাস জল কিংবা ছাইমাটি নিদেনপক্ষে হাওয়া খেয়েও সে দিব্যি বাঁচতে পারে। সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না সে। মাথার গোলমাল দেখা যায় নি, এমনকি মেজাজে রুক্ষতাও চোখে পড়েনি কোনোদিন। বরং প্রথমপক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার দু'মাসের মধ্যেই ষাটের কাছাকাছি রুদ্রনাথ নিতান্ত মেয়ের বয়সী সতেরো বছরের পরমাসুন্দরী মালতীকে বিয়ে করে ঘরে আনে।

এ হেন রুদ্রনাথ কৃতকর্মের কোনো কৈফিয়ত পারতপক্ষে দেয় না। ব্যবহারিক জীবনে যথাসম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন করেন নববিবাহিত দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীকে উপহার দেয় ছেঁড়া ব্লাউজ,

চটের বিছানা ও রোমান্সহীন একঘেয়ে জীবনযাপনের গ্লানি। এ সবই সে করে ব্যাঙ্কডাকাতির অপরাধ আড়াল করতে। লোকচক্ষে সন্দেহের বাতিটাকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য। বাস্তবিক প্রমাণের অভাবে সব রকম সন্দেহ সত্ত্বেও পুলিশ রুদ্রনাথকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কারাবাসের নিশ্চিত দণ্ড ছুঁতেও পারে না তাকে।

কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে আরো একাধিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রুদ্রনাথের বিধবা পিসি হরিমতী। বেলগাছিয়া হাসপাতালের দাই। ন'বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসে সতেরো বছরেই অকাল বিধবা হরিমতী বৃদ্ধবয়সে দাইবৃত্তির গ্লানি থেকে মুক্তি ও কাশীবাসের কল্পনায় অর্থের আশায় ভাইপো রুদ্রনাথকেই অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয়। বৃদ্ধ বিপত্নীক ভাইপোর সঙ্গে দীনহীন ভাশুরের মেয়ে সুন্দরী তরুণী মালতীকে জুড়ে দিয়ে প্রশস্ত করে প্রত্যাশা পুরণের পথ। কিন্তু স্বভাবধর্মে সর্পিণী হরিমতীও কূল পায় না রুদ্রনাথের চরিত্রের। উপকারের বিনিময়ে হরিমতীকে অপমান ছুঁড়ে দেয় রুদ্র।

বাস্তবিক স্বভাবধর্মে আদ্যন্ত খল, জটিল এবং সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রুদ্রনাথের চরিত্র। দুর্ভেদ্য এই মানুষটির বৈপরীত্য তার দ্বিতীয় সত্তা নয়। লোকসমক্ষে এক দ্বিতীয় রুদ্রনাথকে 'অ্যালিবাই' হিসেবে খাড়া কবার তীক্ষ্ণ সচেতন প্রয়াস মাত্র। বাহ্যত সন্ন্যাসীর ভূমিকা। অন্তঃপুরে তীব্র আসক্তি, কামনা-বাসনা পূর্ণ এক লোভী ধূর্ত মানুয রুদ্রনাথ। চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের পর মানিকতলার শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে সামান্য বেতনে খাতা লেখার কাজ নেয় সে তার অভাব-দৈন্যকে প্রকট করার জন্যই। আবার দোকানের মালিক স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন শুনে তার মন্তব্য—"যাদের খাওয়া পরার ভাবনা নেই তাদের হিসেব করে ছেলেপুলের জন্ম দিতে হয় না। সুখী মানুয। আমাদের গরীবের সবদিকে মরণ। কি বলিস।" (পৃ. ২৬)।

বাস্তবে রুদ্রনাথ যে আদৌ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সরায়নি, প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে তার দিন কাটছে, এবং সে জন্য ঘরে কচি বউ থাকা সত্ত্বেও সন্তানের আকাঙ্ক্ষা তাকে দমন করতে হচ্ছে—ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া এমন এক দ্বিতীয় রুদ্রনাথকে জনমানসে বাঁচিয়ে রাখাই তার উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গত রুদ্রনাথ সম্পর্কে হরিমতীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"কত টাকা সে সরিয়েছিল, কোথায় বা সেই টাকা রেখেছে জানতে হলে তাব পেটের মধ্যে ঢুকতে হবে যে—কিন্তু রুদ্রর পেটের ভেতর ঢুকবে, আমি তো নয়ই—এমন কেউ পৃথিবীতে জন্মেছে কিনা আমি জানি না। সাংঘাতিক মানুষ সে।" (পৃ. ৮৬)

ভয়ংকর মানুষটি কিন্তু মুখোশের আড়াল ছিঁড়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় তরুণী বউ-এর সান্নিধ্য সংস্পর্শে। বাড়ির কলে জল থাকতেও রোজ গঙ্গাস্নানের প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুললে মালতীর সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলে—"শরীর ভাল থাকে, মন ভাল থাকে।" কিন্তু ওই পর্যন্ত। 'স্বরূপে রুদ্রনাথ' সহসা আবরণ উন্মোচন করে না। পোশাকি মানুষটির অন্তর্গত চরিত্র, যাবতীয় অপরাধ ও অপবাধ ঢেকে রাখার যান্ত্রিক কুশলতা বা দুর্বৃত্তায়ন দুর্বোধ্য মালতীর কাছেও। তাই পরপুরুষ ছুতোর মিস্ত্রি মধুকে আশ্রয়

করে মালতী। তার কপট কলায় শেষ পর্যন্ত ভাঙতে থাকে কামউদ্বেল পুরুষ রুদ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাহিনীতে প্রায়শ দুই পুরুষ এক নারী কিংবা এক পুরুষ দুই নারীর সম্পর্কজাত টানাপোড়েন ও জটিলতা লক্ষণীয়। 'হৃদয়জ্বালা' উপন্যাসে দ্বিতীয় পুরুষ মধুর অনুপ্রবেশ চতুর্থ পরিচ্ছেদে। মালতীর জীবনে সে দেখা দেয় দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে। মালতীর কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠেছিল তার দাম্পত্য জীবন। রান্না করা, বাটনা বাটা, জল তোলা, বাসন ধোওয়া এবং বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষায় সারাদিন ঘর আগলে বসে থাকা, পরিশেষে স্বামী ফিরলে বাজারের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত একঘেয়ে কথার জাবর কাটা ও সাত তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাট মিটিয়ে বিছানায় রাত্রিযাপনের রোজনামচা হাঁপিয়ে তুলেছিল তাকে।

বরফে শোয়ানো মাছের মতো নির্বিকার উদাসীন দিনগুলি যখন কেটে যাচ্ছিল, তখন নারকেলডাঙ্গার বস্তিঘরের একটিমাত্র খোলা জানালা দিয়ে ফাল্গুনের বাতাসের মতো মালতীর মনের ঘরে ঢুকে পড়ল ছুতোর মিস্ত্রি মধু। যুবক মধু। মালতীর বয়সের উপযুক্ত সঙ্গী।—"...মাথা ভর্তি কালো কোঁকড়া চুল। হলুদ ঘেঁষা গায়ের রং, টনকো চামড়া। লম্বা গড়নের হাত পা। নীল লুঙ্গিটা হাঁটুর ওপর তুলে মালকোঁচা এঁটে কোমর বেঁকিয়ে উবু হয়ে শরীরটা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে রেঁদা চালায় করাত চালায় ভ্রমর ঘোরায়, বাটালির মাথায় ঠুকঠুক ঘা বসিয়ে কাঠ কাটে।"

মালতীকে দামি শাড়ি উপহার দেয় মধু। বায়োস্কোপ অর্থাৎ ছবি দেখাতে চায়। আনন্দ-উদ্বেল মালতী নির্দ্বিধায় সাড়া দিতে পারে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে তার অতৃপ্ত বাসনা। সর্বোপরি মধুর কাছে সে যখন জানতে পারে রুদ্রনাথের ব্যাঙ্ক তছরুপের কথা, জানতে পারে দারিদ্র নয়, রুদ্রনাথের শঠতা কৃপণতা সংসার জীবনের সব সুখ আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করেছে তাকে, সর্পিণীর মতো প্রতিশোধস্পৃহায় জেগে ওঠে মালতী—"হিসহিস করে বলল আমি কি ঘেন্না করছি না ওকে, তোমার মুখে সব শোনার পর থেকে আমার কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছি, আমাকেও সারাজীবন ভোম্বলের মা-র মতন কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারবে।" (পৃ. ৮১)

উল্লেখ্য, জ্যোতিরিন্দ্রের অধিকাংশ নারীচরিত্র অন্তর্চেতনায় স্বৈরিণী। কোনো এক অনিবার্য কারণে কতকটা বাধ্য হয়ে একটা দাম্পত্যজীবন যাপন করে তারা। অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করে বাইরের কোনো পুরুষ সান্নিধ্যে। কিন্তু এই দ্বিচারিতা এক ভয় অর্থাৎ অজানা আশঙ্কার সূক্ষ্ম সুতোয় তৈরি।—"হুঁ তাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে, রেস্টুরেন্টে খেতে, গঙ্গার ধারে বেড়াতে, চিড়িয়াখানা দেখতে খুব সাধাসাধি করছে মধু। কিন্তু মালতী সাহস পায় না। মনে মনে সে যদিও পা বাড়িয়ে আছে।" (পৃ. ৩৪) আবার মধুর সান্নিধ্যে ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করে মালতী।

পঞ্চাশ ষাট বছরের বৃদ্ধ, মিষ্টির দোকানের মুহুরি রুদ্রনাথ কোনোদিনই স্ত্রীকে দামি কাপড়, গন্ধ তেল, সাবান দিতে পারবে না। শরীরী সুখও নয়। এ তথ্য জন্ম দেয় অন্য এক মালতীর। রাতের অন্ধকারে পায়খানা যাবার নাম করে স্বামীর সঙ্গে সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করে মালতী। এমনকি ছাগল ও কাঠ ঘুঁটে রাখার ঘরে খড়ের গাদায় শরীরী

সংসর্গে লিপ্ত হয় মধুর সঙ্গে। আবার, স্ত্রীর মন পাবার ব্যাকুলতায় মরীয়া রুদ্রনাথ যখন বন্ধু নীলুকে খুন করে ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা পয়সা সহ বন্ধুর মৃত স্ত্রীর গয়না, সোনার ঘড়ি ইত্যাদি ঐশ্বর্য এনে হাজির করে—নির্দ্বিধায় তখন স্বামীর গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ে মালতী। উপেক্ষা করে প্রেমিক মধুর কাতর আহ্বান—"রুদ্র আর কিছু বলল না, এক মিনিট পর ভুসভুস করে নাক ডাকতে লাগল। ...আর ঠিক তখন মালতী শুনল বাইরে পিছনের জানালাটার কাছে কে যেন খুটখাট শব্দ করছে, মাটিতে গোড়ালি ঠুকে নানারকম ইশারা করছে, শিস দিচ্ছে। মালতী উঠল না, বুড়োর গায়ে গা ঠেকিয়ে কুঁকড়ে পড়ে থাকল।" (পৃ. ১২৯)

মালতীর কোনো বিবেকদংশন নেই। না স্বামীর কৃতকর্মের জন্য, না নিজের মিথ্যাচরণের জন্য। বরং স্বামীর যাবতীয় পাপকাজ সমর্থন করে সে। জীবনের যাবতীয় ঐহিক সুখ অর্থ এবং অলঙ্কারে, এমনই কথা বলে মালতীর জীবনদর্শন।

বিবেকদংশন নেই রুদ্রনাথেরও। উপন্যাসের আগাগোড়া শয়তান রূপে চিহ্নিত সে। তার যাবতীয় উদাসীনতা, কাঠিন্য ও নিরাবেগ নির্বিকল্প দ্বিধাহীন পদক্ষেপ ধাক্কা খায় একটি জায়গায়। সে জায়গাব নাম হল তার নবপরিণীতা রূপসী বধূ মালতী। প্রথমপক্ষের স্ত্রী কমলার মৃত্যু, ছেলে ভোম্বলের মৃত্যু কিংবা মেয়ে বকুলের গৃহত্যাগ কিছুই ছাপ ফেলতে পারেনি তার মনে। এমনকি বকুলের খোঁজও করেনি কোনোদিন। কিন্তু মালতীর উপেক্ষা বিপন্ন করে তাকে। ধাক্কা খায় পুরুষটির আদিম প্রবৃত্তি। একদিকে মালতীর প্রত্যাখ্যান, অন্যদিকে পিসি হরিমতীর প্রতিশোধস্পৃহা, মেয়ে-জামাই বকুল ও রতনের সম্পত্তি লোলুপতা, সর্বোপরি বন্ধু নীলুব বিশ্বাসঘাতকতা—এ সবেরই মোকাবিলা সে করে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় বিড়াল পদক্ষেপে। একটি মাত্র হত্যা বা খুনের মাধ্যমে। একটি নিষ্ঠুর অভিঘাতে রুদ্রনাথেব 'হৃদয়জ্বালা'-র উপশম হয়।

বন্ধু নীলমণি তার চুরি করা গচ্ছিত টাকা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে যেভাবে রুদ্রনাথ দ্বিধাহীন সতর্কতায় একটি কেড্স জুতো, লোহাব ডাণ্ডা সংগ্রহ করে (দোকানে না গিয়েই), নিঃশব্দে একটি খুন ও খুনের প্রমাণ বিলোপ সম্পন্ন করে, এক ভয়ংকর বিকটাকার যোদ্ধার রূপই (যদিও কোনো গৌরব বহন করে না এই রূপ) পরিস্ফুট হয় তাতে। কোনোবকম গৌরবহীন এই যুদ্ধ নিরতিশয় ঘৃণ্য হলেও এই রুদ্রনাথ আমাদের পরিচিত। কিন্তু উপন্যাসের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে মালতীর অন্তিম পরিণতি যেন সৌষ্ঠবহীন। ছুতোব মিস্ত্রি মধুর সঙ্গে অবাধ ভ্রষ্টাচারের পব শেষ পর্যন্ত স্বামীকেই অবলম্বন এখানে কোনো সততার পরিচয় বহন করে না। বরং একটা অসহায়তা কিংবা অসংলগ্নতা প্রকাশ করে চরিত্রটির আচরণ। মেনে নিতে কষ্ট হয়।

তবু জীবন কোনো সুদক্ষ দর্জির ফিতেয় মাপা কাটছাঁট করা পোশাক নয়। অন্তহীন সেই বিস্তৃত পরিধির সঠিক পরিমাপ কোনো কারিগরের হাতে সম্ভবও নয়। দারিদ্রের গ্লানির মতোই প্রতিটি জীবনযাপনে প্রতিটি সম্পর্কেই আছে দৈন্য ও মৃত্যু। কোনো সম্পর্ক ই অচ্ছেদ্য নয়। আবার যে কোন সম্পর্কেই লগ্ন থাকে না শর্তহীন ভালোবাসা। ঘৃণা এবং আপোস বেঁচে থাকার আরো এক ধর্ম। সেই 'লগ্নভ্রষ্ট' জীবনকেই কেটে টুকরো

টুকরো করে দেখান শল্যবিদ জ্যোতিরিন্দ্র। তাই তাঁর কাহিনীর চরিত্ররা কিছুটা অসংলগ্ন, কিছুটা বৈভবহীন। বিকৃত, অসহায়, মরবিড। পাঠকের সমবেদনা থেকে বঞ্চিত তারা। জীবনসত্যের বিচিত্র ভূমিকা প্রকাশে তথ্যনিষ্ঠ।

কলকাতার নট

উপন্যাসে আমাদের পরিচয় রাজনীতি সচেতন জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে। আদতে রাজনীতিমনস্ক তিনি নন। সরাসরি রাজনীতির অন্দরমহলে ঢুকে পড়েন না মানুষটি। বলেন না কোনো গুরুগম্ভীর সমাজতত্ত্বের কথা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত সমস্যা সমাধানের আলোচনায় যোগ দেওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর। আঁকেন না সমগ্র মিছিলের চরিত্র। বিশাল জনারণ্য থেকে বেছে নেন কেবল একজনকে। ক্রমে সেই চরিত্র-চিত্রণের প্রাসঙ্গিক টানাপোড়েনে লেখকের বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার ছাঁকনিজালে উঠে আসে একাধিক চরিত্র, ঘটনা ও বিষয়বস্তু।

আমরা ধরে নিতে পারি, আলোচ্য উপন্যাসে 'কলকাতার নট' সাগর দত্ত লেনের অবিনাশ চৌধুরীর জন্ম ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যবর্তী অথবা পরবর্তী কোনো এক সময়ে। তার জন্মদাতা নিঃসন্দেহে যুদ্ধ, দেশভাগ ও মন্বন্তর।

বস্তুতপক্ষে, চারের এবং পাঁচের দশকে কিংবা তারও পরবর্তী কিছুকাল নগর কলকাতায় রাজত্ব করেছিল যে ভুখা মানুষ, সেই ভুখা মানুষেরই মিছিলের একটি মুখ 'কলকাতার নট' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবিনাশ চৌধুরী। তাই কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন বাঁকে ভিন্ন ভিন্ন তার নাম। অবিনাশ চৌধুরীর জীবনবেদ জানতে জানতে একইসঙ্গে জানা হয়ে যায় খিদিরপুরের কালিকান্ত চক্কোত্তি, দমদমের অমূল্য বাগচী, উলুবেড়িয়ার ফণী পাল ও শেওড়াফুলির হরিহর চাটুজ্যের রোজনামচা। নাম, পদবি ও ঠিকানা পৃথক হলেও জন্মকুণ্ডলী এবং গোত্রবিচারে এরা সকলেই এক। উপন্যাসের নামকরণ সে অর্থে প্রতীকী।

কবি বলেছিলেন, 'মন্বন্তরে মরি নি আমরা। মারী নিয়ে ঘর করি'। এই 'মারী' গুটিপোকার মতো আচ্ছন্ন করেছে কাহিনীর পটভূমি ও চরিত্রকে। অভাবী, প্রবল দারিদ্র-লাঞ্ছিত অবিনাশ চৌধুরীরা তাই সহজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে না। ভিক্ষাপাত্র হাতে রাস্তায় দাঁড়ায় না। কারণ মধ্যবিত্তের অভিমান, মধ্যবিত্তের সংকট। পরনের জামা জুতো বাধা দেয় তাদের। কাজেই নিরন্তর ছল-চাতুরীর আশ্রয়, প্রবঞ্চনা এবং করুণরসের গল্প ফেঁদে, স্বজন বন্ধু, নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে ঠকিয়ে এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ। অতএব অবিনাশ চৌধুরীদের মৃত্যু যতটা আত্মিক, ততটা শারীরিক নয়।

উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক জানিয়েছেন, "...দশ বছর আগেও শহরের জনসমুদ্রের এমন কিম্ভূতকিমাকার রহস্যময় চেহারা ছিল না। বাপ্‌স! কোথা থেকে এত মানুষ আসে! কেবল মাথা আর মাথা, মুখ আর মুখ—এত মুখের খাদ্য যোগাচ্ছে কে—রাত্রে তারা শোয়ই বা কোথায়? ...এখন সাতদিনের মধ্যেও একটা খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েছে সে মনে করতে পারে না।" (পৃ. ২)

পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, শহরের হালচাল নিয়ে আর মাথা

ঘামাচ্ছে না অবিনাশ চৌধুরী। তার মাথায় আরশোলার মতো পিলপিল করে কেবল অন্নচিন্তা। "অন্নচিন্তা চমৎকারা"। উপন্যাসের আদি-মধ্য-অন্ত—আগাগোড়াই আলোড়িত হয়েছে এই অন্নচিন্তা ও অন্নসংস্থানের উপায়স্বরূপ যাবতীয় ছল চাতুরী ও কপটতার আশ্রয়ে নিতান্ত জৈবিক এক মনুষ্যেতর প্রাণীর দিনযাপনের ইতিকথায়।

এই ইতিকথাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে লেখকের চাপা দর্শনবোধ। অর্থাৎ—"কেড়ে না খেলে কেউ আপনার মুখে খাবার তুলে দেবে না। সারাদিন চেঁচালেও কেউ শুনবে না। বিপ্লব চাই। কেবল মিছিল করে ময়দানে সভা ডেকে ...ইত্যাদি।"

'কলকাতার নট' উপন্যাসের সার্বিক বিশ্লেষণে আমরা দেখি যুদ্ধ বিত্তবান মানুষকে করেছিল আরো বেশি বিত্তবান। নিঃস্বকে নিঃস্বতর। নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটেছিল দু'পক্ষেই। একদিকে দুর্ভিক্ষ এবং তাকে পুঁজি করে দুর্নীতি, অন্যদিকে 'আছে' এবং 'নেই' (Have and have nots)-এর হাহাকার।—"কলেজ ষ্ট্রীটের কোনো রুটির দোকানে কাল মাথা-ফাটাফাটি। বাজারে রুটি নেই। জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে বেবীফুডের জন্য দু মাইল লম্বা লাইন পড়েছে। মাছের বাজারে খুনোখুনি। বাজারে বেবীফুড নেই, গুঁড়ো দুধ নেই, দোকানে নলেন গুড়ের সন্দেশের ছড়াছড়ি। আহ্, একখানা শহর বটে! কিছুই নেই আবার সব কিছু আছে।" (পৃ. ৬৫) এমনই এক জটিল অঙ্কের ধাঁধায় ঘুরপাক খায় শহর কলকাতা, শহরের ক্ষুধার্ত মানুষ, কলকাতার নট অবিনাশ চৌধুরী ওরফে ফণী পাল, ওরফে অমূল্য বাগচী ওরফে হরিহর চাটুজ্যেরা।

ঘুরপাক খায়, মুখ থুবড়ে পড়ে কঠিন বাস্তবের অভিঘাতে, অথচ প্রতিবাদে রুখে ওঠে না। মুখে বিপ্লবের কথা বললেও প্রত্যক্ষ বিপ্লবে জড়িয়ে পড়তে সাহস পায় না। কারণ মধ্যবিত্তের অভিমান। ভেতরের জ্বালাটাকে তারা কেবলই লুকোতে চায়। 'ছেঁড়া ন্যাকড়ার তলায় লুকিয়ে রাখা ঘা'-এর মতো। এই অসহায়তা কৃত্রিমতা ও ভীরুতাই জ্যোতিরিন্দ্র সৃষ্ট অধিকাংশ চরিত্রের মূল ধর্ম। তাই পাঠকের সহানুভূতিলাভে ব্যর্থ হয় তারা। আদতে কাহিনীর শেষ অধ্যায়ে স্ত্রী-পুত্রের অনাহারে মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে অবিনাশ চৌধুরী, পাঠকের হৃদয়ে সাময়িক করুণার উদ্রেক হয় মাত্র।

'কলকাতার নট' অন্ধকারের কথা বলে, অভাবের কথা বলে। দার্শনিক জ্যোতিরিন্দ্রের লেখনীতে সেই অভাব দ্ব্যর্থবোধক। বিগত দশকের দু'দুটি যুদ্ধ দেশের অভ্যন্তরীণ পটভূমিতে প্রস্তুত করেছিল আরো এক যুদ্ধক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত করার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে মাথা চাড়া দিয়েছিল আরো এক সাম্রাজ্যবাদ।—যার নায়ক পুঁজিবাদী মানুষ। ক্রমাগত সঞ্চয়, কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি, অসম জোগান এবংবিধ কারণে মূল্যবৃদ্ধি, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস উৎপাদন করেছিল এক সার্বিক অভাব। এই অভাব তাই কিছুটা যুদ্ধজনিত হলেও কিছুটা ছিল মানুষের হাতে তৈরি কৃত্রিম অভাব। অভাব তাই মূল্যবোধেরও।

এই তার পুরস্কার

মূলত রামানন্দ সেনের ব-কলমে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রের আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষণ

তথা আত্মসমালোচনা-মূলক সত্যানুসন্ধানের নির্বেদ দলিল।

মননশীল কবি-সাহিত্যিক পঞ্চাশোর্ধ্ব রামানন্দ সেনের সাহিত্যজগতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থতা, কিংবা প্রতিষ্ঠানবিরোধী জীবনবেদ, তজ্জনিত অসহায়তা, অস্থিরতা, পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধ, মৃত্যুচিন্তা এবং সত্য ও সুন্দরের বিচিত্র নিষ্ঠুর অভিঘাতে নবতর জীবনোপলব্ধি উপন্যাসের মূল বিষয়। সর্বোপরি সাহিত্যের সত্য ও বাস্তব সত্য, সত্যের আপেক্ষিকতা, শিল্পের স্বরূপ, শিল্পের নামে ভণ্ডামি, শিল্পের চাতুর্য এবং শিল্পী ও শিল্পের সংকট—ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে বিতর্কিত আলোকপাত 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাস পাঠকের কাছে এক মূল্যবান প্রাপ্তিযোগ।

কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায় অস্থিরচিত্ত রামানন্দকে। পেশায় স্কুলশিক্ষক রামানন্দর সাহিত্যজগৎ এবং কর্মজগৎ কোথাও কোনো গৌরব বা কৃতিত্বের স্বাক্ষর নেই। নিরন্তর কাব্যচর্চায় কোনো বড় রকমের পুরস্কারও পাননি তিনি। অথচ তাঁরই সমকালীন কেউ কেউ নিছক গদ্যরচনা করার সুবাদেই গাড়ি, বাড়ি, প্রভাব, প্রতিপত্তি—সবই অর্জন করেছেন। এহেন কবির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর ঘর করার পর তীব্র বিবমিষায় স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে স্ত্রী পূরবী। সার্বিক বিষাদময়তায় আচ্ছন্ন রামানন্দ তাই ত্রিশ বছরের আড্ডার আসর 'মোহন রেস্টুরেন্ট' ছেড়ে, 'পদাবলী' পত্রিকা গোষ্ঠীর কবিসঙ্গ ছেড়ে যাত্রা করেন মৃত্যুর দিকে। আত্মহত্যার জন্য রেললাইনের ধারে দাঁড়ান। কিন্তু মৃত্যুও প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে। সময়মতো গাড়ি আসে না। তাঁর জীবনের পটভূমিতে নেমে আসা ঘন অন্ধকারের মতোই রেললাইনের ধারে প্রাক্‌সন্ধ্যার কুয়াশাবেলায় পরিচয় হয় চিত্রশিল্পী জগৎ মণ্ডলের সঙ্গে।

মৃত্যুদ্বার থেকে ফিরলেও জীবনের কাছে ফেরা হয় না কবির। কবিতা এবং কাব্যজীবনের সঙ্গে যাবতীয় সংসর্গ ত্যাগ করে, স্কুলের চাকরি ছেড়ে ঠিকানাহীন, উদ্দেশ্যহীন মদ্যপ রামানন্দ আশ্রয় নেন সল্টলেকে একদা ভেড়ী মালিক অধুনা পোলট্রি ব্যবসায়ী অক্ষয়ের বাড়িতে। অক্ষয় ও অক্ষয়-পত্নী মাধুরীর সহজ দাম্পত্যপ্রেম, লবণ-হ্রদের নির্জনতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সর্বোপরি শিল্পরমণী মাধুরীর সৌন্দর্য সাময়িকভাবে আত্মিক সংকট মুক্ত করে রামানন্দকে। কিন্তু অব্যাহত থাকে মদ্যপান। মাধুরীর কাছে টাকা ধার করা, মাতাল বন্ধুদের সংসর্গ, মারামারি ও গভীর রাতে বাড়ি ফেরা।

অবশেষে মাধুরীর জীবনে কিশোর শফীউল্লার অনুপ্রবেশ। রামানন্দর সৌন্দর্যসাধনায় বিরতি, রহস্যময়ী মাধুরীর মোহিনী মডেল রূপদর্শন, হাসপাতালে বন্ধু অক্ষয়ের নিঃসঙ্গ মৃত্যু, শিল্পী জগৎ মণ্ডলের আত্মহত্যা, স্ত্রী পূরবীকে বেশ্যারূপে দর্শন, মোহনবাবুর রূঢ় প্রত্যাখ্যান কবি ও ব্যক্তি রামানন্দর যাবতীয় মোহমুক্তি ঘটিয়ে পৌঁছে দেয় চেতনার অন্তিম স্তরে।

সমস্তরকম নেতিবাচক পথ পরিক্রমা শেষে ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষায় ঘুরে দাঁড়ান তিমিরবিলাসী রামানন্দ। পৌঁছে যান তন্নিষ্ঠ শিল্পীর আদর্শলোকে। পাঠকহৃদয়েও ঘটে যায় একটি বিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন। সে বিশ্বাস হল ভালোবাসা। জীবনের প্রতি প্রেম। মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

বস্তুতপক্ষে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা বা জীবনদর্শন কবি রামানন্দ সেনের সামগ্রিক জীবনকাহিনী এবং পরিণতির প্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষত না হলেও পরোক্ষ ছায়াপাত করেছে উপন্যাসে।

রচয়িতা কেবল এক আপোসহীন তন্নিষ্ঠ শিল্পীর সমাজ-সংসার ও মানুষের কাছে পুরস্কার স্বরূপ উপেক্ষা, বিদ্রূপ এবং লাঞ্ছনার কথাই বলেননি, সমান্তরাল বিচারে, চুলচেরা বিশ্লেষণে বলেছেন সেইসব আপাতনিষ্ঠ শিল্পভাবুকের কথা—যাঁরা শিল্পসৃষ্টির নামে কিছু পার্থিব বা ঐহিক সুখসাধনের অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন।

উপন্যাসে আকাদেমি জয়ী হেম মজুমদারকে রামানন্দ সেনের অনুগামী কবিগোষ্ঠী অর্থাৎ শুভেন্দু বিকাশ উৎপলেন্দু অরুণাভ নবকিশোর প্রমুখ বাংলার 'টলস্টয়', 'ডস্টয়েভস্কি' নামকরণে বিদ্রূপ করেন। বিদ্রূপের কারণ ইমেজ সচেতন হেম মজুমদারের বিষয়-সর্বস্ব লেখার রীতি। বলা হয়েছে—"সস্তা জিনিস হালকা বিষয়, শুধুই প্রেম রোমান্স ইত্যাদি নিয়ে হেম মজুমদার গল্প উপন্যাস লেখে না। মানুষের ক্ষুধা বঞ্চনা নিপীড়ন অশিক্ষা বেকারত্ব অর্থাৎ যেসব সমস্যা নিয়ে দেশ জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে কেবল সেসব নিয়ে হেম মজুমদারের শিল্পকর্ম। সমস্যা যত গুরুতর হয় তত তাঁর কলম খোলে।" (পৃ. ৩৭)

বলা বাহুল্য সেই নিপীড়িত মানুষের 'অভাব'-এর বিনিময়ে অর্থাৎ রয়্যালটির টাকায় হেম মজুমদার গাড়ি বাড়ি করেছেন। এমনকি ভিয়েনাফেরত ডাক্তারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত সম্পন্ন করেছেন।

এ হেন হেম মজুমদারকে 'বাংলার টলস্টয়' বিশেষণ প্রদানের কারণ নামকরণের মধ্যেই নিহিত। অর্থাৎ সমাজ জীবনের গভীর ক্ষতসমূহকে ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করে শিল্পের উপকরণ হিসেবে কেবল ব্যবহার (exploitation) মাত্র নয়, ক্ষত শুশ্রূষাকারী নিরাময় সাধনের দৃষ্টান্তই ছিল টলস্টয়ের জীবনবেদ। মনীষী টলস্টয় রচনার রয়্যালটি দান করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির হোতা সেইসব বঞ্চিত ক্ষুধার্ত নিঃসম্বল নিরাশ্রয়দের উদ্দেশে আর হেম মজুমদার নিছক আত্মতৃপ্তির উদ্দেশে। আবার প্রেম, প্রেমহীনতা এবং রোমান্সধর্মী বিষয় অবলম্বন করেও সার্থক সৃষ্টি সম্ভব। টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসও মূলত প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণেরই ইতিকথা।

উপন্যাসে ননীমাধব দত্ত নামে তৃতীয়শ্রেণীর এক ঔপন্যাসিককে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কুচকুচে কালো মেদসর্বস্ব বিশাল বপু ননীমাধবের বৈঠকখানা বাজারে একটি আলুর আড়ত আছে। ইন্দুমতী নামে রক্ষিতা আছে। তিনি মাতাল অবস্থায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছিল লিভারে পচন ধরে এবং কাকার সিফিলিস-এর বিষে। ননীমাধব দিনে ব্যবসা দেখেন এবং রাতে উপন্যাস লেখেন। বাজারে তাঁর আটখানা উপন্যাস ছাড়া হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর বই প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট প্রকাশকের অভাব হয় না।

কিন্তু ননীমাধব সম্পর্কিত মূল তথ্য হল তিনি নিজের তুচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন।

নান্দনিক বিচারে উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির কদর তিনি জানেন। নিয়মিত 'পদাবলী' পড়েন। বৈঠকখানা বাজারে শুঁড়িখানায় আধুনিক শিল্পসৃষ্টিতে দিক্‌পাল কবি রামানন্দ সেন, চিত্রকর জগত মণ্ডল, গল্পলেখক নন্দদুলাল ভট্টাচার্যকে পেয়ে আপ্লুতচিত্তে চপ কাটলেট সহযোগে মদ্যপানে আপ্যায়িত করেন। শুধু তা-ই নয়, ফিলটার টিপড্‌ সিগারেটের তিনটে প্যাকেটও ধরিয়ে দেন তিনজনের হাতে। পাইকপাড়ার 'সোনালী বাসর'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে মার খাওয়া বিতাড়িত রামানন্দকে ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি ফেরানোর বন্দোবস্ত করেন। রামানন্দ সেনের 'পদাবলী' পত্রিকার কবিগোষ্ঠীর কাছে নিজের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"উহুঁ, আমার নাম আপনারা শুনবেন না, আমার বই যে আপনারা পড়েন নি, আমি খুব ভাল করে জানি—আমি তো নিজেই বুঝি, সেকেলে ধাঁচের লেখা আমার, আপনাদের মতন এত আধুনিক লেখকমহলে এই লেখা এসে পৌঁছোবার কথাই না। এই জন্যই বলছিলাম আমার মতন একজন প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকের কাছে যখন ওরা ওদের ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাল, তখনই বুঝে গেলাম শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওদের ধারণাটা আজো কোন্ খাতে বইছে, হা হা।" (পৃ. ২৩৮)

তুলনামূলক বিচারে 'পদাবলী' গোষ্ঠীর কবিকুলের গোত্রনির্ণয়ে দেখা যায় কবি রামানন্দ সেন ছাড়া তারা অচল। রামানন্দ সেনের আকস্মিক অন্তর্ধান এবং তাঁর কবিতা প্রকাশিত না হওয়ার কারণে 'পদাবলী'র বিক্রি কমে যায়। 'পদাবলী' পত্রিকার কবিবৃন্দ অর্থাৎ শুভেন্দু বিকাশ উৎপলেন্দু নবকিশোর অরুণাভ পলাশ—যারা হেম মজুমদারকে 'টলস্টয়' অভিধায় বিদ্রুপ করে, ননীমাধব দত্তকে চিহ্নিত করে 'আনকুথ মহারাজ' সম্বোধনে, এমনকি রামানন্দ সেনকে যারা পাগল গাড়ল নামে ভূষিত করে, একার শক্তিতে পদাবলী চালিয়ে যাওয়ার আস্ফালন দেখায়—তারা কিন্তু নিজের মধ্যেই ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, পত্রিকা প্রকাশের আরো যাবতীয় আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করত যে বিকাশ, হঠাৎই সে চাকরি নিয়ে বন্ধুদের কাউকে না জানিয়ে বাইরে চলে যায়। শুভেন্দুর মূলধন ছিল পৈতৃক ব্যবসা। কাঠগোলার অর্থ। কিন্তু কেবল অর্থ বিনিয়োগ পত্রিকা বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যান্যরা তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। কাজেই নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং তথাকথিত কবিকুল সম্পর্কে রেস্টুরেন্টের মালিক অশিক্ষিত মোহনবাবুর যথার্থ মূল্যায়ন—"ওদের হল শখের কাব্যচর্চা বা কবিতা লেখা যাই বলুন, ফ্যাশন করে কবিতাপত্র বের করা; রক্তের মধ্যে এ জিনিস নেই, আত্মার মধ্যে সে সাধনা নেই, টাকাপয়সার চিন্তা ওদের কাছে এক সময় বড় হয়ে ওঠে, উঠবেই। আজ একটা ভাল চাকরির সন্ধান পেয়ে বিকাশবাবু আসামের জঙ্গলে ছুটছেন, কাল শুভেন্দুবাবু কাব্যের পাট চুকিয়ে দিয়ে নিজেদের কাঠের কারবার দেখতে-শুনতে লেগে যাবেন। হুঁ, যাবেনই, এ আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছিলাম, এক এক সময় কথাটা চিন্তাও করি। বুকের পাঁজরা ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে, টসটস করে হৃৎপিণ্ডের রক্ত ঝরছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, আত্মীয় বন্ধু প্রিয়জন সবাই আমাকে ত্যাগ করল, কিন্তু হুঁশ নেই, আমি আমার চিন্তা আমার ধ্যান নিয়ে মত্ত, কাব্যের

জগতে বুঁদ হয়ে আছি, এ একমাত্র একজনকে দিয়েই সম্ভব, একটি মানুষই তা পারে, সে রামানন্দ সেন।" (পৃ. ২৬৩)

'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসের আর এক পার্শ্বচরিত্র জগত মণ্ডলও একজন শিল্পী। আর্ট গ্যালারি ভাড়া করার মতো সঙ্গতি তাঁর নেই। অর্থাভাবে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয় গাছতলায়। তাঁর বিমূর্ত অঙ্কনরীতি রামানন্দ সেন-এর মতো বিদগ্ধ কবির চোখে অসাধারণ কম্পোজিশন, ভবিষ্যতের সম্পদ বলে মনে হলেও সাধারণের কাছে নিতান্তই অর্থহীন। দুর্বোধ্য।

জগত মণ্ডলের নির্দিষ্ট আয়ের কোনো উৎস নেই। চাকরি করেন না। ছবির বিক্রি নেই। বহির্জীবনের অপ্রাপ্তিজনিত বঞ্চনা তাঁর সংসারজীবনেও। জগত মণ্ডলের স্ত্রীও স্বামীর অপদার্থতা বুঝে একটি কাবখানায় কাজে ঢুকে পড়েন। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তাঁর ছবি যত্ন করে গুছিয়ে রাখার পরিবর্তে উনুনের জ্বালানিকার্যে ব্যবহার শ্রেয় মনে করে। অতএব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা রেললাইনের চালচিত্রে নেমে আসা অন্ধকারই বেশি সত্য মনে হয় জগত মণ্ডলের কাছে।—'আর আগামীকাল! জগত মণ্ডল কি হতাশায় থইথই করছে, গলার সুর শুনে রামানন্দের তাই সন্দেহ হল।' এ কালে কিছু হল না তো আগামীকাল দিয়ে করব কি। কথা শেষ করে মণ্ডল অন্ধকার রেললাইনটার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল।" (পৃ. ১৫)

রামানন্দ সেনের মতো বিষণ্নতা জগত মণ্ডলেরও জীবনবেদ। যদিও দৈনন্দিন জীবনযাপনে ক্রমিক বঞ্চনা বা বিষাদ শিল্পীকে ক্লিষ্ট করে না। বরং নির্বিকার ঔদাসীন্য তার চরম রূপ। স্ত্রী ছেলেমেয়ের যাবতীয় গঞ্জনা ও ক্ষোভ উপেক্ষা করে স্ত্রীর উপার্জনের টাকা মানিব্যাগ থেকে চুরি করে চলে যায় শুঁড়িখানায় কিংবা বেশ্যালয়ে। এইভাবে কখনো মদ কখনো সোনাগাছির সরযূর সঙ্গলাভে আত্মাকে তৃপ্ত করে। যদি কখনো কোনো ছবি বিক্রিও হয়, সে অর্থ সংসার খরচে লাগায় না জগত মণ্ডল। কারণ তার কাছে ছবি বিক্রির একশো টাকা নিয়ত দারিদ্রক্লিষ্ট সংসার নামক মরুভূমিতে মরীচিকার সমান। কাজেই মদ, বেশ্যা এবং ফুর্তি।

এ হেন জীবনাচরণের পিছনে জগত মণ্ডলের আরো অভিনব যুক্তি হল---অবস্থাটা 'বেড়ালের অসুখ' করার মতন। আসলে সেটা অসুখ না। বেড়াল যেমন অসুখ করলে বেশি করে ঘাস খায় তারপর ভকভক বমি করে সব উগরে ফেলে সেইরকম ছবি আঁকা ভালো না লাগলে, নিজেকে ভুলে থাকার জন্য পিসির বাড়ি গিয়ে হাঁস মুরগি ছাগলের পিছনে ছোটাছুটি করা মাছ ধরার মতোই তার বেশ্যাবাড়ি যাওয়া—"—কিচ্ছু মনে থাকবে না আমাদের। আমরা তখন এই জগত থেকে অনেক দূরে। আমাদের হুঁশ থাকবে না। ঘাস খেয়ে অসুখ হওয়া দুটো বেড়াল হয়ে সারা রাত দু'জনে বেশ্যাবাড়ি পড়ে আছি, হি-হি।" (পৃ. ৮০)

অকৃত্রিম ভদ্রতা এবং সততা জগত মণ্ডলের আরো এক চরিত্রধর্ম। রামানন্দ সেনের সঙ্গে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে তাকে গুণ্ডা মনে করে জগত মণ্ডলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া রামানন্দ, বৈঠকখানাবাজারে ননীমাধবের সঙ্গে মারামারিতে উদ্যত রামানন্দ কিংবা

নাওভাঙার মেলায় নন্দদুলালের হাতে মার খাওয়া রামানন্দ—সর্বার্থে রগচটা স্বভাবের রামানন্দকে তিনি বন্ধুসুলভ নির্ভেজাল প্রশ্রয়ের সঙ্গে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। বন্ধুকে আনন্দদানের জন্য সোনাগাছির সরযূর কাছে নিয়ে যান, আবার কপালফাটা রক্তাক্ত রামানন্দকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে ক্ষত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে বাড়ি পৌঁছে দেন। বলা বাহুল্য, গল্পলেখক নন্দদুলাল ননীমাধবের পয়সায় মদ খেয়ে আবার তারই ঘড়ি চুরি করলে সদাহাস্যময় জগত মণ্ডল তাকে তিরস্কার করতেও কুণ্ঠিত হন না।

প্রথম পরিচয়ের সূত্রে জগত মণ্ডল সম্পর্কে রামানন্দ সেনের মনে হয়েছিল—"...এই ব্যক্তি কোনোদিন লাইনের ধারে ছুটে যাবে না, ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ রেখে কোনোদিনই মাছ ধরতে আসবে না, বরং যেন এক সঙ্গে তিনটে ঘুড়ি ওড়াবার ক্ষমতা রাখে সে। সেই মেজাজ সেই প্রফুল্লতা নিয়ে, সেই বিক্রম ও হিংস্রতা নিয়ে বড় বড় পা ফেলে জগত মণ্ডল হাঁটছিল, রোগা টিনটিনে শালিক না, রামানন্দর মনে হল বাঘের সঙ্গে চলেছে সে, এক খাঁটি শিল্পীর দেখা পেল। মণ্ডল গলা খুলে গান গাইছিল।" (পৃ. ১৭)

কিন্তু খাঁটি শিল্পীকেও একসময় ব্যর্থতা গ্রাস করে। তখন প্রাত্যহিক জীবনের সংকট ভুলে থাকার জন্য মদ, বেশ্যা কিংবা সৃষ্টির আনন্দ—কোনোটাই যেন আর অপরিহার্য নয়। শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার একটি সংস্থায় চাকরির চেষ্টা এবং ব্যর্থ মনোরথ চিত্রকরের সর্বগ্রাসী বিষাদের গহ্বরে আত্মসমর্পণ ও উদ্বন্ধনে মৃত্যু।

কাহিনীর সামগ্রিক আলোচনায় সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্য আমরা জানতে পারি, সেগুলি হল—ক. সাহিত্যের পথ দুর্গম, পাঠক-আনুকূল্য, যশ এবং অর্থের জন্য গদ্যচর্চা ভিন্ন জীবনে উন্নতি নেই। সাহিত্যের বাজারে পদ্য অপেক্ষা গদ্যের কদর বেশি। কাজেই জীবনভর কাব্যচর্চা ভয়ংকর খাদের প্রান্তে টেনে নিয়ে যেতে পারে। গ্রাস করতে পারে স্রষ্টার সার্বিক চেতনা।—..."পৃথিবীর বুদ্ধিমান কবিরা কবিতা লেখা ছেড়ে দিচ্ছে এবং 'বিনা নোটিশে' কবিগোষ্ঠী থেকে খসে পড়ছে, নিতান্তই সাহিত্যের নেশা ছাড়তে না পারলে কেউ কেউ গদ্য লিখছে। তা-ও সেই সব গদ্যকর্ম যা সুখ দেয়, শান্তি দেয়, পয়সা দেয়, পত্নীপ্রেম অটুট থাকে, সন্তানের ভক্তি-ভালবাসা নষ্ট হয় না।" (পৃ. ৪)

খ. অর্থ এবং যশোভারে বিড়ম্বিত সেইসব তথাকথিত সাহিত্যসেবীরাই মেলা সেমিনার সার্কাস এবং সাধারণতন্ত্র দিবসে সম্মানিত অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে থাকেন। অর্থাৎ স্রোতের বিপরীতে যার বা যাদের অবস্থান তারা কেবল স্ত্রী-পুত্র-সংসারের থেকেই নয়, সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন অচ্ছুত। নিছক বিদ্রূপ এবং উপেক্ষার পাত্র। উদাহরণস্বরূপ—"তারা যে 'নিশ্চেতনা'র কবি, 'অবচেতনা'র অন্ধকারে হামাগুড়ি দিচ্ছে। এই বালখিল্য কবিদের, যদিও বয়সে অনেকে বুড়িয়ে গেছে, আজও 'পরীক্ষা-নিরীক্ষার' পর্ব শেষ হল না, এখনও 'আত্ম-অনুসন্ধান' নিয়ে মেতে আছে। তার মানে শিল্পসৃষ্টি করতে নেমে তারা নিজেদেরই আজ পর্যন্ত চিনে উঠতে পারল না—তারা কী তারা কে! যে কারণে তাদের কাব্য কবিতাও দুর্বোধ অস্পষ্ট থেকে গেল, নেবুলাস অবস্থা কাটিয়ে উঠে একটা নির্দিষ্ট আকার পেল না, অবয়ব পেল না। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে এই নীহারিকা পুঞ্জের জায়গা কোথায়!" (পৃ. ৪)

গ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সারা বিশ্বেই কবিতার পাঠকসংখ্যা কমে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও যাঁরা লিখছেন তাঁদের অবস্থা হল কবির ভাষায়—'অন্ধকে ছুঁয়ে থাকে অন্ধরা'। অর্থাৎ—"হুঁ, তারা নিজেরাই নিজেদের দেখছে, একজন আর একজনের পিঠ চুলকোচ্ছে, পৃথিবীর কেউ তাদের কথা শুনছে না, তাদের কবিতা পড়ছে না, কবিতাই আর মানুষে পড়ছে না, পৃথিবী এখন রাজনীতি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, জনসংখ্যার চাপ নিয়ে অস্থির চঞ্চল, তার ওপর ক্ষণে ক্ষণে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার রোমহর্ষক চমক—" (পৃ. ৫)

ঘ. তাবৎ সামাজিক প্রতিকূলতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ব্যক্তিগত জীবনের রূঢ় অভিঘাত সত্ত্বেও যাঁরা কবিতা লিখে চলেছেন, বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন 'কবিতা' নামক লুপ্তপ্রায় শিল্পটিকে তাঁদের শক্তির উৎস চারিত্রিক দৃঢ়তা। নিছক একটা কবিতা লেখার আনন্দে মহাদুঃখেও তাঁরা হাসতে পারেন। দুঃখ-যন্ত্রণা-ক্ষোভ হেন ঝড় থেকে মুক্তি পাওয়ার আস্বাদ লাভ করেন এই কবিতার মধ্যেই। "রামানন্দ এক এক সময় চিন্তা করে, যেন তুমুল ঝড়জল আরম্ভ হয়েছে, বাগান জলে থই থই, আর সেই গলা-জলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঝড় মাথায় করে ক'টি দোপাটি চারা, ক'টি আধুনিক কবি ফুল ফোটাবার অবোধ আনন্দ নিয়ে হি-হি করে হাসছে।..." (পৃ. ৫)

ঙ. কবি-সাহিত্যিক—তিনি খ্যাত হোন কিংবা অখ্যাত, পুরস্কার বিজয়ী কিংবা নয়—নিখিল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তিনি অকিঞ্চিৎকর। তাই শুভেন্দু বিকাশের দল যতই তাঁকে দুধর্য আধুনিক কবি বলে সম্মান দিক, রাস্তায় কেউ যদি রামানন্দ সেনের পা মাড়িয়েও চলে যায়, তিনি দৃক্‌পাত মাত্র করেন না। নির্বিকার থাকেন। কারণ তিনি জানেন আকাদেমি বিজয়ী হেম মজুমদারকেও এক রিক্‌সাওয়ালা পয়সা নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় লালচোখ দেখিয়ে চড় মারতে উদ্যত হয়েছিল। তাঁকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে যায়নি। এমনকি তাঁর সাহিত্যসঙ্গীরাও না। "...বরং রিক্‌সা থেকে নেমে নতুন জুতোর কামড় খেয়ে কালাপাহাড়ি শরীরটা নিয়ে হেম মজুমদার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বইয়ের দোকানে ঢুকছিল দেখে রাস্তার একগাদা মানুষ হি হি করে হাসছিল। বিকাশের মুখে এই রসাল গল্প শুনে মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে রামানন্দরা কম হেসেছিল কি।" (পৃ: ১০)

চ. মৃত্যুভাবনা কবি-সাহিত্যিকদের এক প্রিয় অধ্যাস। কেবল বাইরের অভিঘাত না, তীব্র বিষাদজনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেও তাঁরা মৃত্যুর দ্বারস্থ হতে পারেন। আবার হঠাৎ কোনো কারণে মৃত্যুর দিকে যদি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ান, নতুন কোনো স্বকীয় সৃষ্টি ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন। সবটাই প্রকৃতি নির্ভর। রামানন্দ সেন আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হন মুখ্যত পত্নীবিরহে—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি পঞ্চাশের কোঠায় পা রেখে আরো অনেক সত্য জেনেছিলেন তিনি —যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পরোক্ষে পূর্বোক্ত কারণগুলিও তাঁর মৃত্যুচিন্তায় ইন্ধন জুগিয়েছিল।

উপন্যাসে লেখক এক জায়গায় বলেছেন—"একটি আনন্দেই তার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা না, একটি জ্বালা নিয়ে সে মরত না, অনেক যন্ত্রণা, অনেক আনন্দ, অনেক গান ও কান্না নিয়ে শিল্পীর কারবার। আর এ-ও সত্যি, যদি মেয়ের কথাই ধরা যায়,

পূরবীর চেয়ে ঢের ঢের সুন্দর মুখ, সুন্দর শরীরের মেয়ে রামানন্দর চারপাশে ঘুরঘুর করত, অটোগ্রাফের জন্য এসেছে, কবিতার জন্য এসেছে, কবিতা বুঝতে বা কবিতা লিখে রামানন্দকে শোনাতে আসত কত। তার ইমেজের অভাব হতো না। তবে?" (পৃ. ১২)

এই 'তবে'—একটি মাত্র প্রশ্নচিহ্নে এসে থমকে যান তাবৎ বোদ্ধা। এমনকি রামানন্দ সেনের কবিবন্ধু শুভেন্দু বিকাশের দলও। আর তখনই তারা সিদ্ধান্তে আসে নিছক খেয়াল বশত রামানন্দর এই মৃত্যুবরণ।—"মরণের খেয়াল, শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করবে, জীবনকে দেখতে দেখতে মৃত্যুকে দেখবার সাধ জেগেছিল রামানন্দর, জীবনের আলোর ওপিঠে মৃত্যুর অন্ধকার কেমন, জানবার ও দেখবার দুরন্ত লোভ এমনই তাকে পেয়ে বসেছিল, তাই এভাবে শিল্পী নিজেকে শেষ করল। খেয়াল ছাড়া আর কিছু না।" (পৃ. ১২)

কিন্তু কেবলমাত্র 'খেয়াল' নামক শব্দবন্ধটির মধ্য দিয়ে যেন উত্তর সম্পূর্ণ হয় না। একটা বিস্ময়, একটা বোবা শূন্যতা প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উহ্য থেকে যায়। কারণ, যে শিল্পী নিজেকে নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার কাজে মত্ত থাকেন, যিনি ছড়িয়ে পড়তে জানেন জীবনযাপনের প্রাত্যহিকতায়, প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে, যিনি সমস্ত ঝড়ঝাপটা সহ্য করে ছোট্ট দোপাটি চারার ক্ষুদ্রতা নিয়েও কবিতাব মধ্যে মুক্তি খুঁজতে পারেন আপন মৌলিকতায়, শিশুর আনন্দে, বার্ধক্যের প্রজ্ঞায় এবং যৌবনের নির্ভীকতায়—তিনি কেন অর্থাৎ রামানন্দরা কেন চলে যান। এই 'কেন'র উত্তর স্বরূপ 'খেয়াল' শব্দটা বোধহয় পুরোপুরি প্রয়োজ্য নয়।

রামানন্দ নিজেও এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজেছেন—"হুঁ, কেন। কেন আমরা কবিতা লিখি আর মোহন পাল কেবল হিসাবের খাতা দেখে? যদুবাবু কেন রাতদিন ছবি আঁকে আর মধুবাবু কেবল কালো বাজারে ঘোরে? কেন মানুষ চাঁদে পাড়ি দেয়? ধানকাটা নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে কেন? শ্রীমতী কেনেডি কেন বুড়ো ওনেসিসকে বিয়ে করে? পূরবী কেন স্বামীর ঘর ছেড়ে আলাদা ঘর ভাড়া করে? মুকুন্দবাবু, ধরা যাক্ মুকুন্দবাবুই মানুষটার নাম, রাত জেগে পাঁচশ পৃষ্ঠার ঢাউশ উপন্যাস পড়ে কেন, কেনই বা লিটল ম্যাগাজিনের কবিতার পৃষ্ঠা ছিঁড়ে সেফটি রেজারের সাবানের ফেনা ও কাটা দাড়ি মোছে। শুভেন্দুদের বোঝা উচিত; পৃথিবীতে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি 'কেন' মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। একটা 'কেন'রও কোন উত্তর হয় না।" (পৃ. ৮-৯)

অতএব পৃথিবীর ইতিহাসে 'কেন'—নামক প্রশ্নটি, অন্তত রামানন্দরা কেন চলে যান—এই প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। অমীমাংসিত—কারণ রামানন্দ সেনের মতো কবি-শিল্পীরা একান্ত প্রিয়জনের কাছে তো বটেই, কখনো কখনো নিজের কাছেও দুর্বোধ্য থেকে যান। উত্তর দেবে কে! আদতে শিল্পীর সৃষ্টির অভিঘাতে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো অজস্র অনুরাগী, স্তাবক ও প্রণয় প্রার্থীর দল ভিড় করলেও শিল্পীর চাই নির্দিষ্ট কোনো ভালোবাসার হাত। শিল্পীর আত্মা চির অতৃপ্ত। তাঁর ক্ষুধা সর্বগ্রাসী। সংসার বা ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন—দুটোই তাঁর সৃষ্টির জগৎকে বাঁচিয়ে রাখতে অপরিহার্য। সংসারজীবনের বাইরে যারা তাঁকে ভালোবাসল, তারা কেবল শিল্পী রামানন্দকে

ভালোবাসল। ঢেউ-এর মতো তাদের আসা-যাওয়া। কিন্তু ব্যক্তি রামানন্দ অর্থাৎ সমগ্রের আধারে দৈনন্দিনের গ্লানি এবং বৈভব নিয়ে যে রামানন্দ, তাঁকে ভালোবাসতে গেলে প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তার অনিঃশেষ দহন। দুঃখে-দৈন্যে আনন্দ-বিষাদে চোরাস্রোতের মতো সকলের অলক্ষে যা স্বতঃ প্রবহমান।

কিন্তু কজন পারে নিজেকে পুড়িয়ে প্রেমাস্পদের জীবনে সৌরভ ছড়িয়ে দিতে। পূরবী পারেনি। অথচ রামানন্দর চাহিদা ছিল সেখানেই। তেমনই সর্বগ্রাসী। পূরবী পারেনি কিন্তু তাকে দোষ দেওয়া যায় না। অন্তত রামানন্দ দোষ দেননি। কারণ, প্রতি মানুষের আছে নিজস্ব 'আইডেনটিটি' খোঁজার অধিকার। যদিও পূরবীর কোনো বিশাল কর্মজগৎ ছিল না। সে নিজে কবি, শিল্পী বা নেতা নয়, তবু পূরবী চেয়েছিল সচ্ছলভাবে খেয়ে পরে বাঁচবার মতো এক সুস্থ জীবন। সামান্য স্কুল শিক্ষক রামানন্দর পক্ষে তা অসম্ভব জেনে শিক্ষিতা পূরবী তাই প্রাথমিকভাবে মার্চেন্ট অফিসে ঢুকে আর্থিক স্থিতিশীলতার পথ প্রশস্ত করে। পরে অর্থাৎ আরো পনেরো বছর পর যখন কবি রামানন্দ সেনের স্ত্রী হিসেবে পরিচয়ের গৌরবটুকুও বহন করা অর্থহীন মনে হয়, তখন পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা অর্থাৎ অন্যত্র ফ্ল্যাটভাড়া নিয়ে রামানন্দ সেনের জীবন থেকে তার সরাসরি প্রস্থান।

পূরবী চলে যায়। কিন্তু রেখে যায় পরিণামহীন শূন্যতা। তদুপরি আড়াইশো টাকা ফ্ল্যাট ভাড়া একা বহন করার দায়িত্ব। সর্বার্থে প্রেমহীন জীবনযাপনের গ্লানি, নারীসঙ্গের অভাব, একাকীত্ব ও শূন্যতা বোধ রামানন্দকে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে সাহায্য করে।

কিন্তু কোনো কারণে মৃত্যুও যদি বিমুখ হয়! অর্থাৎ সময়মতো রেলগাড়ি না আসা, চিত্রকর জগত মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় যদি মৃত্যুকে রোধ করে, তা হলে রামানন্দরা কোথায় যান!

উত্তর অনুসন্ধানে দেখা যায়, 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে রামানন্দ সেনের চরিত্রধর্ম উল্লেখ করতে গিয়ে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কিত আমাদের তাবৎ ভাষাশিক্ষা নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

তিনি শিল্পীকে নিয়ে যান একই সঙ্গে শুঁড়িখানায়, বেশ্যালয়ে। যদিও রামানন্দ বেশ্যাসক্ত নন। আবার, অক্ষয়-মাধুরীর সুখী গৃহকোণ-এর স্নিগ্ধ আশ্রয়ে। শিল্পী রামানন্দ একাধারে স্বভাবধর্মে শিশু, চেতনায় প্রাজ্ঞ এবং সৌন্দর্যের আরাধনায় একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর বহুধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের বলয়ে বিস্ময়াহত করেন সমগ্র পাঠকসমাজকে।

ব্যক্তি রামানন্দর একাকীত্ব তৃপ্তি পায় অক্ষয়-মাধুরীর সুখী সমৃদ্ধ গৃহকোণে। সেখানে তিনি দিন কাটান এক আগন্তুকের মতো। যেন এমনই এক জীবন প্রার্থিত ছিল তাঁর। সেখানে কবিতা নেই। কিন্তু কবিতার মতো নারী (মাধুরী) আছে। সেখানে শিল্প নেই। কিন্তু শিল্পের থেকেও সত্য অক্ষয় সমাদ্দারের মতো সফল ব্যবসায়ীর সংগ্রামী জীবনের ছবি আছে। তাদের গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-বিষাদ সমৃদ্ধ জীবনের ছবি দু'চোখ ভরে দেখে এক সহজিয়া বাউলের মতো বেঁচে থাকতে চান রামানন্দ।

আবার, শিল্পীর জীবন কখনো সহজ সুস্থিত নয়। যখন পার্থিব জীবনের চাহিদা

কমবেশি তৃপ্ত। তখনো চির অতৃপ্তি, আত্মার অস্থিরতা তাকে তাড়া করে ফেরে। স্ত্রী পূরবীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর অক্ষয়-মাধুরীর সংসারে আশ্রয়লাভ ও মাধুরীর স্বভাবমাধুর্যের ছায়ায় দিনগুলি কাটিয়ে দিলেও সংসার, কর্মজগৎ ও কাব্যজগৎ ছেড়ে আসা ছিন্নমূল জীবন যাপনের যন্ত্রণা তাঁকে ক্লিষ্ট করে। সুতরাং পলাতকের জীবন। অঢেল মদ্যপান। বেবাক ভুলে থাকা অর্থাৎ নিদ্রালু আত্মবিস্মরণ। 'পদাবলী'র অফিস, মোহন রেস্টুরেন্ট ও কুড়ি বছরের আড্ডাসঙ্গী কবিবন্ধুদের সংসর্গ ত্যাগ করে, টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটের নিষ্ঠুর শূন্যতা উপেক্ষা করে কর্মজীবনের গতানুগতিক দায়বদ্ধতা তুচ্ছ করে শুঁড়িখানা তখন রামানন্দ সেনের পরিচিত ঠিকানা।

সুতরাং রামানন্দ সেনের অজ্ঞাতবাস, অন্যের সংসারে অন্যের পয়সায় মদ খেয়ে উঞ্ছবৃত্তি যাপন, 'পদাবলী' গোষ্ঠীর কবিদের চোখে 'লম্পট', 'নারীলিপ্সু', 'গাড়ল' অভিধায় চিহ্নিত হলেও রেস্টুরেন্ট মালিক মোহনবাবুর ধারণায় এ তাঁর নতুন 'আইডিয়া' বা 'ইমেজ' সংগ্রহের অভিযান। চিত্রকর জগত মণ্ডলও রামানন্দ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করেন অর্থাৎ অসুখ সেরে গেলে কবি আবার কবিতা লিখবেন।

এখন মোহনবাবু এবং জগত মণ্ডলের বিশ্বাস অনুযায়ী রামানন্দ সেনই তন্নিষ্ঠ শিল্পীর আদর্শ কি না তেমন কোনো প্রমাণিত সত্যের দিকে যাত্রা করবার আগে আমরা দেখব রামানন্দ সেন কী বলেন। অর্থাৎ, রামানন্দর আত্মজিজ্ঞাসা বনাম শিল্প-মূল্যায়ন।

উল্লেখ্য, কাহিনীর কোনো অংশে রামানন্দ সচেতন আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হননি। এখানেই লেখকের বয়ননৈপুণ্য (style)। তিনি কবিকে উপস্থাপিত করেছেন নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবন-বৃত্তে। সেখানে অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ, আচ্ছন্নতা, বিহ্বলতা, উঞ্ছবৃত্তি—সবই বর্তমান। কবি হিসেবে তাঁর যে স্বাতন্ত্র্যটুকু তা হল কবির দেখার জগৎ। উপলব্ধির জগৎ। যা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি প্রসারিত। সেই বিস্তৃত উপলব্ধির ভিত্তিতে, আপনার প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহের প্রেক্ষিতে রামানন্দর যাবতীয় বিশ্লেষণ ও শিল্প সম্পর্কিত চৈতন্যের উত্তরায়ণ।

রামানন্দ সেনের জীবনক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মোহনবাবুর বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং প্রশস্তিতে তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। পদাবলী গোষ্ঠীর কবিবৃন্দ তাঁকে পূর্বজীবনে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি বলেন "...'কে বলেছে আমি কবি, আমি কবি নই, আমি সাধারণ মানুষ, নর্ম্যাল মানুষ—ডিসেন্সি বজায় রেখে সাধারণ কাজকর্ম করে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতে আমি ভালবাসি। কবিদের আমি ঘেন্না করি।' একদলা থুথু ফেলে ঘাড় সোজা রেখে রামানন্দ হাঁটতে লাগল। হুঁ আমি পোলট্রি করছি, অক্ষয় সমাদ্দারের হাঁস-মুরগি দেখতে হয় আমাকে।" (পৃ. ১৯৫)

এখানে কবি এবং কাব্যরচনা সম্পর্কে তাঁর তীব্র বিবমিষা যে শিল্পচেতনা প্রকাশ করে তা হল— ক. শিল্পের সত্য আপেক্ষিক। জীবনের সব সত্য শিল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে তুলে ধরা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ—"...কবিতার মধ্যে বা তুলির টানের মধ্যে সব কিছু ধরা দেয় না, পৃথিবীর কিছু আশ্চর্য জিনিস কিছু রং রেখা ও কালির আঁচড়ের বাইরে থেকে যেতে চায়, শত সাধ থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের সবটা রূপ প্রকাশ করতে

পার না, কিছুটা পার, বাকি চৌদ্দ আনা অংশই তোমার দৃষ্টি তোমার অনুভবের আড়ালে থেকে যায়।" (পৃ. ৩৯)

খ. শিল্পীর দৃষ্টিও আচ্ছন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে আচ্ছন্ন চৈতন্য নিয়ে রচিত সাহিত্য এক কথায় শিল্পের নামে ভণ্ডামিরই নামান্তর। কাজেই শুভেন্দু বিকাশ প্রমুখের সম্বন্ধে রামানন্দর ধারণা হল ওরা 'অ্যাকোরিয়ামের মাছ।' ওদের গণ্ডিবদ্ধ জীবন অল্পে তৃপ্ত। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য ও সম্পর্ককে ওরা বিচার করে যৌনগন্ধী চেতনার মাপকাঠিতে।

গ. অতএব প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিকতার। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ব্যক্তিবিশেষের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব! যদি না হয়, তা হলে ব্যক্তি বা জীবন সম্পর্কে যে অর্ধসত্য প্রকাশ—শিল্পের চাতুর্য তারও আর এক নাম। তা 'শিল্পের সংকটও' বটে।

রামানন্দ নিজেও শিল্পের প্রতি অবিচারের দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে পারেন না। পাইকপাড়ার 'সোনালী বাসর'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে কাব্যভাবনা সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্য এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে সত্যিকার কবিতা লেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সেক্‌শপীয়র কালিদাস গ্যেটে শেলী কীট্‌স ব্রাউনিং র‍্যাঁবো বোদলেয়ার মালার্মে ইয়েট্‌স পাউণ্ড অডেন পস্তারনেক জীবনানন্দ সুধীন দত্ত কেউই পারেননি সত্যিকার কবিতা লিখতে। কারণ ফর্মের খাঁচায় ঢুকে মেপে মেপে শব্দ বসিয়ে ভেবে ভেবে ছন্দ রচনা কবিতা নয়। তাঁর বক্তব্য হল—"কবিতা, আসল কবিতা, খাঁটি কবিতা, একবারই লেখা হয়, এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতন, রক্তে হৃৎপিণ্ডে এর ছন্দ বেজে ওঠে। হুঁ, একজনের মধ্যেই এই কবিতার সৃষ্টি, একজনই এর পাঠক, একজনই বোদ্ধা—আমার মন ছাড়া আর কারো মনের গভীরে আমি প্রবেশ করতে পারি? আমার মধ্যে হেমারেজ হচ্ছে, অন্যের তা দেখবার জানবার বুঝবার কথা না, আর একজনকে জানাতে যাওয়াও বাতুলতা—

...সন্তানের মুখে প্রথম স্তন গুঁজে দিয়ে মা বোঝে সত্যিকার কবিতা কী, কবিতা কেমন—মুখে বিষ নিয়ে, আগুনে ঝাঁপ দেবার মুহূর্তে কি বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েও কিছু মানুষ কবিতা লিখেছে—হুঁ, তা-ও সত্য, কিন্তু ঘরের কোণায় টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে মেপে মেপে শব্দ বসিয়ে পঙক্তি সাজিয়ে ধ্বনিমাধুর্যে শ্রুতিমধুর করে তুলে আমার জ্বালা আমার পুলক আমার রক্তক্ষরণ আমার হৃৎপিণ্ডের ভূমিকম্প পাঁচজনের পাতে পরিবেশন করব—কবিতার নামে আর একটি বুজরুকি, আর একটা ধাপ্পা, হা-হা-হাসি পায়—" (পৃ. ২৩৪-২৩৫)

প্রশ্ন জাগে কবিতা বা সৃষ্টি সম্পর্কে রামানন্দ সেনের এহেন মনোভাব তাঁর অসংলগ্ন ব্যক্তিজীবন তথা মনোবিকলনের প্রকাশ কি না। কারণ ৩৬ পরিচ্ছেদে এই রামানন্দই জানিয়েছেন, "'সব মাথা মোটার দল,' রামানন্দ হুঙ্কার ছাড়ল। 'বাংলা দেশে শালা পড়ুয়া আছে নাকি—মানে এক লাইন গদ্য পদ্য বুঝবার মতন মগজ আছে কোনো বেটার?' গেলাসটা ঠক করে নামিয়ে রেখে রামানন্দ হাতের তেলো দিয়ে খুব করে নাকের ডগাটা ঘষল। 'যে কারণে যে দুঃখে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি—বোদ্ধার দলকে আমার

চেনা হয়ে গেছে—বুঝলে রেখা, বুঝলেন নন্দবাবু, অনেক ঘা খেয়ে তবে আমি হাতের কলম ছেড়েছি।'" (পৃ. ২৭০)

অর্থাৎ ২৮ অধ্যায়ে 'সোনালী বাসর'-এর অনুষ্ঠানে যিনি বলেছিলেন কবিদের দেখলে তাঁর থুথু ছিটোতে ইচ্ছা করে। কুকুরের তুলসীগাছে প্রস্রাব করার মতো তিনি কবিদের আড্ডা দেখলে অনুরূপ কর্ম করে আনন্দ পান এবং নিজের কবিতাকেও যাঁর 'দুষ্কর্ম' বলে মনে হয়, পরবর্তী অধ্যায়ে তিনিই স্বীয় রচনার মৌলিকতা ও বলিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন আত্মবিশ্বাস এবং অবশ্যই বোদ্ধা পাঠকের অভাব জনিত ক্ষোভ এবং দুঃখকেই তাঁর কবিতা না লেখার মূল কারণ হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।

উপন্যাসে রামানন্দ সেন একাধিকবার অনুরূপ পরস্পরবিরোধী মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে লৌকিক বিচারে তাঁকে পাইকপাড়ার জনতার ভাষায় উন্মাদ, বিকারগ্রস্ত এবং পদাবলী গোষ্ঠীর কবিদের ভাষায় কবি বামানন্দর 'কঙ্কাল' অভিধায় হয়তো চিহ্নিত করা যায়। সেক্ষেত্রে 'জনতার মার' অর্থাৎ কিল চাপড় ঘুঁষি খাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু স্রষ্টাব মর্মভেদী বিচারে বৈপরীত্যধর্মী পরস্পরবিরোধী সামগ্রিক রামানন্দ সেনই সত্য, যিনি তথাকথিত ভাববিলাসী অর্থাৎ ভাবের ঘরে চৌর্যবৃত্তিকারী কিছু ভণ্ড সন্ন্যাসীর মতো শিল্পীসত্তার প্রেক্ষিতে পরীক্ষিত সত্য। রক্ষণশীল আমজনতার প্রতি বিদ্রূপতীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ে দিলেও প্রকৃত অর্থে সৃষ্টি বা স্রষ্টা সম্পর্কে কোনো বিরাগ তাঁর নেই।

সভা-সমিতি-অনুষ্ঠানে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ সত্ত্বেও গুণ্ডা দিয়ে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তাঁকে পাইকপাড়ার অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা শিল্পীসুলভ তাৎক্ষণিক 'ফ্রাশট্রেশন' থেকে কিছু আলপট্‌কা কথা হয়তো তিনি বলেছেন। কিন্তু সবটাই অসংলগ্ন নয়। অর্থাৎ ঘটমান প্রকৃতির সামগ্রিক রূপ শিল্পে তুলে ধরা সম্ভব নয়। রামানন্দর ব-কলমে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রের এই জীবনদর্শন নিঃসন্দেহে সত্যের একদিক ছুঁয়ে থাকার দাবি করতে পারে।

'সত্যের একদিক'—কারণ ক্রান্তদর্শী স্রষ্টা যদি ব্যক্তি তথা জীবন তথা রহস্যময় প্রকৃতিব এক অংশও তুলে ধরতে পারেন, তা হলে নিখুঁত ছোটগল্পের মতো কিংবা ঝিনুকে লুকোনো মুক্তোর মতো তা-ই সত্য এবং সুন্দরের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করতে সক্ষম। তা ছাড়া বোদ্ধা পাঠকের অভাবে কবি যদি কলম বন্ধ করেন, তা হলে সৃষ্টি ব্যাহত হয়। স্তিমিত হয় স্রষ্টার আনন্দও। নিরানন্দময় দিনযাপন কাম্য নয় কোনো একজনের কাছেও। না সাধাবণ ব্যক্তিমানুষ না শিল্পীর। তাই শিল্পানুরাগিণী রেখা চক্রবর্তীর উদ্দেশে রামানন্দর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"আমিও যে ব্যর্থ—সব দিক থেকে মাইনাস—আপনাকে পেয়ে নন্দবাবু নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছেন—এখন তিনি সবল হাতে কলম ধরবেন, নন্দবাবুর পাশে থেকে আপনার জীবন আগের চেয়ে অনেক বেশি মধুর উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠল—কিন্তু আমার যে কোনো আশাই নেই, আমাকে গ্রহণ করবে কে?" (পৃ. ২৭১)

বস্তুতপক্ষে 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে আমরা একযোগে শিল্পী এবং শিল্পের

যুগপৎ আর্তনাদ শুনতে পাই। ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার তূরীয় স্ফুরণে যে শিল্পী বা স্রষ্টার বিকাশ, তাঁর জাগ্রত চৈতন্য কেবল সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। জগৎ ও জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সৌন্দর্য ও সাযুজ্য সন্ধানেই তাঁর মনুষ্যত্বের তৃপ্তি, আত্মার আনন্দ।

কিন্তু এ তো নিছক তত্ত্বকথা। তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল কুশলী জ্যোতিরিন্দ্র অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস রেখেছেন অক্ষয়-মাধুরীর সংসারে রামানন্দ সেনের অজ্ঞাতবাস পর্বে।

এতক্ষণ আমরা ক্রোধ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন দুঃখ এবং আবেগে আপ্লুত ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রের রামানন্দকে দেখেছি। এবার পরিচয় সৌন্দর্যের সাধক রামানন্দের সঙ্গে—যাঁর সৌন্দর্যদর্শনের সঙ্গে সত্যের সংঘাত অনিবার্য। অনিবার্য এও—সত্য এবং সুন্দরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

অজ্ঞাতবাস পর্বে যে রামানন্দ সেনকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তিনি সযত্নে কবি পরিচয় অস্বীকার করতে চাইলেও আদতে তাঁর দৃষ্টি কিন্তু শিল্পীর। শিল্পীর ভাবালুতা, আবেগঘন বিশ্লেষণ, সত্যের অভিঘাতে মুহ্যমান অবস্থা—এ সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান।

অক্ষয়-মাধুরী সম্পর্কে রামানন্দর সর্বোৎকৃষ্ট উপলব্ধি হল—'তারা নিজেরাই একটি শিল্প' একদিকে অক্ষয়-মাধুরীর নিবিড় দাম্পত্যপ্রেম, অক্ষয়ের অসুস্থতায় মাধুরীর বিরহ-বিষাদ, আবার হাঁস-মুরগি পালন সহ সংসারের প্রতিটি কর্মের নিখুঁত সম্পাদন, বাউণ্ডুলে মাতাল রামানন্দকে যত্ন সহকারে নিবিড় মমতায় আহার পরিবেশন, মেলা দেখতে যাওয়ার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস-উদ্বেল বামানন্দর মৃদু মাতলামি ও মাধুরীর সস্নেহ ভর্ৎসনা, পাইকপাড়ার 'সোনালী বাসর'-এর আমন্ত্রণে রামানন্দকে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে নিয়ে যাবার সময় মাধুরীর চোখের জল—এ সবের মধ্যে রামানন্দ যেমন রন্ধনপটু মাধুরীর তৈরি সুস্বাদু খাবারের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার সহজ সৌন্দর্য খুঁজে পান, তেমন ভেড়ী খোওয়ানো অক্ষয়ের সফল ব্যবসাদার হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা, হাসপাতালের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী নার্সদের দু'চোখ ভরে দেখা ও তাদের (তরলা বোস ও ফুলরেণু মজুমদার) তুলনামূলক বিচারে কৌতুকপূর্ণ বিশ্লেষণ—রামানন্দর কাছে জীবনের স্বাদ কিংবা সজীবতা রক্ষার অভিপ্রায় সিদ্ধ করে।

কেবল তা-ই নয়, সংসার প্রাঙ্গণে একা মাধুরী, মাধুরীর রূপ-লাবণ্য, তার প্রতিটি বিভঙ্গ সৌন্দর্যরসিক রামানন্দ পান করেন নীরব দূরত্বে দাঁড়িয়ে।

পুকুরঘাটে কালো কুচকুচে তালগুঁড়ির উপর বসে 'পাকা কাঁঠাল কোয়ার মত হলদে রঙের রোদ' গায়ে মেখে, 'দুধের মত সাবানের ফেনা' তুলে মাধুরীর স্নান, স্নান করতে করতে ঊর্ধ্বমুখ গান গেয়ে ওঠা, কিংবা কিশোর শফীউল্লার সঙ্গে সাঁতারের কপট প্রতিযোগিতা, রং-বেরঙের শাড়ি-ব্লাউজ, সুগন্ধী তেল সাবান সহযোগে মাধুরীর সজ্জাবিলাস, নিত্যনতুন হ'য়ে ওঠা, পিঠে ভিজে চুল ফেলে কোমর ভেঙে ঘুরে ঘুরে অক্ষয়ের হাঁস-মুরগিদের যব-ভুট্টা খাওয়ানো, প্রেক্ষিতে চিকরি কাটা রোদ, মনসা ও মাদারের বেড়া দেওয়া মাধুরীর আঙিনা, দক্ষিণ খোলা উঠোন, উঠোনের একপাশে লাউ-কুমড়োর লতা,

পশ্চিমজুড়ে হাঁস-মুরগির খাঁচা—প্রকৃতির পরিপার্শ্বে আপনমনে ক্রীড়ারত মাধুরী তাঁর কাছে অনন্যা শিল্পনারী সংজ্ঞায় প্রতিভাত।

অক্ষয়-মাধুরীর জীবনযাপন যদিও শিল্প, তাদের নিয়ে শিল্পসৃষ্টি কিন্তু রামানন্দর একেবারে না-পছন্দ। কেউ যদি তা করতেও আসে তিনি নিশ্চয় মারমুখো হয়ে তেড়ে যাবেন। কারণ রামানন্দ যেমন বিশ্বাস করেন, শিল্পী-সাহিত্যিকের তুলিকলমে সৃষ্টির সব রহস্য প্রকাশ সম্ভব নয়, এও বিশ্বাস করেন, নিজ অভিরুচি অনুযায়ী রূপ পায় সৃষ্টি। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল—প্রথমত, "এখানে শিল্পচর্চার কোনো মানে হয় না। ছবি বা গল্প উপন্যাস নিয়ে রামানন্দ যদিও খুব একটা কিছু বলতে চায় না, কেননা ওই দুটো শিল্প তার এখতিয়ারের বাইরে, তার চর্চা নেই, তাহলেও যতটা সে বোঝে ওই যে হাসপাতালে শুয়ে অক্ষয় হলদে ফ্যাকাশে চোখ মেলে বেঁটে গোলগাল ফর্সা চেহারার একটা নার্সের দিকে সময় সময় চেয়ে থাকে এবং ডিউটি শেষ করে নার্সটা বেরিয়ে যাবার পর ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে বাড়ির হাঁস-মুরগি, ঝিঙে কুমড়ো লতা ও মাধুবীর কথা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে এবং এক সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেশি ডিম ফুটাবার জন্য একটা ইনকিউবেটার কেনা যায় কিনা চিন্তা করে, তাকে নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখলে পুরোপুরি ঠিক ঐ মানুষটাকে কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারবে বলে রামানন্দ ভরসা করে না।" (পৃ. ৩৯)

দ্বিতীয়ত, "আর এ-ও সত্য, রামানন্দ চোখ বুজে বলতে পারে, কবিতা লিখতে বসে কবিরা শেষ পর্যন্ত অক্ষয়কে বাদ দেবে, সে পুরুষ, তারা ভাববে অক্ষয়কে নিয়ে শিল্পকর্ম করার সব দায় দায়িত্ব গদ্য লিখিয়েদের। তারা মাধুরীকে নিয়ে পড়বে। বাংলা দেশ। কবিরা রাধার কীতন করতে খুব ভালবাসে।

..শুভেন্দুদের মধ্যেও অনেকেই মাধুরীকে দেখলে এই মুহূর্তে 'নোংরা পাখি' হয়ে ওর শরীরটা ঠুকরে খেতে চাইত, কেননা ওখানে 'জলকেলি লোভ ও রক্ত' ছাড়া তারা আর কিছু দেখতে পেত না।" (পৃ ৪০)

অক্ষয়-মাধুরী কিংবা মাধুরীকে নিয়ে শিল্প রচনায় রামানন্দর ঘোরতর আপত্তির আরো অন্যতম কারণ—তিনি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে শিল্পের উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। সে সব নিয়ে গল্প উপন্যাস কবিতা লেখাও হয়েছে বিস্তর। এমন অনেক চরিত্রের দেখাও মেলে যারা শিল্পী-সাহিত্যিকের রচনায় স্থান পাওয়ার জন্য আকুল। প্রসঙ্গত সোনাগাছির সরযূ (জগত মণ্ডলের এঁকে দেওয়া বিভিন্ন বিভঙ্গের ছবি ঘরের সর্বত্র টাঙিয়ে রেখেও রামানন্দর কবিতায় যে নতুন করে নিজেকে দেখার আহ্লাদ প্রকাশ করে), জনৈক গুণমুগ্ধ পাঠিকা শহুরে শিক্ষিতা রেখা চক্রবর্তী (কবি-শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করা এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া যার প্রিয় সংরাগ) এমনকি তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী পূরবীকে (যেহেতু রামানন্দর ধারণা তাঁর কবিতায় চিরস্থায়ী অমরত্ব পেলে পূরবী হয়তো তাঁকে ছেড়ে যেত না) বিষয় করেও শিল্পের জাল বোনা সম্ভব। যেহেতু শহর কলকাতার রাজনীতি, বঞ্চনা, ক্ষুধা, অবক্ষয়ের জটিল আবর্তে তাদের বিহার 'খোলসছাড়া সাপের মত'। শিল্পের অঙ্গনে তাই

তাদের নতুন করে বেঁচে ওঠা ও সুরভিত হওয়ার সাধ—"কলকাতার সব মানুষ, যাদের ভিতর পচে যাচ্ছে, এভাবে কবিতার মধ্যে গল্পের মধ্যে নয়তো ছবির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর ছটফট করছে।" (পৃ. ৪৩)

কিন্তু মাধুরী সবরকম জটিলতা ও মালিন্যমুক্ত। অন্তত রামানন্দর দৃষ্টিতে। মাধুবীর সুসংগঠিত শরীরী সৌন্দর্য, তার স্বভাব মাধুর্য, অক্ষয়ের প্রতি ভালোবাসা ও উদ্বেগ নিয়ে মেঘ-বৃষ্টি-রোদ সমৃদ্ধ মাধুরী তাঁর কাছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ধরা দেয়।—"উঁহু, মাধুরীর সবটাই নতুন তাজা বর্ণাঢ্য সুরভিত। তোমার আমার তৈরী মেকি ছবি কবিতা গল্পের এখানে দরকার নেই। আকাশের নীল, খালের জল, রাজহাঁসের ধবধবে ডানা তার কবিতা। মাদারের বেড়া দেওয়া টালির ঘর, খাঁচার রং-বেরঙের মুরগি, খাঁচার পাশে সাজিয়ে রাখা হাঁড়ি ভর্তি ভুট্টার ছাতু, হাড়ের গুঁড়ো, হাসপাতালে রুগ্ন অক্ষয়—এসব তার গল্প। আর এই যে এতক্ষণ সাবান-টাবান মাখার পর এখন জলে ঝাঁপ দিল, পর পর দুটো ডুব দিয়ে জল ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কেটে হাঁসেদের কাছে চলে গেল, মাদী রাজহাঁসের লম্বা গলা জড়িয়ে তার কানে কানে দুটো কথা বলল—এসব হল ছবি, মাধুরীর জীবনের ছবি। অন্য ছবি তার পছন্দ হবে কেন।" (পৃ. ৪৩)

বস্তুত স্ত্রী পূরবীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর রামানন্দ তাবৎ নারীর প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন। সব নারীর মুখে পূরবীর মুখ, সকলের নিঃশ্বাসে পূরবীর নিঃশ্বাস, সকলের চোখে পূরবীর বিদ্বেষ তাঁকে প্রবল নারীবিদ্বেষী করে তোলে। স্বতন্ত্র মাধুরী। সুতরাং মাধুরীকে নিয়ে, অক্ষয়-মাধুরীর দিনলিপি নিয়ে শিল্প, কিংবা শিল্পের নামে ফাজলামি, ইয়ার্কি—কোনোটাই তাঁর পছন্দ নয়। সে কারণ শুভেন্দু বিকাশ এমনকি জগত মণ্ডল নন্দদুলাল (যাদের তিনি শুভেন্দু বিকাশদের তুলনায় প্রাণচঞ্চল মনে করেন) কাউকেই তাঁর বর্তমান ঠিকানা জানান না।

শিল্পীর সামনে রোল মডেল প্লে করার দৈন্য মাধুরীকে যেন শোভা পায় না। কারণ শহুরে কৃত্রিমতা তার মধ্যে নেই। কবি-শিল্পীর সৃষ্টির মধ্যে নিজের অমরত্ব খোঁজার আহ্লাদ তার নেই। সে সুস্থ, সতেজ, সপ্রাণ এক শিল্পনারী।

রামানন্দ এই সৌন্দর্যস্বরূপা নাবী কিংবা বন্ধু অক্ষয়ের জীবনযাপনকে শিল্প-সাহিত্যের নির্দিষ্ট ছকে বেঁধে ফেলতে চান না। নিজেও যেমন তাদের নিয়ে এক লাইন কবিতা লেখেন না, অনুরূপভাবে অন্য কোনো কবি শিল্পীকে জানাতে চান না তাঁদের ঠিকানা। এমনকি নাওভাঙার মেলায় মাধুরীকে দেখে জগত মণ্ডল এবং নন্দদুলাল-এর অত্যুৎসাহী আগ্রহ ও শিল্পসৃষ্টির বাসনায় মাধুরী-অক্ষয়ের ঠিকানায় উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রামানন্দ তীব্র আপত্তি জানান। মারামারি করে মাথা পর্যন্ত ফাটিয়ে ফেলেন।

অথচ রামানন্দর অজ্ঞাতসারে লবণহ্রদে অক্ষয়-মাধুরীর ছোট্ট সংসারে হানাদারের মতো ঢুকে পড়ে এক শিল্পী—শফীউল্লা।

রাজাবাজারের ডিম ব্যাপারী ইয়াকুব মিএরার ছেলে শফী। অক্ষয়-মাধুরীর সংসারে শফীর অনুপ্রবেশ জনৈক ডিম ব্যবসায়ী হিসাবে। আদতে সে রামানন্দ সেনের স্কুলের ছাত্র। স্কুলের পাঠে অমনোযোগী শফীর বোবা করুণ চোখ, মার খাওয়া নত মুখ রামানন্দকে

তাড়া করে ফিরত। ছেলের চোখের ভিতর তিনি যেন 'আকাশ ভরা রোদ', 'মাঠ ভরা ধুলো' প্রত্যক্ষ করতেন। যেন মুক্তির হাতছানি। তাঁর নিজের এবং ইয়াকুব মিঞার ছেলে শফীউল্লার। বিদ্যালয়ের শিক্ষানবিশি থেকে শফীকে রামানন্দ ছুটি করিয়ে দেন এবং বাপজানের ডিম ব্যবসায় লেগে যেতে বলেন। শফী স্কুলে আসত না, কিন্তু তার করুণ চোখ রামানন্দর স্মৃতিপথে হানা দিত। মনে হত কোনো একদিন ওই ছেলে তাঁকে গাছগাছালি ঘেরা কোনো সুন্দর শান্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে। তাকে সোহাগ জানানোর জন্য রামানন্দর শরীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। বস্তুত পক্ষে দৈনন্দিন জীবনে নারীসঙ্গের অভাব রামানন্দকে পীড়িত করে তুলেছিল এ কথা যেমন সত্য, আবার স্ত্রী পূরবীর কারণে তাবৎ নারীজাতির প্রতি বিদ্বেষ তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কাজেই কৈশোর ও যৌবনের ঘোর লাগা সন্ধিক্ষণের শফীউল্লার প্রতি তীব্র টান—"হুঁ, অস্বীকার করে লাভ নেই, যেন দরকার হলে রামানন্দ তখন গলা খুলে মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়, শফীর যে বযস, গোঁফের রেখা উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে, চোখে রক্তের ছিটা দেখা দিয়েছে, এই বয়সের একটি মেয়ের চেয়ে একটি ছেলের সাহচর্য তাকে বেশী সান্ত্বনা দেবে।" (পৃ. ৪৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শফীর প্রতি রামানন্দ সেনের এই সমকামী মনোভাবের আভাসমাত্র আমরা পেয়েছি কেবল একটি পর্বে। আদতে কিন্তু তাঁর পরিচয একজন সৌন্দর্যরসিকের। একজন রোমান্টিক ভাবাবেগসমৃদ্ধ কবির। শফীর সাহচর্য জনিত নির্যাসটুকু নীরবে তিনি উপভোগ করেন মাত্র এবং যেদিন সত্যই শফী তার মাষ্টারমশাইকে বেলেঘাটা সংলগ্ন লবণহ্রদে অক্ষয়-মাধুরীর নির্জন পরিচ্ছন্ন অজ্ঞাতবাসের সন্ধান দেয়, রামানন্দর যথার্থই মনে হয়—"ঐ যে একদিন ছোঁড়ার চোখ দেখে রামানন্দর মনে হয়েছিল, আকাশ ভরা রোদ, পাখির ডাক, ফাল্গুন পড়তে গাছের মাথা লাল হয়ে ওঠে এমন এক দেশে শফী তাকে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। কীলখানার পচা দুর্গন্ধ শকুন ও পশুদের আর্তনাদ পিছনে ফেলে এসে রামানন্দ বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে।" (পৃ. ৫১)

আদতে শফীর চোখ যে এক শিল্পীর, রামানন্দর চেতনমনে কিন্তু তার ছায়া পড়েনি। অক্ষয়-মাধুরী, মাধুরী-শফী কিংবা অবিচ্ছিন্ন মাধুরী—তাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বিশুদ্ধ শিল্পসৌন্দর্য।

অসুস্থ অক্ষয়ের অনুপস্থিতিতে নিছক ব্যবসার উদ্দেশ্যে পোলট্রির ডিম সংগ্রহ করতে আসা ছাড়াও শফীর বিনাকাজে বারবার দিদির কাছে আসা (কখনও শুঁটকি মাছ কখনও পকেট ভর্তি চাঁপা ফুল কিংবা চানাচুর নিয়ে), ওদের জলক্রীড়া, নিঝুম দুপুরে গাছতলায় পাটির উপর বসে দুটিতে গল্প করা, হেলেঞ্চার জঙ্গল থেকে মাধুরীর চুল ছাড়িয়ে পুরো শরীরটাকে ভাসিয়ে নিয়ে শফীর তীরে উঠে আসা (যদিও শফীকে তখন এক জলচর জীব ও গোলাপি মসৃণ শরীরের মাধুরীকে লোভনীয় খাদ্যবস্তু মনে হয়) কিংবা শফীর মাথা টেনে সস্নেহে চুল আঁচড়ে দেওয়া—এ সবই রামানন্দ উপভোগ করেন শিল্পীর আত্মভোলা ভাবচেতনায়।

তাঁর মনে হয়েছে শফী মাধুরীকে একসঙ্গে দেখলে শুভেন্দুরা (পদাবলী গোষ্ঠীর

কবিবৃন্দ) হয়তো সেকস্-এর সংমিশ্রণে ভেনাস অ্যাডোনিস্-এর কাহিনী জাতীয় কিছু ফেঁদে বসবে। অথচ তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস—"...বসন্তের একটা জাঁকাল পুষ্পিত পলাশ গাছের নিচে ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত কৃশকায় এক রাখাল বালক এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিটা সুন্দর। আগেও, যতদিন শফীকে মাধুরীর পাশে দেখেছে, রামানন্দর মনে হয়েছে, বাইরে যতই চঞ্চল অস্থির হোক, আসলে ছোঁড়া অসহায়, একটা গাছের সুশীতল ছায়া খুঁজছে আশ্রয় খুঁজছে, তার চোখে সেই তৃষ্ণা, সেই ক্লান্তি, অভুক্ত সে, স্নেহ প্রীতি ভালবাসার কাঙ্গাল। তাছাড়া তার ভিতরে বেয়াড়া অশান্ত যৌবনের নড়াচড়া আরম্ভ হয়েছে, এইজন্য সে আরও বেশি বিমূঢ় বিভ্রান্ত। তাই মাছির মতন ঘুরে ঘুরে দিদির কাছে ছুটে আসা।" (পৃ. ৪৭-৪৮)

লক্ষণীয়, রামানন্দ সেন 'পদাবলী' গোষ্ঠীর কবিদের সংস্রব ত্যাগ করে স্কুল-শিক্ষকের ভূমিকা ত্যাগ করে এমনকি কবিতা লেখা ছেড়ে অক্ষয়-মাধুরীর সংসারে নিছক সাধারণ মানুষের মতো অজ্ঞাতবাসের দিন যাপন করলেও আদতে কাব্যভাবনা ত্যাগ করতে পারেননি। কবিত্ব তাঁর সৌন্দর্যদর্শনে। ফুল দিয়ে দিদিকে সাজিয়ে শফীর 'বনমোরগী' উপমা ব্যবহারে তিনি বিস্ময়ে হোঁচট খেলেও মনের বিভ্রম ভেবে পাশ কাটাতে চেয়েছেন। তাঁর অসীম সৌন্দর্যতৃষ্ণা যেন মুক্তি পেতে চায় বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে—"হুঁ, তৃষ্ণা, অবাধ নীল আকাশ, অবারিত মাঠের পিপাসা কিশোরকে এখানে নিয়ে এসেছে। এই পিপাসা নিয়ে সে দিদিকে ফুল দিয়ে সাজায়, দিদির দিকে চেয়ে থাকে। রাজহাঁসটার চোখে রামানন্দ ঠিক এই তৃষ্ণা দেখেছে। মাধুরী জলে নামলে সাদা ডানা ছড়িয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে ওটা ছুটে আসে, লম্বা গলা উঁচু করে মাধুরীকে দেখে। এই তৃষ্ণা নিয়ে দুপুরের গাঢ় রৌদ্র থেকে পালিয়ে শালিক বুলবুলিরা এখানে ঝোপের ভিতর বসে কিচমিচ করে—এই তৃষ্ণা নিয়ে মাধুরী জলের গভীরে ডুব দিয়ে আশ্চর্য কিছু দেখতে পায়, জলে পা ডুবিয়ে গলা খুলে গান করে। স্বভাব ওদের। এই নিয়ে রামানন্দর দুর্ভাবনা? তবে তো চাঁদনী রাতে খালের জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি দেখেও রামানন্দ মন খারাপ করতে পারত। এদের জগতে এরা ঠিকই আছে। আরোপ করা কবিত্বের ধার এরা ধারে না, মাধুরী না, শফী না, শালিক, বুলবুলি, রাজহাঁস বা নিজে থেকে ফুটে ওঠা গুচ্ছের মাদার ফুল—কেউ না। মোহনবাবুর চায়ের দোকানে বসে মেকি কাব্যের কারবার শুধু শুভেন্দুদের। অ্যাকোরিয়ামের নিবদ্ধ ফ্যাকাশে ক'টি মাছ। বদ্ধ জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাব্যের ভুরভুরি কেটে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। হুঁ, শহরের আধুনিক সব শিল্পী।" (পৃ. ১০৯)

কিন্তু রামানন্দর সৌন্দর্যসাধনা ধাক্কা খায় সত্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে। যেখানে সত্য এবং সৌন্দর্যের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যা কিছু সুন্দর তা-ই সত্য না অসুন্দরকেও সত্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আবার মানুষের সৌন্দর্যচেতনাও আপেক্ষিক। সে ক্ষেত্রে সত্য এবং সুন্দরকে চিহ্নিত করবার অভিজ্ঞান কী? যদি সত্যের অভিঘাতে সৌন্দর্য সাধনা ব্যাহত হয় তা হলে মানুষের আশ্রয় কোথায়?—এমন নানাবিধ প্রশ্নে আলোড়িত হয় পাঠকসমাজ। শিল্পী রামানন্দ আক্রান্ত হন এক ধ্বস্ত বিপন্নতায়।

রামানন্দ জানতে পারেন, শফী নিজেই এক শিল্পী। মেলায় যে পুতুলগুলি শফী বিক্রি করতে যায় তার অধিকাংশই যে তার নিজের হাতে তৈরি—শফীর পিসতুতো ভাই

মনতাজের মুখে এই তথ্য জেনে রামানন্দ ভীষণরকম চমকে ওঠেন। তাঁর মনে হয়—
"...হুঁ, একদিন সে ঠিকই দেখেছিল, তার দেখার মধ্যে ভুল ছিল না।

...তার ভীরু চোখের ভিতর ফাল্গুনের-আকাশভরা ঝকঝকে রোদ, মাঠভরা ধুলো, মাদার মনসার ঝোপ ও শালিক বুলবুলির নাচানাচি দেখে রামানন্দ এক একদিন শিউরে উঠত। না, তার দেখার মধ্যে ভুল ছিল না। আজ রামানন্দ পবিষ্কার বুঝতে পারছে। কিন্তু গোলমাল করে দিল ইয়াকুবের ছেলের মাথার প্রকাণ্ড ডিমের ঝাঁকাটা। ওটাই রামানন্দকে বেশি ঠকিয়েছে।

...হুঁ, উজবুক শয়তান বজ্জাত। ইয়াকুবের সব ক'টা কথাই সত্য। জগতের চোখে শফীউল্লা আহাম্মক, বেওকুফ ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু নিজের দিক থেকে ছোঁড়া সাপের চেয়েও দুষ্ট খল। একটি শিল্পী তাই হয়। কপট স্বার্থপর শয়তান। সময় মতন লাঠির ঘা না বসালে সর্প তোমাকে দংশন করবেই। মাধুরীকে জানিয়ে দিতে হয়, বেচারা আজও কিছু জানে না।" (পৃ. ২৬১)

রামানন্দর কাছে প্রতারণার দুঃখ অপেক্ষা যেন বড় হয়ে ওঠে মাধুরীকে শিল্পের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করতে না পারার ব্যর্থতা। তদুপরি বন্ধু অক্ষয়ের প্রতি নিবিড় মমতায় তার সুখী গৃহকোণ রক্ষা করার তাগিদ। মূলত শিল্পীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে অক্ষয়ের স্ত্রী মাধুরীকে রক্ষা করার কর্তব্যসচেতনতায় ব্যক্তি রামানন্দ প্রায় ছুটতে থাকেন শেয়ালদার রাস্তা ধরে।

প্রশ্ন জাগে, যিনি নিজে একজন শিল্পী, শিল্প যাঁর রক্তে, মাধুরীর সহজ সান্নিধ্য যিনি উপভোগ করেন, কবিতা না লিখলেও আপন মনে যিনি একান্ত সংগোপনে ছবি আঁকেন মাধুরীর, শফীর সংস্পর্শ তাঁর কাছে ক্ষতিকর মনে হয় কেন? সে কি পুরুষের গোপন দ্বেষ? অসূয়া? না অন্য কিছু!

উত্তর অনুসন্ধানে দেখা যায় :

ক. শিল্পীর ভূমিকা যদিও দ্বিতীয় বিধাতার, তা সত্ত্বেও রামানন্দ মনে করেন শিল্পের সত্য আপেক্ষিক। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবাদটি হল—'Truth is stranger than fiction.'

খ. শিল্পীর সত্তায় ঈশ্বর এবং শয়তানের সমান্তরাল বাস। সাধারণ ব্যক্তিমানুষেও হয়তো এই দ্বৈত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কিন্তু শিল্পী ভয়ংকর তার সচেতন প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং কুশল গোপনীয়তায়।

গ. প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে শিল্পীও মুক্ত নন। শিল্পের ক্ষেত্রে সংযম রক্ষা জরুরি মনে করলেও ব্যক্তিজীবনে যাবতীয় বাঁধন ভাঙাতেই তার অদম্য উল্লাস।

ঘ. স্থান-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে শিল্পীর গতায়াত। পার্থিব জীবনে কোনো সম্পর্ক রক্ষাই তার কাছে জরুরি নয়। লৌকিক দৃষ্টিতে কারো পিতা-পুত্র-স্বামীর ভূমিকা পালন করলেও রক্তের সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষ ব্যক্তি নির্বিশেষে সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত

হওয়া আবার নিমেষে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা শিল্পীজীবনের এক অতি স্বাভাবিক ক্রিয়া।

এতগুলি নেতিবাচক দিক অতিক্রম করার জন্য নিছক প্রতিভাই যথেষ্ট নয়। চাই প্রতিভার পুনর্নবীকরণ। অর্থাৎ প্রাত্যহিকের প্রেম-অপ্রেম, আশা-নিরাশা, ক্রোধ-রিরংসা, সংঘাত-সংবেদনশীলতা—অনুভূতির প্রতি স্তরে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত—জগৎ ও জীবনের প্রতিটি রহস্য অনুভব, অনুভবজাত রক্তপাত, বিচ্ছিন্নতাবোধ আবার শিকড়ের টানে ঘরে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষাজনিত যে সালোকসংশ্লেষ—তা-ই শিল্পী এবং শিল্প, প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বকে ঋদ্ধ করে।

বলা বাহুল্য, আঠারো বছরের শফী সাধনার সবকটি স্তর অতিক্রম করেনি। তার চোখে প্রথম সূর্যোদয়ের প্রাক্ মুহূর্তপর্বের 'লাল রঙের ছিটা'। দিনের শুরুতে কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিলগ্নে তার জেগে ওঠা। কিন্তু এ জাগরণ ব্যক্তিসাধারণের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কারণ শফী শিল্পী। সে পুতুল গড়ে, ছবি আঁকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে নারীর স্নেহ-মায়া-মমতা প্রাপ্তির মতোই নারীর আসঙ্গলিপ্সা তার কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। অথচ নারী সম্বন্ধে তার চেতনা অনেকটাই বোধ এবং বোধশূন্যতার মায়াজালে আচ্ছন্ন। অনাবিষ্কৃতের প্রতি তীব্র নিষিদ্ধ কৌতূহল তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে যে কোনো পাপকর্ম সম্পাদনে। যেখানে নিছক কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়াও ঘটে যেতে পারে সুন্দবের শব-ব্যবচ্ছেদ। কারণ সে শিল্পী। চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম হাত পাকানো শল্যবিদের মতোই শফীর কাছে মাধুরী তখন মেদ-মাংস-মজ্জা সহযোগে সুগঠিত এক লাস্যময়ী নারী শরীর।

বস্তুতপক্ষে 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসের শেষ কটি পর্বে সুন্দরের শব-ব্যবচ্ছেদ এমন বারবার ঘটেছে যা রামানন্দর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও বোধ এবং বিবেকের মর্ম্মমূলে কুঠারাঘাত হানে। এবং কীট্‌স কথিত Beauty is truth, truth is beauty–র নিহিতার্থ প্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে রামানন্দ সেনের সৌন্দর্যদর্শন কতখানি আপেক্ষিক, সে কথা প্রকাশও জরুরি হয়ে পড়ে।

তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষটির দৃষ্টির আচ্ছন্নতা ধরা পড়ে মাধুরী-উপাখ্যান পর্বে। এই পর্বে কিশোর মনতাজ-এর সঙ্গে ক্রীড়ারত যে মাধুরীকে আমরা দেখি সে যেন গ্রহান্তরের। গোধূলির আশ্চর্য বিকেলে কাটা মুরগির রক্ত নিয়ে মাধুরী এবং মনতাজ-এর ভয়ংকর খেলার মুহূর্তে রসভঙ্গের মতো উপস্থিত হন রামানন্দ। মোহভঙ্গ হয় তাঁর—"সত্যি তো, এ কী খেলা খেলছে ওরা, মাধুরীর বাঁহাতে কাটা মুরগীটা ঝুলছে, রক্তমাখা ডান হাতটা সে ফস করে কিনা মনতাজের গালে থুতনিতে বুলিয়ে দিল, মনতাজও কিছু চুপ করে থাকল না, ছুরির গায়ে লেগে থাকা মুরগীর খানিকটা তাজা গরম রক্ত হাতের তেলোয় নিয়ে তক্ষুনি মাধুরীর মুখে ভুরুতে কপালে আচ্ছা করে লেপে দিল। দিয়ে হাসতে লাগল। খোঁপা নাচিয়ে কোমর দুলিয়ে মাধুরীও হাসছিল। রক্তমাখা হয়ে সুন্দর দুটো মুখ গোধূলীর সোনালী হলদে আলোয় যে রূপ ধরল দেখে রামানন্দর ভয় করতে লাগল।" (পৃ. ২৭৫)

অর্থাৎ যে রামানন্দ একদিন হেলেঞ্চার জঙ্গল থেকে টেনে আনা মাধুরীকে সুন্দর

খাদ্যবস্তু ও শফীকে কোনো এক 'জলচর জীব' মনে করেছিলেন, প্রকৃতির পরিহাসে সেই মাধুরীই যেন খাদকের ভূমিকায় রূপান্তরিত। সবুজ নীল ডোরাকাটা হাফপ্যান্ট মাত্র পরিহিত ফর্সা তরোয়ালের মতন ঝকমকে উদোম শরীরের শিকার মনতাজ এখন 'আদিম রমণী' মাধুরীর খাদ্যবস্তু—'সিংহশিশু' বিশেষ।—"...ধ্বক-ধ্বক-জ্বলে, দানবী মানবী/সিংহ-শিশু নাচাবার মতন/চপল নধর কিশোর নিয়ে খেলা করে--।" (পৃ. ২৮৮)

সুন্দরের শব-ব্যবচ্ছেদ-এর দ্বিতীয় দৃশ্য—শফীর শিল্পীসত্তা বিষয়ে মাধুরীকে সতর্ক করার অবকাশ রামানন্দর হয় না। বলা ভালো, প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অক্ষয়ের অপারেশনের খবর ও অক্ষয়ের ইচ্ছানুসারে তাকে নার্সিংহোমে দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব রামানন্দ মাধুরীকে দেন। মাধুরী নিরুত্তাপ, উদ্বেগহীন। অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা করতে সে হাসপাতালে উপস্থিত হয় না। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশে মৃত্যুপথযাত্রী অক্ষয়ের সঙ্গে শেষ দেখা করানোর উদ্দেশ্যে রামানন্দ তড়িঘড়ি লবণহ্রদের বাড়িতে উপস্থিত হলে যা আবিষ্কার করেন তা-ও অভিনব—"সুতোগাছাও নেই মাধুরীর অঙ্গে। একেবারে বিবসনা। উঁহু; করালবদনা কালী নয়। তা হলে পিঠময় চুল ছড়িয়ে দিত, লাল টুকটুকে জিভ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরত। বা নওলকিশোর অ্যাডনিসের সামনে একগলা কামনা-বাসনা নিয়ে গনগনে কয়লার মতন লাল উত্তপ্ত হয়ে দেবী ভিনাসের জ্বলন্ত থাকার সেই ভয়ংকর মূর্তিও এ নয়—এমন কিছু দেখলেও যেন রামানন্দ শান্তি পেত, নিজেকে সান্ত্বনা দিত। এ যে মোহিনী মডেল হয়ে অক্ষয়-গিন্নী দাঁড়িয়ে আছে গো। ...সামনে এত বড় ইজেল দাঁড় করিয়ে রাজাবাজারের শেয়ালটা ঘাড় গুঁজে পাগলের মতন উলঙ্গ মাধুরীকে এঁকে চলেছে।" (পৃ. ৩০১)

শিল্পের নামে ভণ্ডামি বা শিল্পচাতুর্য এবং শিল্পসত্যের আপেক্ষিকতা—যে সব প্রশ্নে রামানন্দ 'মাধুরী' নামক শিল্পনারীকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন—তা ছিল মূলত শিল্পের ক্ষয়রোগ থেকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত সঠিক কি না অর্থাৎ রামানন্দর শিল্প-ভাবনাও আপেক্ষিকতার জালে আবদ্ধ কি না—তার থেকেও এখানে যে প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে, তা হল শিল্পী ও শিল্পের সংকট।

শিল্পনারী মাধুরী যখন মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীর কথা ভুলে মোহিনী মডেল-এর ভূমিকা নেয়—শিল্পের সংকট দেখা দেয় তখনই। আবার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শফী যাকে আঁকে, আদতে সে এক রক্তমাংসের সুললিত নারী মাত্র। কিশোর মনতাজ-এর সঙ্গে ভয়ংকর ক্রীড়ারত মাধুরী, হাসপাতালে শয্যাশায়ী স্বামীর অপারেশনের পূর্বমুহূর্তে নির্বিকার, নিষ্ঠুর, প্রেমহীন মাধুরী আবার প্রথম পর্বের বিষাদমধুর মমতাময়ী মাধুরী—এতগুলো মাধুরীকে একসঙ্গে রং-তুলির টানে এঁকে ফেলা শফীর পক্ষে সম্ভব নয়। শিল্পের সংকট এখানেও। যদি সম্ভব হয় তা হলেও রামানন্দ যেন তা চাননি। কেননা, তিনি শিল্পীর সব জটিলতা ত্যাগ করে এসেছেন। সমস্ত রকম ভঙ্গুর নাগরিক আভিজাত্য বর্জন করে দূরে নির্জনে সাধারণ মানুষের মতো জীবনের প্রতিটি সুখ-দুঃখ হাসি-খেলায় অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এক স্বপ্ননীড় হারিয়ে যাবার বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন রামানন্দ। তাঁর শিল্পীসত্তা—(যা তিনি কখনই বিসর্জন দিতে পারেননি) মুহ্যমান হয়ে পড়ে

সত্যের বিচিত্র অভিঘাতে।

—"অনেক কিছু হারিয়ে, অনেক কিছু ছেড়েছুড়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে একটা মূল্যবান পুঁজি বুকে নিয়ে প্রকাণ্ড আকাশের নিচে বিস্তৃত বালুর মাঠের এক প্রান্তে মাদার ঝোপে ঘেরা ছোট্ট এই টালির বাড়িটায় বড় প্রসন্ন মনে দিন কাটাচ্ছিল সে। ইয়াকুবের ছেলে দু'হাতে তার পুঁজিটুকু কেড়ে নিল।" (পৃ. ৩০১)—এখানেই শিল্পীর সংকট। কারণ ব্যাহত হয়েছে শিল্পীর সৌন্দর্যসাধনা।

রামানন্দ সেনের জাগ্রত মনুষ্যত্বের উপর একে একে ঠোকা হয়ে যায় আরো কয়েকটি পেরেক। সে ক্ষেত্রে সুন্দরের শব-ব্যবচ্ছেদ পর্বের তৃতীয় দৃশ্য নিঃসন্দেহে স্ত্রী পুরবীকে বেশ্যারূপে দর্শন। চতুর্থ, সফল ব্যবসায়ী কৌতুকপ্রবণ অক্ষয়ের নিঃসঙ্গ মৃত্যু। পঞ্চম, চিত্রকর জগত মণ্ডলের আত্মহত্যা।

বলা বাহুল্য, সত্যের অভিঘাতে সুন্দরের এমন ধারাবাহিক বিপর্যয় একসঙ্গে ক্রমিক পর্যায়ে ঘটতে দেখলে মনে হতে পারে, আরোপিত। অর্থাৎ নিছক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে লেখকের কল্পিত ঘটনার সমাবেশ। কিন্তু আগাগোড়া উপন্যাস পাঠে সে প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে না। বরং অন্তিম পর্বে এসে বুদ্‌বুদের মতো যেন মিলিয়ে যায়।

তবু যে প্রশ্ন সমগ্র উপন্যাসে অস্বস্তির মতো লেগে থাকে তা নারী সম্পর্কিত বিশ্লেষণে। জ্যোতিরিন্দ্রের অধিকাংশ রচনার মতো 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসেও নারী যেন প্রবৃত্তি তাড়িত এক আদিম রমণী। শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি—মনুষ্যজনোচিত এহেন গুণাবলির কোনোরকম প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা যায় না। তাই শিক্ষিত পূরবীর নিছক প্রবৃত্তির তাগিদে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ চৈতন্যের বিলুপ্তি ঘটায়। এমনকি গুণমুগ্ধ পাঠিকা রেখা চক্রবর্তী—যার বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল কথায় রামানন্দ মুগ্ধ হন—উৎসাহিত হন ভালোবাসার ঠিকানা সন্ধানে, তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে কিঞ্চিৎ বারনারী হিসেবে। যদিও সাধারণ নয়। অর্থাৎ কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার জন্য তার যাবতীয় তৎপরতা। উপন্যাসে রামানন্দ সেনের ব-কলমে লেখক তাবৎ নারী সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন— "...প্রত্যেকেই কিন্তু একটা করে সাতহাত লম্বা জিভের অধিকারিণী।" (পৃ. ৪১) তা হলে কি ধরে নিতে হবে কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নিজেও মুক্তদৃষ্টির অধিকারী নন!

এ ক্ষেত্রে 'হয়তো' নামক অব্যয়টি দিয়ে বোধহয় আলোচনার ইতি টানতে হয়। কারণ জ্যোতিরিন্দ্র অন্য একাধিক রচনায় বিকৃতকাম পুরুষ চরিত্র দেখিয়েছেন—চরিত্রের দিক থেকে যারা অধিকাংশই দুর্বল, পঙ্গু, অসহায়।

আদতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষমাত্রেই প্রবৃত্তির দাস—এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা বোধ হয় তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। সে জন্য তাঁর সৃষ্ট বেশির ভাগ চরিত্র মরবিড (morbid-morose) স্বতন্ত্র কেবল 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাস। কাজেই এ-ও বলা যায়, মানুষমাত্রেই প্রবৃত্তির দাস—এই যদি সত্য হয়, তা হলে সে সত্যও নিঃসন্দেহে আপেক্ষিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে—মন্বন্তর, অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় তথা ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের পটভূমিতে মানবচরিত্রে আমূল পরিবর্তনের ফলে যে 'মরবিডিটি'-র ছোঁয়া

লেগেছিল বা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যা (morbidity) আজও অব্যাহত— তা গল্পের বিষয় হতে পারে কিন্তু লেখকের চেতনার সামগ্রিকতা আক্রান্ত হলে পাঠককে আহত হতে হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় মনে হয়, সাহিত্যের সত্য এবং বাস্তব সত্য-র মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অবশ্যম্ভাবী। 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাস তার ব্যতিক্রম নয়।

রামানন্দ সেনের মতো মানুষ আমাদের দৈনন্দিন পরিচিত জগতের পরিধি বহির্ভূত। লৌকিক দৃষ্টিতে এঁরা চিরকাল অচেনা থেকে গিয়েছেন। প্রবল যুক্তিবাদী মানুষের কাছে এঁরা অপরিচিত। সেকারণ যিনি বন্ধুকে (অক্ষয় সমাদ্দার) মৃত্যুশয্যায় রেখে এক মেয়েমানুষের প্রতি বিবমিষায় (মাধুরী) অন্য এক মেয়েমানুষ সন্নিধানে তৎপর হন, মদ্যপানে বেঘোর শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে গোলদীঘির বেঞ্চের উপর বেহুঁশ রাত কাটান—তাঁকে চিনতে আমাদের কষ্ট হয়। তারপর সকালে হাসপাতালে বন্ধুর মৃতদেহের পাশে বিমূঢ় রামানন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ওয়ার্ডবয় এবং নার্স-এর মতো আমাদের অর্থাৎ আমজনতারও উপহাসের পাত্র হয়ে যান রামানন্দ সেন।

আক্ষরিক অর্থেই তখন তিনি বাউণ্ডুলে, দায়িত্বজ্ঞানহীন, মাতাল, শিথিল চরিত্রের এক রামানন্দ সেন। এই রামানন্দ সেনের কোনো আইডেনটিটি নেই। না শিল্পী, না মানুষ—সবরকম পরিচয় তিনি নিজ হাতে মুছে ফেলেছেন। বলা যায় মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটেছে।

কাজেই বন্ধুর সৎকারের উদ্দেশ্যে রামানন্দ তাঁর একদা গুণমুগ্ধ মোহনবাবুর কাছে হাত পাতলে মোহনবাবু লোক দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেন। মোহনবাবুর ধিক্কারে তিনি তাঁর কবি-পরিচয় পুনর্বায় উদ্ধারে তৎপর হন। একটি কলম পথচারীর কাছে ভিক্ষা করে ফেরেন। অথচ তখন তাঁর প্রয়োজন একটি আশ্বাসের হাত। নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এক শ্মশানবন্ধুর হাত— যে হাত মৃত আত্মাকেও ছুঁয়ে থাকে একান্ত প্রিয়জনের মতো।

কবি রামানন্দ মৃত। কারণ তিনি নিজেই সে অস্তিত্ব মুছে ফেলেছেন। তাই ব্যক্তি রামানন্দর কোনো মূল্য নেই মোহনবাবুর কাছে। কিন্তু রেখা চক্রবর্তী—কবি-শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করা এবং ঘনিষ্ঠ হওয়া যার প্রিয় অভ্যাস, পাড়া-প্রতিবেশীর চোখে যার পরিচয় বেশ্যা, বাড়ির লোকজন যাকে উচ্ছন্নে গেছে বলে আশা ছেড়ে দিয়েছেন—কবির ভক্ত পাঠিকা সেই রেখা চক্রবর্তী কিন্তু শিল্পের সংকট রোধ করতে ব্যক্তি রামানন্দকে, তাঁর শিল্পীসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি মনে করে। বাড়িয়ে দেয় শ্মশানবন্ধুর হাত। শেষ পর্যন্ত রেখার অভিনব উক্তি এক সার্বিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়—"...আপনার বন্ধুকে শ্মশানে পুড়িয়ে এসে আমরা আর এই নিয়ে ভাবব না, ভাবা উচিত হবে না, আমরা জীবন দেখব, প্রাণের গান শুনব, বিশেষ করে নন্দ ও আপনার জন্য আমার এ কথা বলা! আমার ভয়—মৃত্যুর কথা বেশি ভাবতে গেলে আপনাদের সৃষ্টির কাজ না পিছিয়ে যায়, রামানন্দবাবু!" (পৃ. ৩২৩)

উপন্যাসে সত্য এবং সুন্দরের সংঘাত যেমন অনিবার্য স্থান করে নিয়েছে, তেমনই সংঘাত শেষে ঘটেছে সুন্দরের জয়—যা সত্যও বটে। অর্থাৎ ভালোবাসা। জীবনের প্রতি প্রেমই মানুষের একমাত্র আশ্রয়। সমস্ত রকম নেতিবাদী পথ পরিক্রমা শেষে ছিন্নমূল

রামানন্দ সেনের ঘরে ফেরার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাই তাঁকে পৌঁছে দেয় এক তন্নিষ্ঠ শিল্পীর আদর্শলোকে।

শিল্পীর মুখে শোনা যায় কবিতার কটি অনবদ্য লাইন—"তাই আমি চেয়েছিলাম—/ভালবাসার সব রং পাখি হয়ে ফেরে,/সূর্য হয়ে সোনা করে দেয়/জীবন এমন—।"

বারো ঘর এক উঠোন

উপন্যাস জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সামগ্রিক কর্মধারায় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমকালীন অবক্ষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি এখানে ধরা পড়েছে লেখকের স্বভাবসুলভ নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে। একই বিষয় নিয়ে তিনি আরো অনেক কাহিনী রচনা করেছেন। স্বভাবধর্মে সেগুলি শিথিল। হয়তো বা বৈচিত্র্যহীন। একই কথার পুনরাবৃত্তিজনিত কারণে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু একই উপাদান সম্বল করে, একই পটভূমিতে সৃষ্ট 'বারো ঘর এক উঠোন' যে আগাগোড়া পাঠকের কৌতূহল ধরে রাখে ধনুকের টানটান ছিলার মতো, তার কারণ সম্ভবত একটাই। বিষয় এবং বয়ননৈপুণ্যের সার্থক সাযুজ্যসাধন ঘটেছে এই উপন্যাসে। একটি যুগচিত্র ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুনতে পাওয়া যায় কাহিনীতে। অনুরূপ কারণেই লেখকের অন্য একাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহৎ রচনার মধ্যে 'বারো ঘর এক উঠোন' সর্বাধিক প্রচলিত উপন্যাস।

নামকরণেই লেখক ধরিয়ে দেন কাহিনীর মূলসূত্রটি। তারপর তাঁর জাদুলেখনীর চাবি ঘুরিয়ে কখন প্রবেশ কাহিনীর অন্দরমহলে, কখনই বা প্রস্থান—সে কথা বুঝে ওঠার আগেই ইতি টানা হয়ে যায় কাহিনীতে। মানবহৃদয়ের রুদ্ধ কুঠুরি দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের দুর্বোধ্য পাঠ নিতে নিতে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে চরিত্রগুলো, কাহিনী শেষ হয়। কিন্তু রেশ মোছে না।

উপন্যাসের শুরুতেই এক দঙ্গল বাচ্চার কোরাসকণ্ঠে লেখক জানিয়েছেন, 'যার নেই পুঁজিপাটা, সে যায় বেলেঘাটা"। (পৃ. ১৭) অর্থাৎ নগর কলকাতার অদূরে নোংরা, দুর্গন্ধময়, ঘিঞ্জি, মুমূর্ষু এলাকা ও বিত্তহীন মানুষের মুক্তাঞ্চল বেলেঘাটা এ কাহিনীর পটভূমি। বেলেঘাটার অগুনতি বস্তির অন্যতম ৮ নং-এর বারো ঘর ভাড়াটে এবং ধোয়া-মাজা-স্নান-পায়খানা-কলহের জন্য নির্ধারিত একটি মাত্র উঠোনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে চরিত্র ও ঘটনাবলি।

বারোটি ঘরের চরিত্রেরা আকৃতিগত দিক থেকে ভিন্ন হলেও স্বভাব ধর্মে এক। এরা আড়ি পেতে অন্য ঘরের শব্দ শোনে। আড়াল থেকে নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখে। উঠোন কাঁপিয়ে ঝগড়া করে। নিজের সংসারের সচ্ছলতার কথা অপেক্ষাকৃত অভাবীদের সাতকাহন করে শোনায়। আবার সব ভুলে কখনও মেতে ওঠে আদিরসাত্মক হাসি মস্করায়। জলের অভাব, জায়গার অভাব, চলাফেরার অসুবিধে সর্বোপরি পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সমবেদনার অভাবই নিয়ন্ত্রিত করেছে চরিত্রগুলিকে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রদ্বয় শিবনাথ এবং রুচিও এর ব্যতিক্রম নয়। যুদ্ধের

বাজারে রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাওয়া 'দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্ক-এর ম্যানেজার শিবনাথ এবং 'কমলাক্ষী বালিকা বিদ্যালয়'-এর শিক্ষিকা সুন্দরী রুচি অন্তত কাহিনীর প্রথমদিকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও ঘটনার অভিঘাত ও কাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত বিবর্তনে শেষপর্যন্ত একই পথের পথিক। একইরকম নির্বিকার, নিস্পৃহ। সমাজ সংসারের যাবতীয় ভ্রষ্টাচার বৈষম্য ও বিবেকহীনতার প্রতি চোখ বুজে থাকার অভ্যাস ভয়ানক নির্লিপ্তির সঙ্গে আয়ত্ত করে নেয় তারা।

বস্তুত মুক্তরামবাবু স্ট্রিটের পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটবাড়ি ছেড়ে বেলেঘাটায় আঠারো টাকার বারোয়ারি ঘরে মাথা গোঁজার দিন থেকেই এক যুদ্ধান্তিক ধ্বস্ত জীবনের অবক্ষয়ের শিকার হয়ে গিয়েছিল রুচি ও শিবনাথ। কিন্তু উল্লেখের বিষয়, বস্তির বিচিত্র পরিবেশে রুচি যতখানি আড়ষ্ট অনুভব করে, শিবনাথ যেন ততটা নয়। শিবনাথ প্রথম থেকেই সাবলীল। বারো ঘরের বারো শরিক মুদি দোকানি বনমালী, ক্ষৌরকার পাঁচু, হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শেখর, চা দোকানি রমেশ, বিধু মাষ্টার, মাতাল লম্পট কে গুপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদির সঙ্গে প্রথম মিশ্রণে সামান্য ভয় এবং লজ্জা কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত অদ্ভুত রাসায়নিক ক্রিয়ায় কিংবা জীবনযাপনের ধারাবাহিকতার চাপে শিবনাথ দ্রবীভূত হয়ে যায় চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে। একই সঙ্গে বাড়িওয়ালা ধনীপুত্র পারিজাতের নির্বাচনী দালাল বনাম 'বারো ঘর এক উঠোন'-এর ক্ষয়িষ্ণু চরিত্রগুলির জীবাণুবাহক মনুষ্যেতর প্রাণীতে পরিণত হয় শিবনাথ।

'গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্ক' ফেল করার পর শিবনাথের বেকার জীবন যাপন, ঘর-সংসারের থালা-বাসন সহ এক একটি মূল্যবান আসবাব বিক্রি করে সংসার চালানো, পাড়া-প্রতিবেশী পাওনাদারদের কাছে অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস বা ব্যবসা করার মিথ্যা বয়ান—এ সবই শিবনাথের বেলেঘাটার নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুতি পর্ব ছিল বলা যায়।

বাড়িওয়ালার দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়ার পরই শিবনাথের মধ্যবিত্ত জীবনে সংকট শুরু। ''তারপর দুপুরে এক সময় শিবনাথ সেলাই-কলটা চিরকালের মত ঘরের বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গেল। একটা একটা করে এভাবে সব গেছে, যাচ্ছে। তাদের বিয়ের খাট, বড় ড্রেসিং টেবিল, রেডিও...। জিনিসপত্র বাঁধা দিতে বিক্রি করতে অবশ্য শিবনাথের জুড়ি নেই কেউ। এক একটা যাচ্ছে আর রুচির বুকের একখানা করে পাঁজর ভাঙছে। তাই যা-হোক একটা দাম ধরে মেশিনটা যদি কারো কাছে শিবনাথ বিক্রি করে দিয়ে এসে বলে, 'মোহিতবাবুর কাছে রেখে এলাম। সুযোগমত ওর টাকা দিয়ে আমাদের জিনিস ফিরিয়ে আনব বলে এসেছি,' রুচি জানে ওটা কোনোদিন আর ঘরে ফিরে আসবে না। আজ পর্যন্ত কিছু এল না।'' (পৃ. ১১)

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে শিবনাথের মানসিক বিবর্তনের আরো একটা দিক লক্ষণীয়। মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেলেঘাটা যাওয়ার খবরে জনৈক প্রতিবেশীনীর আতঙ্ক প্রকাশ ও ঘুরে ফিরে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা শুনে শিবনাথের উক্তি—''কম লেখাপড়া করে যুদ্ধের সময় বড় চাকরি বাগিয়ে ফেলেছিল, তাই আজ অত ফুটোনি।

আর, ওসব প্রেস, কাঠের দোকান কিস্‌সু না, সবটাই ব্ল্যাক-মার্কেটিং। ব্ল্যাক-মার্কেট না করলে রোজ এত মাংস খাওয়া আর নিত্যনতুন শাড়ি গয়না পরা বেরিয়ে যেত। সুখের পায়রা সব। চাকা ঘুরবে দেখবে। শিগ্‌গির এদের সুখের নীড় ভাঙছে, থাকছে না কিছু।''
'কে থাকবে?' রুচি প্রশ্ন না ক'রে পারল না। 'থাকব তুমি আমি, থাকবে ভালোবাসা। থাকবে যারা খুব বড়লোক, কয়েক কোটি টাকার মালিক, আর থাকবে যারা একেবারে নিঃস্ব, কিছুই নেই যাদের, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা হচ্ছে, মাঝামাঝিদের ঠাঁই নেই, এরা সেই দলের।'...'' (পৃ. ১৬)

বলা বাহুল্য, তেতাল্লিশ পর্বে সমাপ্ত উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় এসে শিবনাথের বক্তব্য, শিবনাথের 'ভালোবাসা' কিন্তু লেজকাটা ঘুড়ির মতো মুখ থুবড়ে পড়েছে। পারস্পরিক ভালোবাসা নয়, আপোসমূলক সহাবস্থান, এই সত্যের কাছে নতি স্বীকার করে সে বারো ঘর এক উঠোন-এর আরো একাধিক চরিত্রের মতোই।

কিন্তু 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ নয়। নায়ক একটি জরাজীর্ণ অবক্ষয়িত পটভূমিতে করুণ আর্তনাদে আবর্তিত মধ্যবিত্ত বা বিত্তহীন শ্রেণীসমাজ। শিবনাথ তার প্রতিনিধি কিংবা কাহিনীর সূত্রধার মাত্র। সামান্য গুটিকয় কালির আঁচড়ে লেখক যে পটভূমির ছবি আঁকেন তাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কারা, কোন্ ভাগ্যহীন থাকে সেখানে। ''তারপব একটা গেঞ্জী কলের খটখট শব্দ, একটা করাতকলের ঘস্‌ঘস্ আওয়াজ অন্ধকার আর অফুরন্ত ঝিঁঝি'র ডাক শুনে এক থমথমে চীনা কারখানার পাশ কাটিয়ে ঘেঁটু ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আরও খানিকটা হাঁটা-পথ। রিক্সা যায় কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু রিক্সা কি মোটর গাড়ি চলতে পারে, এমন পথ এখন আর খোঁজাখুঁজি না করে মুটের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে তারা অগ্রসর হ'ল। ...আবার অন্ধকার। বনবাদাড় ঘেঁসে সরু অসমান রাস্তা। একটা বাঁশের সাঁকো পার হ'তে হ'ল। ঝিঁঝি'র ডাক উত্তরোত্তর বাড়ল। জঙ্গল থেকে মশার ঝাঁক উড়ে এসে হাঁটা অবস্থায়ও চোখে-মুখে-পায়ে কামড় বসিয়ে দিতে লাগল। শিবনাথ বলল, 'আমাদের যখন মশারি আছে ভাবনা নেই।'...সরু অসমান রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা মুদিদোকান। একটা কেরোসিনের ডিবি জ্বলছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় মুদি ডাল-তেল-নুনের সঙ্গে বিস্কুট, বাতাসা, মুড়ি, কাগজ, পেন্সিল, সাবান, বার্লির টিন, দুধ, মাখনের কৌটো, চুলের ফিতা, তালপাতার পাখা, পান, সুপারী, চুন, এমন কি ছেলেদের ধারাপাত আর সহজ অঙ্কন অবধি দু'কপি করে রেখেছে। 'এই দোকানটা থাকাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে, শিবনাথ বলল।'' (পৃ. ২০-২১)

প্রথম থেকেই শিবনাথ যে সবরকম অভাব অভিযোগ অসুবিধার সঙ্গে আপোস করতে তৈরি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মশার বিরুদ্ধে মশারি, মুদিদোকান বনাম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের প্রশস্তি বন্দনা প্রসঙ্গে। লেখক জানিয়েছেন, 'এ বাড়িতে কোনো ঘরে পর্দা নেই।' কয়েকটি মাত্র শব্দ সমন্বয়ে এই বাক্যের প্রতীকী অভিঘাত আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করে কাহিনীর বিষয়বস্তুকে। বাস্তবিক পর্দাবিহীন এই বারো ঘরের শরিকদের মুহুর্মুহু কথা কাটাকাটি, বিদ্রূপ-বৈষম্য, দারিদ্রের লাঞ্ছনা, সর্বোপরি অবরুদ্ধ বাসনার প্রকাশ

কোনোরকম আড়াল ছাড়াই দেখা হয়ে যায় পাঠকের। প্রতিবেশীর 'হাঁড়ির খবর' নেওয়ার মতোই বড় সাবলীল এই ঘটনা। বড় কদর্য, রুচিহীন, নিষ্ঠুর বাস্তব।

এই নগ্ন বাস্তবেরই শিকার উপন্যাসের চরিত্রগুলি। শিবনাথ-রুচি তাই বারো ঘরের উঠোনে পা রাখা মাত্রই তাদের আপাদমস্তক দেখে ফেলে বস্তি-জাতকেরা! নবদম্পতিকে সম্বোধন করার মতো বিশেষণও তৈরি করে ফেলে তারা।—"হুঁ, হিরণ সায় দেয়। 'দেখে মনে হয় তিনি ঘুঁটে দেওয়া স্বামীদের দলের।' অর্থাৎ এই বাড়িতে এগারোটি পরিবারের সঙ্গে আর একটি পরিবার এসে বাসা বাঁধলো। এদের কারো স্ত্রীর চাকরীতে সংসার চলে! টেলিফোনে, স্কুলে, হাসপাতালে, ডেয়ারী ফার্মে। বেকার স্বামীরা, সংখ্যায় খুব বেশি নয় যদিও, দু'তিনটি, দুপুর বেলা ঘরে থেকে ছেলেমেয়ে দেখে, ঘরদরজা পরিষ্কার রাখে, ফাঁক পেলে কল থেকে ঘড়া ভরে জল নিয়ে আসে। স্ত্রীকে খেটেখুটে এসে যা'তে না এসব কাজে হাত দিতে হয়। এ-বাড়িতে যারা থাকে তাদের চাকর রাখবার ক্ষমতা থাকে না। আগের এক ভাড়াটের স্বামী নাকি দুপুর বেলায় বসে ঘুঁটে দিত অবশ্য বাড়ির ভিতরেব উঠোনে না, একটা পাঁচিলের গায়ে। তারপর থেকে এখানকার বেকার স্বামীদের 'ঘুঁটে দেওয়া বর' নাম পড়েছে।" (পৃ. ২৬)

পর্দাবিহীন ঘরের মানুষগুলি লজ্জা-ঘৃণা-সংকোচ-দুঃখ-সুখ-আহ্লাদের যাবতীয় ভাব-বিভাবগুলি ঢেকে রাখা তাই বাহুল্য মনে করে। স্রষ্টার লেখনীর মতোই সমস্তরকম ভাব বিলাসের বিরুদ্ধে তারা খাওয়া শোওয়া রান্না বাড়াব প্রতিটি কাজ একে অপরকে জানিয়েই করে। বৈচিত্র্যহীন জীবনে এই নির্লজ্জ মুখরতা এবং অন্যের গুহ্যকথা জানার অদম্য কৌতূহলই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার চাবিকাঠি। নশ্বর সংসারে নিজের অস্তিত্বের স্পন্দনটুকু বুঝে নেওয়ার জন্য দেহ-মনের যাবতীয় সূক্ষ্ম আবরণ ছিঁড়ে ফেলে সত্তার বৈভবহীন প্রকাশই তাদের বেঁচে থাকার উৎস। ঢাকনাহীন খোলা নর্দমার সমান এই উৎসমুখে মানুষের বসবাস মাছির মতো। তাই মাছিদের ইতিবৃত্তে কোনো রকমফের হয়তো নেই। তবু বেলেঘাটা বস্তিবাড়ির বারো শরিকের অন্যতম কে.গুপ্ত, তস্য কন্যা বেবি, প্রীতি-বীথি, কমলারা পৃথক পৃথক স্বভাবধর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একদা মার্চেন্ট ফার্মের অফিসার ইংরেজি-তে এম এ কে.গুপ্ত চাকরি খুইয়ে বেলেঘাটায় ঠেলাওয়ালা ফেরিওয়ালাদের সঙ্গে বাসা বেঁধেও অতীত গৌরবের কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করে না। আবার মুদিদোকানির কাছে বিড়িটা দেশলাইটা শিবনাথের কাছে দু আনি পয়সা কিংবা এককাপ চা ধারে খেতেও সমান অকুণ্ঠ এই ব্যক্তি। ক্ষণে ক্ষণে ইংরেজি কবিতা উপন্যাস থেকে লাইন কোট করে কে.গুপ্ত। লরেটোয় পড়া মেয়েকে আধ পয়সার চা ধারে আনার জন্য পাঠায় বস্তির মুদিদোকানির দরজায়। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ মেয়ে চা মুড়ি বিস্কুটের জন্য চা দোকানে কাজ নিলেও নীরব থাকে কে.গুপ্ত। মেয়ের আনা পয়সার অপেক্ষায় বসে থাকে। এ সবই দৈনন্দিনের প্রাতঃকৃত্যের মতো স্বাভাবিক মনে হয় বস্তিবাসী কে.গুপ্তের চোখে। তাই শিবনাথ প্রথম পরিচয়ে তার পূর্ব ঠিকানা বা ইতিবৃত্ত জানাতে সঙ্কোচ বোধ করলে বিরক্তি প্রকাশ করে কে.গুপ্ত। "কি বলো, বনমালী! এখানে এসে যদি পরিচয় মানে পূর্বের নামধাম চাকরি বলতে লজ্জা

করে তো পরে বাকি কাজগুলোর লজ্জা ঢাকতে অনেক কাঁথা-কম্বল জড়াবার দরকার পড়বে যে, হে-হে ভুল বলেছি? ... 'তা চাকরি গেলে ক'টি বাঙালীর ছেলে খাড়া থাকে,— কই আমার তো চোখে পড়ে না, আমি দেখিনি।...'" (পৃ. ৩১)

মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট থেকে বেলেঘাটায় এসে শিবনাথ পোশাকে-ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও কে.গুপ্ত এবং বনমালী বুঝিয়ে দিতে কসুর করে না যে আদতে সকলেই সমান তারা। চাকরি খুইয়ে নিয়তি-ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণই তাদের ধর্ম। কে.গুপ্তর চারিত্রিক শিথিলতা কম-বেশি উপন্যাসের সবকটি চরিত্রেই লক্ষণীয়। নতুন কোনো রুজি বা রোজগারের চেষ্টায় না গিয়ে অবিরত পূর্বস্মৃতি রোমন্থন, সন্তান-সন্ততি-পরিবারের চাহিদার প্রতি চোখ বুজে থাকা, ক্রমাগত মদ্যপান, শেষে সেলুন কাম ম্যাসাজ ক্লিনিকে হিসাব রক্ষকের কাজে ঢুকেও অস্বাভাবিক আচরণ—এ সবই কে.গুপ্তর কর্মবিমুখ শিথিলতা বা আলস্যের ফসল।

শেষ পর্যন্ত বাড়িওয়ালা পারিজাতের গাড়ির ধাক্কায় কে. গুপ্তর ছেলে গুরুতর আহত রুণুর হাসপাতালে অকাল মৃত্যু, চোদ্দ বছরের মেয়ে বেবিকে কেন্দ্র করে ভাই ক্ষিতীশের হাতে রমেশের খুন ও বেবির জেলযাপন এবং স্ত্রী সুপ্রভার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা— এ সবই নির্বিকার আত্মবিস্মরণের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় কে. গুপ্তর কাছে। একইরকম অনুত্তেজিত অকুণ্ঠিত কে. গুপ্তকে দেখা যায় কাহিনীর শেষ অধ্যায়েও রুচি এবং গুণমুগ্ধ চারু রায়ের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য আড়ি পেতে দেখার কাহিনীর সরস বর্ণনা দিতে। শিবনাথকে এই খবর দেওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে কিম্ভূতকিমাকার মানুষটি। বিশ্বসংসার ও পরিবারের কোনো ঘটনাই আলোড়িত করে না তাকে।

আদতে ঢেউহীন নিঃস্তরঙ্গ গতিহীন শিথিলতাই এই উপন্যাসের চরিত্রধর্ম। অনুরূপ কারণেই বস্তিতে একটা খুন কিংবা আত্মহত্যার থেকে বেশি গুরুত্ব পায় প্রাক্ নির্বাচনপর্বে পারিজাতের ভাবমূর্তি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য পাড়ার সমাজকল্যাণের নামে কিংবা অজুহাতে সমিতি গঠন ও উৎসব অনুষ্ঠানের মুখর কলরব।

পারিজাতের সুন্দরী স্ত্রী দীপ্তির বৈভবে স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে যে রুচি সমিতির সভাপতি হতে প্রাথমিকভাবে অস্বীকার করে, শিবনাথকে দীপ্তি প্রসঙ্গে বারবার খোঁচা দেয়, দীপ্তির পারিজাতকে ছেড়ে চলে যাওয়ার খবরে সেই রুচিই কিন্তু আহ্লাদিত হয়ে অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে এগিয়ে যায়। একদল তরুণ-তরুণী, বাড়িওয়ালা পারিজাত, চলচ্চিত্র প্রযোজক চারু রায় এবং বস্তিবাসীর কাছে নিজের শিক্ষাভিমান সংস্কৃতিচেতনা সৌন্দর্য ও আভিজাত্য প্রকাশের সুযোগ তাকে যতটা আপ্লুত করে ততটা বস্তির অন্য কোনো সমস্যা নয়। এমনকি পারিজাতের নির্বাচনী লড়াই এবং অন্যান্য কাজ করে দেওয়ার সুযোগে স্বামী শিবনাথ কতটা কি সুযোগ-সুবিধা অর্থ আদায় করে নিতে পারল, সে সম্পর্কেও অত্যুৎসাহ লক্ষ করা যায় তার মধ্যে। স্বভাবচাপা রুচি ক্রমে প্রগলভ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত শিবনাথের বিবর্তন লক্ষণীয়। বেকার শিবনাথ নিরলস অবসরযাপনকে সঙ্গী করে বস্তিজীবনের তথ্যচিত্র দেখে। দুপুরে ধর্মতলায় ইংরেজি সিনেমা দেখে আবার

রাতে অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ন'নম্বর ঘরের ভাড়াটের মেয়ে 'আঠারো বসন্ত ঘেরা যুবতী'র অসতর্ক উন্মোচিত শরীর দেখে। এ ব্যাপারে তার যুক্তি হল—"...এবং তার নিজের দিক থেকেও এভাবে চুরি করে বীথিকে দেখাটা অপরাধ বলেই গণ্য করতে পারল না। বরং যেন শিবনাথের মনে একটা তুলনামূলক সমালোচনা এল। যেমন জীবনের তীব্র ট্র্যাজেডি ভুলতে বড়লোক মোহিত বেশ্যাসক্ত হয়েছে বা জীবনের চরম ব্যর্থতা ভুলতে কে. গুপ্ত মদের আশ্রয় নিয়েছে, তেমনি শিবনাথও যেন একটা অস্বস্তিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলতে কতক্ষণের জন্য মনটাকে অন্যদিকে ব্যাপৃত রাখতে চাইল। ...রাত্রির এই গাঢ় প্রহরে স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে মন হাল্কা করার ভাগ্য শিবনাথের নেই। কেননা, রুচিকে ঘুমোতে না দিলে কাল সারাদিন স্কুলে ওর শরীর মেজাজ ভাল থাকবে না। তার ঘুমের দরকার। বস্তুত আয়তনে ছোট হলেও শিবনাথের একটা দুঃখ তো বটেই। এবং বড় দুঃখ ভুলতে বড় বড় নেশার যেমন দরকার, তেমনি ছোট দুঃখ, একটু আধটু ব্যথা ভুলতে হাত বাড়ালেই অনেক ছোটখাটো নেশার দ্রব্য পাওয়া যায় জীবনে, এই অভিজ্ঞতা নতুন না হলেও শিবনাথ আর একবার তার স্বাদ অনুভব করে রোমাঞ্চিত হয়।" (পৃ. ২২০-২১)

কলকাতায় এক বাড়িতে বাচ্চা দেখাশোনার জন্য সামান্য আয়ার কাজ পেয়ে বীথি বেলেঘাটার বস্তি ছেড়ে শহরের সচ্ছল পাড়ায় ঘর ভাড়া নিলে এই শিবনাথই তাকে 'রক্ষিতা' বলে উল্লেখ করে—"...একগাল হেসে শিবনাথ বোঝায় : 'মানে পাব্লিক হয়ে আপনি বলতে পারবেন না বীথিকে, প্রাইভেট হয়ে রইলেন আর কি। সাদা কথায় যাকে কেপ্ট বলে, মানে ভদ্দরলোকের রক্ষিতার মত থাকবেন আর কি, কি বলেন।" (পৃ. ৩৬২)

শেখর ডাক্তার পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ চাইলে এই শিবনাথই ঘরোয়া ব্যাপার বলে এড়িয়ে যায়। আবার কে. গুপ্তর স্ত্রী সুপ্রভার কড়িকাঠে ঝুলন্ত দেহ দেখে সুপ্রভার লেখা সুইসাইড নোট সন্তর্পণে গায়েব করে জমা দিতে যায় পরিজাতের কাছে। অতিরিক্ত মুনাফার আশায়। প্রতিবেশীর ছেলে সাক্ষী হবলার মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে। নোটের কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করে। আবার রুচি ও চারু রায়ের চুম্বনদৃশ্যের কথা কে. গুপ্তর কাছে শুনে আপাত উত্তেজিত হয়ে গুপ্তকে মারধর করলেও একটি প্রশ্নও করে না স্ত্রীকে। বরং চারু রায় তার জন্য আস্ত এক টিন সিগারেট রেখে গেছে শুনে অতি উচ্ছ্বাসে তা গ্রহণ করে। উপন্যাসে শিবনাথের উপস্থিতি শেষ পর্যন্ত নতুন তাৎপর্যে ধরা দেয়।—"হাসল না এবার আর, জোরে মাথা নেড়ে যেন হাজার চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিবনাথ বলল, 'পাগল, কিচ্ছু না, কি আবার ভাবব আমি, আমার অত শত ভাবলে চলে? এসো, ঘরে এসো।' ব'লে সহজ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রীর হাতে হাত রেখে উঠোন পার হয়ে সে বারান্দায় উঠে গেল।" (পৃ. ৩৮৭)

ডাঁটি ভাঙা কাপ, কলাই চটা ডিশ, হাতল ভাঙা মগ ফাটল ধরা আয়নাটিও ফেলা যায় না মধ্যবিত্তের সংসারে। সবই অত্যাবশ্যকীয়। বিশেষত দুর্মূল্যের বাজারে। অথচ ফাটা আয়নায় ধরা পড়েনা অবয়বের সহজ প্রতিফলন। জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার পটভূমিকে

নিয়ন্ত্রিত করেছিল এই ভাঙা আয়নার মতোই এক ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। শিবনাথ হেন চরিত্ররা সেই প্রেক্ষাপটের প্রতিফলন। তাই তার প্রতিবিম্বে নানা ভাঙচুর। জীবনযাপনে অজস্র ফুটো, হাজারটা জোড়াতালি।

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের মূল তত্ত্বটি ছিল অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম—struggle for existence. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর চরিত্ররা সে অর্থে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ কোনো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নয়। সংগ্রামের বিপরীতে অবসাদ এবং অবক্ষয়ে ডুবে যাওয়াই তাদের নিয়তি। আদতে 'হ্যাভ' এবং 'হ্যাভ নটস'—এই দুই দ্বিধাবিভক্ত সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে 'হ্যাভ নটস'দেরই অবলম্বন করেছেন লেখক। যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের চালচিত্রে নির্জীব সরীসৃপের মতো এই 'হ্যাভ নট্‌স'দের লড়াই ছিল অন্য মাত্রাব। বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। চার এবং পাঁচের দশকের বিপন্ন-অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে বিবেক মনুষ্যত্ব এবং মানবতার লেজ খসিয়ে বুকে হেঁটে পথ চলতে শিখেছিল তারা। শুরু হয়েছিল নয়া বিবর্তনবাদ। এই বিবর্তন সমর্থনযোগ্য কি না সেটা বড় কথা নয়। সময় এবং পরিস্থিতির ঘূর্ণিপাকে অন্ধকারের যাত্রী কিংবা নরক যাত্রীদের কঠিন বাস্তব জীবন্ত দলিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই উপন্যাস।

প্রেমের চেয়ে বড়

উপন্যাস পাঠে ধ্বনিত হয় উপনিষদের একটি বাণী—'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জানার জন্য নিরলস অভিযাত্রা। রক্তের মূল্যে, প্রেমের মূল্যে কিংবা জীবনের মূল্যে। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র পরিমল সেই যাত্রাপথের সূত্রধার, যার প্রতিটি পদধ্বনিতে অনুরণিত হয় সংকটদীর্ণ বিপন্নতার দ্বৈরথ অভিব্যক্তি।

খুনের আসামি জেলফেরত পরিমল সমাজ-সংসারের প্রতিটি সদস্যের (বিশেষত বাবা ডাক্তার জগমোহন ও ইঞ্জিনিয়ার ভাই পরিতোষ) অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অসন্তোষের কাঁটাপথ মাড়িয়ে প্রেম ও প্রেমহীনতার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে বিশ্বপ্রকৃতি ও নারীসৌন্দর্যের প্রতি অণুকণায় সম্পৃক্ত হতে হতে শিশুর মতো, প্রেমিকের মতো, কবি-শিল্পীর মতো বিপন্ন বিস্ময়ে পৌঁছে যায় চেতনার অমৃতলোকে।

প্রথম যৌবনে সহপাঠিনী বিশাখার প্রেমে প্রতারিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী মলয়কে খুন করেছিল পরিমল। মধ্যযৌবনে পৌঁছে কারাজীবন-মুক্ত পরিমল কিন্তু মলয়েরই বোন আর এক নারী সতেরো বছরের কিশোরী বুলার প্রেমে ঋদ্ধ হতে চায়। বুলা প্রত্যাখ্যান করে তাকে। অথচ বুলা ও তার প্রণয়ী কিশোর অমূল্যকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় হাতের কাছে পেয়েও অস্ত্রের দিকে হাত বাড়ায় না মানুষটি। অপলক বিস্ময়ে আবিষ্কার করে মিলনদৃশ্যের অপার্থিব প্রেমসৌন্দর্য। এই আবিষ্কারের মধ্যে যন্ত্রণা আছে, নারীর প্রেম না পাওয়ার হাহাকার আছে। কিন্তু ক্রোধ বা হিংসারূপী শয়তান নেই। এই পরিমলের চোখে সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। সুন্দরকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। তাই অন্যের বুকে ছোরা বসাবার আগে নিজেকেই সে ক্ষতবিক্ষত করে একাধিকবার। কারণ সৌন্দর্যসাধনাই তার কাছে একমাত্র জীবনসত্য। সেই সত্যজাত বিশ্বাস তাকে জানায়. ''আকাশের জ্বলন্ত তারায় তারায় সেই প্রেম বেঁচে থাকবে, বসন্ত বাতাসের সঙ্গে মিশে থেকে তা সুগন্ধ ছড়াবে, নদীর

ঢেউ হয়ে নাচতে নাচতে সমুদ্রের দিকে ছুটবে—আর বেঁচে থাকবে আমার মগজে—আমার স্মৃতিতে, কোটিবার ছোরা মেরেও আমি তাকে হত্যা করতে পারব না।" (পৃ. ৪৯৯)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পর্যায়গত বিশ্লেষণে বিলম্বিত লয়ে, ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে খুনি পরিমল যখন ৫০৪ পৃষ্ঠার উপন্যাস শেষে দার্শনিক সত্যে উপনীত হয়, তখন চরিত্রটির বিশ্বাসযোগ্যতা কোনো প্রশ্নই জাগায় না পাঠকের মনে। বরং ক্রমিক অবক্ষয়, দ্বিধা ও যন্ত্রণার টানাপোড়েনে বিক্ষুব্ধ পরিমল যখন ভাঁটার টানে স্তিমিত, গভীর, প্রশান্ত রূপ ধারণ করে—তখন তার আনন্দাশ্রু অভিষিক্ত করে পাঠকচিত্তকেও।

চরিত্রধর্মে আধুনিকতম উপন্যাসটিতে অন্য অনেক গূঢ় গভীর দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে লেখক আমাদের এ তথ্যও জানিয়েছেন, সব প্রেম ঈশ্বরসাধনায় মুক্তি পায় না। ব্যক্তি-জীবনের ঐকান্তিক প্রেমও সাধনার বিষয়। পরিমলের ছোট ভাই সন্ন্যাসী সুকোমলের জবানিতে বলা হয়েছে "...কেবল যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের পথেই জীবনের সাধনা করতে হবে এ কথা সত্য নয়। বড়দা তা করেননি। জীবনরসিক কবির মতন পরিমল রূপ, রস ও আনন্দকেই পেতে চেয়েছেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ...হ্যাঁ, নারীর প্রেম। এই প্রেমই যে অমৃত—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—এই অমৃত লাভের জন্যই তাঁব জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা— ...।" (পৃ. ৪৩২) এই বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনাই উপন্যাসের তত্ত্বকে পৌঁছে দেয় যুক্তিনিষ্ঠ প্রাসঙ্গিকতায়।

বাস্তবিক কারাবাসের সময় জেলখানাতেই পরিমলের অন্তর্চেতনায় পরিবর্তনের আভাস লক্ষ করা গিয়েছিল। প্রকৃতির সাহচর্যে, আত্মবিশ্লেষণের আয়নায় জন্ম নিতে শুরু করেছিল অন্য এক পরিমল। এই পরিমলেব যন্ত্রণা আছে কিন্তু যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য অন্যকে আঘাত করা বা অনিষ্ট করার প্রবণতা নেই। জেলজীবনের বিচিত্র, বিবিধ সঙ্গীদের সাহচর্য, নিঃসঙ্গতা সর্বোপরি তার নিজস্ব বোধ, প্রেম-অপ্রেম-হিংসা-ন্যায় সম্পর্কে তার ভাবনা তখন অন্য খাতে প্রবাহিত।

কিন্তু জেলফেরত পরিমল লৌকিক চোখে তখনও খুনের আসামি। অন্তত আভিজাত্যের গৌরবে বিড়ম্বিত ডাক্তার জগমোহন (পরিমলের বাবা), পরিতোষ (পরিমলের ভাই) ভুলতে পারেন না সে কথা। তাঁদের আচরণে দ্বিধা স্পষ্ট। তাই দশ বছর কারাদণ্ডের পর ঘরে ফেরা বড় ছেলেকে সংবর্ধনার আতিশয্যে বার্নিশ করা নতুন খাট, আলমারি, শেক্‌স্‌পিয়র, রবীন্দ্রনাথে সমৃদ্ধ বইয়ের র‍্যাক, নতুন ফুলদানিতে বাগানের টাটকা গোলাপের গন্ধ বৈভবকেও ছাপিয়ে ওঠে তাদের সন্দেহ-অবিশ্বাস-সঙ্কীর্ণতা। জগমোহন ছোটছেলে সন্ন্যাসী সুকোমলের কাছে ব্রজবল্লভপুরের আশ্রমে পরিমলকে পাঠানো মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে একমত পরিমলের ইঞ্জিনিয়ার ভাই পরিতোষও। অথচ পরিমলের নিয়তি বা প্রকৃতি অন্য। তার চিত্তশুদ্ধির জন্য দ্বিতীয় বিধাতা কাহিনী-স্রষ্টা স্বয়ং একটি বৈজ্ঞানিক পথ প্রস্তুত রেখেছিলেন আগেই। সে পথের কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট ছিল না। অনুতাপ, অনন্বয় আর ভুল হিসেবের কারচুপিতে টালমাটাল

সীমাহীন নিরালম্ব প্রলম্বিত সেই পথ।

জেল থেকে ফিরে পূর্ব প্রণয়িনী বিশাখার খোঁজ করে না পরিমল। বরং অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে কলেজ সহপাঠী মৃত মলয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের দ্রারিদ্রক্লিষ্ট সংসারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মলয়ের বাবা মা ভাই বোন প্রথম দিকে সহজে মেনে না নিলেও অভাব-অসহায়তায় সর্বোপরি পরিমলের অকুণ্ঠ আন্তরিকতার কাছে দুর্বল হয়ে পড়েন। হাত পেতে নেন একদা ছেলের খুনি অধুনা সন্তানসম পরিমলের সাহায্য। আর পরিমল কখনও ভ্রাতৃবধূ রমলার কাছে ধার করে, কখনও ঘরের আসবাব সরিয়ে বিক্রি করে। কখনও স্নানঘরে রমলার ফেলে আসা আংটি তুলে নিয়ে সাহায্য করতে থাকে দুঃস্থ পরিবারটিকে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রেমিক পরিমল মলয়ের বোন সতেরো বছরের বুলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বুলাকে পাবার ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সমাজ সংসারের সকলের চোখে লম্পট প্রতিপন্ন হয় মানুষটি। সকলের অবজ্ঞা, অবিশ্বাসকে উপেক্ষা করে পরিমলের আপনমনে ঘুরে বেড়ানো, কলঘরে সশব্দে স্নান, আদ্দির পাঞ্জাবি পরে গায়ে এসেন্স মেখে ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, সর্বোপরি বুলাকে ও নিলয়কে নিয়ে বেড়াতে যাবার নাম করে আর ফিরে না আসা সন্দেহ ঘনীভূত করে আরো।

অন্তর্গত চরিত্রে কিন্তু পরিমল একটি গাছেরই মতো। নৈর্ব্যক্তিক, উদাসীন, বাঙ্ময়।—
"জগমোহনের চোখে ভয়·সন্দেহ, অবিশ্বাসের অন্ধকার, পরিতোষের চোখে ক্লান্তি হতাশা উদ্বেগ অশান্তি।...কিন্তু আর একটি চোখ? সেই চোখে আশা আনন্দ উৎসাহ, শুভ ইচ্ছা ও স্থির বিশ্বাস ছাড়া আর তো কিছু দেখল না সে। ভোরেব আকাশের মত উজ্জ্বল সুন্দর সুকোমলের চোখ। তাই তো আশা করেছিল পরিমল। তার আকাশে আলো থাকবে, মেঘও থাকবে। জগমোহন পরিতোষ থাকবে, আবার সুকোমলও তার জন্য অপেক্ষা করবে।

বীজটাকে সে চিনতে পারছিল না, অঙ্কুরোদ্গমের পর সে চিনতে পারল, বুঝল, সত্য ও সুন্দরের প্রতীক এই গাছ। যেভাবেই হোক কিছু সত্য, কিছু সৌন্দর্য তার মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তাই থেকে এ-গাছের জন্ম।" (পৃ. ১৫৫)

শিকড়ের টানে গাছও মাটি খোঁজে। আলো চায়, জল চায়। নিত্যদিন শাখা-প্রশাখা ডালপালা নিয়ে বিকশিত হওয়াতেই তার আনন্দ, সাধনার সিদ্ধি। পরিমলও সেই সহজ প্রাণের ফুর্তি নিয়ে বুলাকে পেতে চায়। বয়সের ব্যবধান ভুলে জগৎ সংসারের কুটিল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একটি নারী প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু কিশোরী বুলা পরিমলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করে তারই মতো অমূল্যকে। তারই সমবয়সী পথসঙ্গীটিকে গ্রহণ করে প্রেমের আধারস্বরূপ।

ব্যাহত হয় পরিমলের প্রেম সাধনা। সৌন্দর্য সাধনা। সাধনার ব্যক্তিক পর্যায়ে তখনো বিভ্রান্ত অশান্ত পরিমল,—'পরিমল বিমূঢ় হয়ে গেল। তার বুকের ভিতর চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। কোথায় সিদ্ধি! বড় যে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল স্বর্গের আলো তার মুখে

এসে পড়েছে। আনন্দে নাচতে নাচতে লম্বা পা বাড়িয়ে হৃদয়পুরের দিকে এগিয়ে এসেছিল। এসে কী দেখছে এখন। ব্যবধান যোজনবিস্তৃত। আরও বেশি। একটুও অগ্রসর হতে পারেনি সে। কথার সুর কথা বলার ভঙ্গি! তবু বিষ্ণুপুরের মাঠে অসহায়তা ছিল কান্না ছিল কাতর মিনতি ছিল এবং ভয়। সুন্দর একটা ভয়। শ্বাপদের জ্বলন্ত চোখ দেখে হরিণী এমন ভয় পেয়েছে। এখন শুধু কাঠিন্য বিরক্তি ভ্রূকুঞ্চন, আর স্তূপ স্তূপ ঔদাসীন্য। হাতের আঙুলগুলি মটকাতে লাগল পরিমল।'' (পৃ. ৪৭৬)

পরিমলের বয়সোচিত দূরত্ব বুলা অতিক্রম করতে পারেনি। মানুষটির বলিষ্ঠ শরীর, অতুলনীয় সৌন্দর্য, শিশুসুলভ আত্মভোলা অভিব্যক্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু নিজের প্রেমের প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়েছিল অমূল্যর মধ্যে।

মাধবপুর থেকে হৃদয়পুর যাওয়ার পথে অমূল্যকে আবিষ্কার করে আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে বুলা। কেবল পরিমল না, তার প্রণয়প্রার্থী প্রদোষকেও অমূল্যর কাছে ম্লান মনে হয়—''দিনের বেলা, সকালের হালকা আলোয় অমূল্যকে দেখা মাত্র তার বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠল। দেখেই সে বুঝতে পারল, তার বয়সের একটি ছেলে। সতেরো। কম নয়—বেশি তো নয়ই। যেন আয়নায় নিজেকে দেখছিল বুলা। তার পুরুষ সংস্করণ। ...এমন পুরুষ কি সে দেখেছে, তাব উল্টো ছায়া, আর সেই ছায়া তার এত সামনে এত কাছে। ..কাল রাত্রে অমূল্যর গলার স্বর শুনে সে চমকে উঠল। তার মনে হল এতদিন পর তার লুকোনো গলার স্বরটা, অর্থাৎ হুবহু যেমনটি হলে তার ভাল লাগত, মনের মতন হত, ঐ ছেলেটির গলা থেকে বেরোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করল ছেলেটির সঙ্গে।'' (পৃ. ৪৩৭-৩৮) আদতে আত্মরতি। নার্সিসাস প্রেমে মগ্ন বুলা ভালোবেসেছে তার নিজের ছায়াকেই। উজ্জ্বল রোদের মতো অমূল্যর পরিষ্কার ঝকঝকে চোখের আয়নায় আপনার প্রতিবিম্ব দেখেছিল বুলা।

হৃদয়পুরের পথে পরিমলদের যাত্রাপথের গাইড অমূল্য চরিত্রটি যেন কাহিনীতে প্রতীকের চেহারা নিয়েছে। শৈশবে পিতৃহীন, বৃদ্ধা মায়ের একমাত্র অবলম্বন কিশোরটি কাজকর্ম ফেলে তাদের সঙ্গি হয় রাস্তা চিনিয়ে দেবার জন্য, সেইসঙ্গে ভ্রমণ তারো নেশা। কিন্তু নিছক রাস্তা নয়, একটি ঝড়ের রূপকে সে যেন চিহ্নিত করে দেয় মানবজীবনের সর্বজনীন একাকীত্ববোধকে। প্রথম ছোট্ট একটি হাইফেনের মতো সে পথ চলে পরিমল ও বুলার অন্তর্দ্বন্দ্বেব ছায়া কাটিয়ে। তাকে পেয়ে স্বস্তি পায় পরিমল ও বুলা দু'জনেই। ভ্রমণের সহজ স্বাভাবিক আনন্দের সুরটি ফিরে আসে। তারপর ঝড়ের রাতে একটি চালাঘরে খড়ের বিছানায় ঘুমন্ত পরিমলের অজান্তে হাইফেনটি মিশে যায় বুলার শরীরে। যেখান থেকে আলাদা করে বিশ্লিষ্ট করা যায় না কাউকেই। অমূল্যর অনুপস্থিতিতে একা পরিমলের সঙ্গে থাকতে ভয় পেয়েছিল বুলা। বিরক্তও হয়েছিল। এটা ছিল পরিমলের হার। প্রেমের কাছে প্রেমাস্পদের কাছে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার হার। কাঁটার মতো খচখচ করছিল তার হাড়-পাঁজরের প্রতিটি শিরা। কিন্তু ভোররাতে প্রেমিক যুগলের মিলনদৃশ্যের অপার্থিব সৌন্দর্য ধুইয়ে দিল তার ক্ষতমুখ। তখনো হৃদয়ে যন্ত্রণার পাথর। তবু সৌন্দর্যকে আবিষ্কারের নির্মল আনন্দ তাকে আবিষ্ট করে শিল্পীসুলভ মরমীর

বিদগ্ধতায়—"চাঁদ ঢলে পড়েছিল। দরজার কাছে—দরজার ঠিক মুখে একটা জ্যোৎস্না এসে হ্রদের জলের মতন টলটল করছিল। এই জন্যই ছবিটা এত উজ্জ্বল পরিষ্কার হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। কোন আবরণ ছিল না তাদের গায়ে। ঘুমন্ত নিঃশঙ্ক দুটি মানুষ। মুখের সঙ্গে মুখ ঠেকানো, শরীরে শরীর জড়ানো। না, যেন তারও কিছু বেশি। অঙ্গের অভ্যন্তরে অঙ্গ প্রবেশ করতে চেয়েছিল। এখন স্তিমিত ক্লান্ত নীরব। তা হলেও মাধুর্যের শেষ ছিল না, দীপ্তির অল্পতা ছিল না। আশ্চর্য দুটি ফুল। যেন মহাকালের বেদীর নিচে অনন্তকাল ধরে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছিল না পরিমলের।" (পৃ. ৪৮৮-৮৯)

বস্তুত, রাতে শুতে যাবার আগে অমূল্যের একটি প্রশ্ন, প্রশ্নের মীমাংসা যেন এখানে এভাবেই স্থির হয়ে গেল। অর্থাৎ হৃদয়পুরের পর পশ্চিমের সমুদ্র কিংবা পূর্বদিকের ব্রজবল্লভপুর আশ্রম---কোন্‌দিকে তারা যাবে, অমূল্যর এই প্রশ্নে পরিমল এবং বুলা কেউই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তখন অমূল্য জানিয়েছিল,—"আমার মনে হয়, ঘুমিয়ে উঠলে সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে। অমূল্যর মুখে আবাব সেই আশ্চর্য অপার্থিব হাসি ফুটে উঠেছিল। যেন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সমাধানটা তখনই সে দেখতে পাচ্ছিল। বলছিল, 'পিছুটান না থাকলে দুটোই দেখতে সুন্দর, সন্ন্যাসীর আশ্রম অথবা দিক্‌চিহ্নহীন ধু-ধু সমুদ্র—চলুন এখন শুয়ে পড়া যাক।" (পৃ. ৪৮৭)

অবশেষে অমূল্যর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় পরিমল। উপলব্ধি করে জীবনের ইঙ্গিত। প্রগাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন, তৃপ্ত, সুন্দরের প্রতীক প্রণয়ীযুগলকে ছেড়ে শয়তান ও ঈশ্বরের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে, সব চাওয়া-পাওয়া ভুলে যাত্রা করে পুবে, আশ্রমের পথে। পথিক হৃদয়ে তখন প্রেমের শীর্ষ। তখন কোথায় শুরু কোথায় বা শেষ! দিক্‌চিহ্নহীন অনন্ত পথের যাত্রী পরিমল হেঁটে যায় অমৃতের সন্ধানে।

কাহিনীর সূত্র ধরে উপন্যাসে যে সব পার্শ্বচরিত্রের আনাগোনা, তাদের আরো একাধিকবার অন্যান্য উপন্যাসে আমরা দেখেছি। পরিমলের বাবা জগমোহন, মেজভাই পরিতোষ ছাড়াও পরিমলের ভক্তবন্ধু গিরিজা, প্রেমিকা বিশাখা, অক্ষয় উকিল, রাণা ইত্যাদি টাইপ চরিত্রের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। ব্যতিক্রমী কেবল পরিমলের ভ্রাতৃবধূ রমলা ও নবীন সন্ন্যাসী ছোটভাই সুকোমল।

প্রাথমিকপর্বে পরিমলের প্রতি রমলার আচরণ ছিল ভয় ও কুণ্ঠা মিশ্রিত। কিন্তু পরে পরে সে চিনেছিল মানুষটির যন্ত্রণা ও আনন্দের অন্তর্মুখীন রূপটিকে। তাই বুলার প্রতি মগ্ন প্রেমের কারণে এবং বুলাদের অভাবের সংসারে সাহায্যের জন্য বেকার পরিমল যখন তার আংটি চুরি করে, সংসারের কাউকে জানায় না রমলা। এমনকি স্বামী, শ্বশুর পরিমলের ঘর থেকে যাবতীয় মূল্যবান আসবাব ও টাকা পয়সা সরিয়ে নিলে গলার নেকলেশ খুলে দিয়ে ভাশুরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এই রমণীরত্ন। সংসারের সব ঝড়, সব অশান্তিকে উপেক্ষা করে রমলা আদতে এক শিল্পীকে এক প্রেমিকের সাধনাকে ঋদ্ধ করতে চায়। কারণ সে দেখেছে—"তার চোখের সামনে এখন একটা আলো জ্বলছে।...চোখে হেমন্ত অপরাহ্নের লালাভ রৌদ্রের স্বপ্ন, রক্তে একঝাঁক পাখির

কিচিরমিচির, নিশ্বাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতার মর্মর—তার অন্তরে যদি গোলাপ কলির মতন সুন্দর পবিত্র একটি কুমারী গান গেয়ে না উঠবে তো সে পরিপূর্ণ হবে কেমন করে।" (পৃ. ৩৪৪)

এহেন রমলার বাস আমাদের পরিচিত পরিবারের বাইরে। জ্যোতিরিন্দ্র-সৃষ্ট সবকটি স্ত্রী চরিত্রকে ম্লান করে দেয় এই নারী। প্রেমভাবনায়, সংবেদনশীলতায় এবং মননে।

সন্ন্যাসী সুকোমল ঠাকুর্দা আনন্দমোহনের মতন সংসার থেকে ছুটি নিয়ে কৈশোরেই পাড়ি দিয়েছিল ব্রজবল্লভপুরে স্বামী ঈশ্বরানন্দের আশ্রমে। হয়তো দাদার জেলে যাওয়া, মায়ের মৃত্যু ও নশ্বর সংসারের অনিশ্চয়তাই কারণ। কিন্তু মূলত স্বভাব বৈরাগী সুকোমল। তাই সংসার ত্যাগ এবং আশ্রমযাত্রা। সেই আশ্রম—যেখানে কেবল নামসংকীর্তন আর পূজাপাঠ নয়, স্কুলপ্রতিষ্ঠা, আর্তের সেবা এবং নানাবিধ সমাজসেবার কাজ হয়ে থাকে।

আশ্রমবাসী হলেও সুকোমলের বিশ্বাস একটি শিশুর কাছে থাকলেই ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকা যায়। পরিতোষ-রমলার শিশুপুত্র, তাই খেলতে খেলতে মুখে থুতু ছিটিয়ে দিলেও পরম আনন্দে উপভোগ করে সুকোমল। এই সুকোমল কিন্তু দশ বছরের দণ্ডিত আসামি জেলফেরত দাদাকে প্রথম দর্শনে উপদেশ দিতে যায় না। মুখ ফিরিয়ে নেয় না। বরং বেদনার্ত হয়। পরিমলের চোখ দেখে তার মনে হয়, "স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে শিল্পী কাঁদছে।' (পৃ. ৭৮)

বিষয়ী, সন্দেহপ্রবণ জগমোহন যখন খুনিছেলের চিত্তশুদ্ধির জন্য তাকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন, তখন পরিমলের উক্তি—"...আমি মানুষটার চোখের ভেতর একটা আলো দেখতে পেয়েছি। মানুষের হৃদয় যখন সুন্দর হয় মহৎ হয় তখন তার দৃষ্টির মধ্যে একটা আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে ওঠে। বড়দার দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করেছে।" (পৃ ৯০)

'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসে মানুষের চোখের বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুনির চোখ, বিষয়ীর চোখ, প্রেমিক সাধকের চোখ এমন হাজার চোখের বর্ণনা পাঠককে মানুষ চেনার বা আত্মাকে জানার সহজপাঠ দেয়। উপন্যাসে দার্শনিক জ্যোতিরিন্দ্র সংবেদনশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ জীবনবোধে চেতনার উত্তরণ ঘটান।

বস্তুত, প্রেম ও প্রেমহীনতার টানাপোড়েনে বিক্ষত একটি মানুষ যখন রাস্তার গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে সংসার ও সুহৃদজন পরিত্যক্ত হয়েও বুলা ও অমূল্যর প্রণয়কে স্বীকৃতি জানায়, সর্বোপরি আশ্রমে স্বামীজীকে জানায়, "মেয়েটি তার প্রেমিককে খুঁজে পেয়েছে...আমি আমার আত্মাকে খুঁজে পেয়েছি।" (পৃ. ৫০৩)

তখন পাঠকেরও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে। প্রেমের চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি কিংবা প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সার্বিক আবেদন। একটি বিশুদ্ধ আত্মার গান, যে গান জীবনের কথা শোনায়।

স্রোতের বিপরীতে : জ্যোতিরিন্দ্র

*　　　　*　　　　*

"একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—
তা হলে ঢেঁকির চাল হবে কলে ছাঁটা
—ব'লে সে বাড়ায়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ।
ভিড়ের ভিতরে তবু—হ্যারিসন রোডে—আরো গভীর অসুখ,
এক পৃথিবীর ভুল; ভিখিরির ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক।"

(ভিখিরি : বনলতা সেন : জীবনানন্দ দাশ)

সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বরাবর স্রোতের বিপরীতে পাড়ি দিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রের সৃজনশীল মন। রচনাক্ষেত্রে গতানুগতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে চেষ্টা করেছেন স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে। কী লিখব এবং কেমন করে লিখব—উভয় চিন্তাই সমান আলোড়িত করেছে লেখকের সৃজনক্রিয়াকে।

উপন্যাস-গল্প মিলিয়ে প্রায় সত্তরখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। এর মধ্যে ছোটগল্পই বেশি। কারণ সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ছোটগল্পকারের। ছোটগল্পের শৈলী সাধনেই তাঁর সর্বাধিক সিদ্ধি। উপন্যাসের শৈথিল্য অপেক্ষা ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে নির্ভার শব্দচয়ন ও নিশ্ছিদ্র বুনোট কলায় তাঁর স্বাভাবিক বিস্তার। জীবনে লেখালেখির থেকে কাটাকুটি করেছেন অনেক বেশি। আবার যা ভেবেছেন তা-ই লেখেননি। কেন্দ্রীভূত সংযম, অবিরত শোধনক্রিয়া এবং মগ্ন-চৈতন্যের সমন্বয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা সাধনার পর্যায়ে উন্নীত। তাঁর কাহিনীতে একটি শব্দও গুরুত্ব হারায় না। অলীক শব্দের জাল বুনে অযথা কালক্ষেপ করেননি বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় এই রূপকার।

বস্তুতপক্ষে জীবন ও মানুষকে দেখার বহু কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করেছে জ্যোতিরিন্দ্রের কাহিনীকে। রচনা আঙ্গিকের বশবর্তী হবে, না আঙ্গিক রচনা বা কাহিনীকে অনুসরণ করবে—এ ব্যাপারে কোনো সচেতন সতর্কতায় ধারাবাহিক শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়াসী ছিলেন-না তিনি। বরং তাঁর কথায় ঠিক বিপরীতধর্মী চরিত্রটাই ফুটে ওঠে। তিনি বারবার 'খেয়াল' শব্দটার উপর জোর দেন। অর্থাৎ যখন যেমন খেয়াল হয়েছে সেই অনুযায়ী লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। আগে থেকে গল্প-উপন্যাসের প্লট মাথায় ছকে নিয়ে লেখেন না তিনি। হয়তো কোনো একটা দৃশ্য বা ভাবনা থেকে শুরু করলেন। তারপর গল্প বা কাহিনী এগিয়েছে তার নিজস্ব গতিতে।

দার্শনিক ক্রোচে বলেছিলেন. 'কী বলছি' তার চাইতে 'কেমন করে বলছি' সেটাই আসল কথা। অর্থাৎ কাহিনীর গঠন বা কাঠামোটা আদ্যন্ত নিটোল নিখুঁত হওয়া জরুরি, যার মাধ্যমে প্রাঞ্জল হ'য়ে ওঠে কাহিনীর বিষয়বস্তু।

আবার জ্যোতিরিন্দ্র এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, আঙ্গিক হবে নিঃশ্বাসের বাতাসের মতো। তিনি এ-ও বলেছেন, "...কী লিখব তা যেমন ভাবি তেমনি কীভাবে লিখব তাও আমাকে ভাবতে হয়।" (ত্রিবৃত্ত : শারদীয় সংখ্যা '৫৪ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঙ্গিক : ধীমান দাশগুপ্ত)। অর্থাৎ নিছক আঙ্গিক সর্বস্বতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অথচ কাঠামো বাদ দিয়ে যে বক্তব্য বিষয়কে শারীরসত্তা দান সম্ভব নয়, প্রকারান্তরে এ কথারও সমর্থন জানিয়েছেন লেখক। তা হলে জ্যোতিরিন্দ্রের লেখন-শৈলী আলোচনায় আমরা কোন্ জ্যোতিরিন্দ্রকে অনুসরণ করব! আদতে বোধহয় এ কথাই সত্য বলে বিবেচনা করা যেতে পারে যে, এই বৈপরীত্য এবং চেতন-অচেতন নির্দিষ্ট পথের ঘুলঘুলিতে সাবলীল গতায়াত ক্রিয়াই তাঁর নির্মাণরীতির কৌশলকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মনে রাখতে হবে, তাঁর মত ও পথ বিপরীতধর্মী কিন্তু পরস্পর বিরোধী নয়।

তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কাহিনীর নির্মাণপর্বে অসাধারণ শিল্প-রচনায় প্রয়াসী জ্যোতিরিন্দ্রের কাছে এই প্রজন্মের বিস্ময়াহত জিজ্ঞাসা, 'কী লিখব', 'কেমন করে লিখব' ছাড়াও 'কেন লিখব' ভাবাটাও জরুরি ছিল না কি! তা হলে হয়তো অনেক অবান্তর কাহিনী এবং একঘেয়ে বিস্তার থেকে মুক্তি পেতে পারত তাঁর রচনা। বস্তুত তাঁর 'বনানীর প্রেম', 'স্বর্গোদ্যান', 'গোলাপের নেশা', নিঃসঙ্গ যৌবন', 'সুনন্দার প্রেম', 'অপারেশন', 'যুবতীর মন নদী', 'জীবনের স্বাদ', 'জ্যোৎস্নার খেলা', 'সাদা ফুল কালো কীট', 'অনুভার স্বপ্ন' ইত্যাদি একাধিক উপন্যাস এবং বধিরা, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, ভোলাবাবুর ভুল, মাছি-র মতো গল্প পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়, কেন এই অপচয়?

যদিও উপরোক্ত কাহিনীগুলিতেও তাঁর নির্মাণরীতি শিক্ষণীয় এবং অবশ্যই ঈর্ষণীয় বিষয়, তবু মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত পরিধিতে বিচরণের সুযোগ পেলে মনে হয় আমরা অন্য জ্যোতিরিন্দ্রকে পেতাম। প্রতিভার এই অনন্য অপচয় রোধ করা যেত। অর্থাৎ বিষয় নির্বাচনে আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল বোধহয়। এবং প্রয়োজন ছিল অভিজ্ঞতার পক্ষবিস্তার। তিনি বারবার 'ইমাজিনেশন' অর্থাৎ কল্পনাশক্তির উপর জোর দিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু কল্পনার বৈভবের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সার্থক সংযোজন

ঘটলে এই লেখক সেই রূপকথার দৈত্যের রূপ নিতেন, যার ঠিকানা জলের খুব গভীরে। একটি ছোট্ট পিতলের ঘড়ার ভিতর নিশ্চুপ, নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সেই ঘড়া বা ঘটের মুখ খুলে দিলে সব ধোঁয়াশা কাটিয়ে বেরিয়ে আসে অপলক বিস্ময়। ভয় জাগায়। সম্ভ্রমও।

সেই ভয় এবং সম্ভ্রমের আংশিক পরিচয় যে আমরা পাইনি, তা নয়। তাঁর 'শেষ বিচার', 'প্রেমের চেয়ে বড়', 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাস এবং অসংখ্য গল্পের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো এপিক চরিত্র কিংবা মহাকাব্যোপম ঘটনা তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। পাঠকের প্রত্যাশার প্রতি উদাসীন কিংবা 'খেয়ালী' এই জ্যোতিরিন্দ্রকে আমার সীমাবদ্ধ মনে হয়। তিনি যতটা নির্মাণকলার উপর জোর দিয়েছেন ততটা নির্মাণ-বিষয় প্রসঙ্গে অবহিত হলে আমরা উপকৃত হতাম। তা ছাড়া ইমাজিনেশন, ইনটেলেক্ট, এক্সপিরিয়েন্স, ইনস্‌পিরেশন এবং ইনট্যুইশন-এর পঞ্চব্যঞ্জন ব্যতীত শিল্পের পাকশালা তো অসম্পূর্ণ বলেই মনে হয়।

যহি হোক, কেন রূপকথার দৈত্য নিজেই নিজের অবরোধ তুলে নিলেন না কিংবা বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলেন না, সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

এখন দেখা যাক কী লিখব এবং কেমন করে লিখব অর্থাৎ বিষয় (content) এবং গঠন (form) পর্বে কোন্ জ্যোতিরিন্দ্রকে আমরা আবিষ্কার করলাম।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শৈলীতে যে যথাযথ বিন্যাস ও পরিমিতি প্রয়োগ ঘটেছে, উপন্যাসে তার একান্তই অভাব। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যই হল একমাত্রিক দৃষ্টিকোণে একক ঘটনা, একক চরিত্রের সামগ্রিক রূপের অংশ বিশেষের প্রতিফলন। কিন্তু উপন্যাস আরো কিছু দাবি করে। কাহিনী, উপকাহিনী, ঘটনার বিস্তার, অনুপুঙ্খ বর্ণনা, বহু চরিত্রের ব্যাপক সমাবেশ, বৃহত্তর পটভূমি, জটিল ব্যঞ্জনা, সময়-সন্নিবেশ ইত্যাদি অনেক কিছু। প্রসঙ্গত ড. ভূদেব চৌধুরী যথার্থ বলেছেন, "ছোটগল্প একটি মানব-জীবনের যে কোনো একটি মাত্র মুহূর্তের অভিভাবকতার গহনে অখণ্ড সম্পূর্ণ জীবনকে করে বিম্বিত।" (বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার : প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়।)

আবার ছোটগল্প প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মত হল, '...It is a form of literature which includes all the other forms. Poetry, Drama, History, Biography, Science, Sociology, Politics, Adventure, Religion and Art."

বলা বাহুল্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শেষ বিচার', 'নিশ্চিন্তপুরের মানুষ', 'সূর্যমুখী', 'গ্রীষ্মবাসর', 'বারো ঘর এক উঠোন', 'এই তার পুরস্কার', 'প্রেমের চেয়ে বড়' ইত্যাদি উপন্যাস বাদে অধিকাংশই ছোটগল্পের প্রসারিত রূপ। সে ক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসের আয়তন এবং আকৃতি বিচারে সেগুলিকে ছোট আকারের উপন্যাস, উপাখ্যান বা নভেলেট বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নভেলেটের বৈশিষ্ট্য হল, উপন্যাসের মতো ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য এবং জটিলতা থাকবে। কিন্তু কাহিনীর আকৃতি হবে সংক্ষিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'রাধারানী'-কে নভেলেট বা বড় গল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়।

বিশাল, ব্যাপক ক্যানভাসের লেখক নন জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর উপন্যাসে আকৃতিগত

বিশালতা পাওয়া যায় না। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনার ব্যাপ্তিও কম। চমৎকারিত্ব কম। বরং ছোটগল্পসুলভ রহস্যময়তা আছে। বিশেষ কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাখ্যা আছে। চরিত্রের অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ আছে, এই পর্যন্ত। অথচ উপন্যাস দাবি করে কাহিনীর বিস্তার। প্লট, সাব প্লট, বিচিত্র ছাঁচে ঢালা বিবিধ চরিত্র, বিশদ ব্যাখ্যা, বর্ণনা এ সবই উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ : 'মীরার দুপুর' উপন্যাসটির উল্লেখ করা যেতে পারে। মোট ২০৪ পৃষ্ঠায় ১৩টি পরিচ্ছেদে শেষ হয়েছে এই উপন্যাস। 'পুরো তেইশটি বসন্ত নির্বিঘ্নে অতিক্রম ক'রে আসা' সুন্দরী তন্বী মীরার বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে কাহিনী। মীরার অধ্যাপক স্বামী হীরেন অসুস্থ। অপারেশনের পর থেকে গৃহবন্দি। চাকরি নেই। কখনও বাপের বাড়ি, কখনও কলেজ জীবনের বন্ধু অমরেশ, পুষ্পর কাছে টাকা ধার করে সংসার চলে মীরার। প্রতিটি দুপুরে অসুস্থ স্বামীর পরিচর্যা সেরে রাসবিহারী এভিনিউর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে মীরা। কখনো চাকরির খোঁজে। কখনো নিরুদ্দিষ্ট। পথে পথে। ফেরে রাত দশটা এগারোটার সময়।

এমনই এক নিঃসঙ্গ দুপুরে কাহিনীর শুরু। একলা ঘরে মীরার ছবির দিকে তাকিয়ে প্রাক্ বিবাহ জীবন, মীরার সঙ্গে প্রেম ও বিবাহিত সুস্থ দাম্পত্যদিনের কথা ভাবতে থাকে হীরেন। ঘরের মধ্যে একা হীরেন ও কলকাতায় পথে পথে ঘুরতে থাকা মীরার মনোলগ সূত্রে আমরা জানতে পারি স্ত্রীর প্রতি হীরেনের অবিশ্বাস, সন্দেহপ্রবণতা, পাশের ফ্ল্যাটের শিল্পী মৃগাঙ্কর মীরার প্রতি দুর্বলতা, মীরা বাড়ি ফিরলে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে হীরেনের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। আরো জানতে পারি শত দারিদ্রেও মীরার সুস্থ পরিচ্ছন্ন গৃহিণীপনা, হীরেনের প্রতি প্রেমে ফাটল, নিছক কর্তব্যপরায়ণতা এবং পর্যায়ক্রমে অমরেশ ও মৃগাঙ্কর প্রতি আসক্তির কথা। লেখক অত্যন্ত নিপুণ হাতে অসুস্থ মানসিকতার শিকার হীরেন ও ছলনাপটীয়সী মীরার চারিত্রিক বিবর্তন-কথা ফুটিয়ে তুলেছেন, সন্দেহ নেই। চরিত্রদ্বয়ের অন্তর্লোকের জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই এই উপন্যাসের সম্পদ।

কিন্তু একটি উপন্যাসে কাহিনীর পাশাপাশি শাখা কাহিনী এবং কিছু পার্শ্বচরিত্রও থাকে, যার গুরুত্ব মূল কাহিনীর থেকে কিছু কম নয়। 'মীরার দুপুর' উপন্যাসের মীরা ও হীরেন ছাড়াও মীরার কাজের মেয়ে মালতী, শিল্পী মৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্কর প্রাক্তন স্ত্রী ভোমরা, খলচরিত্র বিপদবরণ এবং অমরেশ ও পুষ্প—এমন একাধিক চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। অথচ উপন্যাসসুলভ যথাযথ বিস্তার বা পূর্ণতা পায়নি সে সব ঘটনা তথা চরিত্রগুলি।

মীরার কাজের মেয়ে মালতী উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার 'চোখে কাটারির ধার'। তার 'লম্বা গড়ন'। 'মোরগ চণ্ডী ফুল', 'খয়েরি ট্যাসেল' জড়িয়ে সে খোঁপা বাঁধে। হীরেনের মতো তার স্বামীও সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। ফলে স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে থাকে মালতী। হীরেনের প্রশ্নের উত্তরে সে স্পষ্টই বলে "...আছি কেশবের সাথে। হিঁদুর মেয়ের তো দু-বার বিয়ে নেই, অই এক সঙ্গে থাকা আর কি।" (পৃ. ৫৪) এ হেন আধুনিকা মালতীর জীবনযাপন সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো বিবৃতি লেখক

দেননি। মালতীকে আমরা উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করি মোট তিনবার। হীরেনের নিঃসঙ্গ বিকেলে নিভৃত আলাপচারিতায়, দাসী হয়েও মনিবপত্নীকে 'পাঁচটাকা' ধার দেওয়ার গর্বিত বিভঙ্গে। আর একবার শেষদৃশ্যে হীরেনের আত্মহত্যার পর। আত্মহত্যার আগের রাতে ট্রামে ক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে স্বামী পরিচয়ে শিল্পী মৃগাঙ্ককে মীরার ছাড়িয়ে আনার মুখরোচক খবরের টুকরো কাগজটা মীরারই নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলার তৎপরতায়। মালতী সম্বন্ধে আর বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়তো লেখক অনুভব করেননি।

শিল্পী মৃগাঙ্ক ও তার পুতুলস্বরূপা স্ত্রী ভোমরার উচ্চাকাঙ্ক্ষারও কোনো বিশদ প্রেক্ষাপট নেই উপন্যাসে। ভোমরার সঙ্গে এক দুপুরে হঠাৎ দেখা হয় মীরার। আর একবার অমরেশের হোটেলের ঘরে। এ ছাড়া বার দু'য়েক ভোমরার প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে মৃগাঙ্ক ও মীরার কথোপকথন সূত্রে। কিন্তু ভোমরা ও মৃগাঙ্ক বিষয়ে পৃথক কোনো অধ্যায় স্থান পায়নি উপন্যাসে, যা পাঠকের মনোযোগ দাবি করতে পারে। এ ছাড়া অমরেশ চরিত্রটিও যথাযথ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কলেজ-জীবনের প্রেম অথবা ভালোলাগাকে মূল্য দিতে একটি যুবক দিনের পর দিন টাকা ধার দিয়ে যায়। বিনিময়ে কিছু চায় না, বিয়েও করে না। এহেন চরিত্রের আদর্শ কিংবা দর্শন জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়নি উপন্যাসে।

আদপে কয়েকটি অলস, কর্মহীন, নিঃসঙ্গ দুপুরের সময়সীমায় আবর্তিত এই কাহিনী। একটিমাত্র দম্পতি যুগলের পাপ, প্রণয়, হতাশা ও বিষাদময় মুহূর্তের দোলাচলবৃত্তিতে পূর্ণ। হীরেনের আত্মহত্যা শেষ মুহূর্তে একটা নাটকীয়তা এনেছে ঠিকই। হীরেনের মৃত্যুজনিত বিষাদ পাঠকহৃদয়কেও স্পর্শ করে। কিন্তু জীবনবোধের সার্বিক ঠিকানা বা ব্যাপ্তি মূর্ত হয়ে ওঠে না এই ঘটনায়। বরং পূর্বাপর প্রস্তুতি ছাড়াই এই নাটকীয় ঘটনা ছোটগল্পের লক্ষণের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

ছোটগল্প আকৃতিতে বড় হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে একমাত্রিকতা, ইঙ্গিতধর্মিতা, ব্যঞ্জনা এবং নাটকীয়তা সৃষ্টি তার অন্যতম শর্ত। কাজেই গঠনগত বিচারে 'মীরার দুপুর'-এর কাহিনীতে উপন্যাসের সবকটি বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে কুশল শব্দসমন্বয় ও বাস্তবতার নিরিখে এটি একটি শিল্পসফল রচনা, এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা থাকে না।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'লড়াই' উপন্যাসটিও আয়তনে বিশাল কিছু নয়। ২৩৫ পৃষ্ঠায় ১৭টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। উপন্যাসের নায়ক অবসরপ্রাপ্ত বিপত্নীক বৃদ্ধ গোকুলবাবু। উল্লেখ্য, একসময় পত্রিকা অফিসের প্রুফ রিডার ছিলেন তিনি। সেইসূত্রে কিংবা অবসরদিনের নিঃসঙ্গতা কাটাতে খবরের কাগজই তাঁর একমাত্র সঙ্গী। অথচ এক সকালে উঠে তিনি দেখলেন কাগজওয়ালা শুকদেওর আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কাহিনী শুরু হয়েছে এইখান থেকে। গোকুলবাবুর বিষাদজনিত মনোলগ দিয়ে। তাঁর দুঃখ, পুত্র অমূল্য এবং পুত্রবধূ এ ব্যাপারে তাঁর অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

বেসরকারি অফিসের টাইপিস্ট পুত্র অমূল্য ও তার ঘোর হিসেবি স্ত্রী রেখার কাছে হয়তো এর বেশি কিছু আশাও করেন না তিনি। তাই চুপ করে থাকেন। কিছুটা তাঁর

দৈনন্দিনের দুধটুকু বন্ধ হয়ে যাবার ভয়েও।

কাহিনীর তাৎপর্য অবশ্য অন্য জায়গায়। বাড়িতে কাগজের অভাবে গোকুলবাবু যখন তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। হানা দেন স্থানীয় চায়ের দোকানে। প্রহ্লাদ মাইতির চায়ের দোকান 'অমৃত কেবিনে' আড্ডাধারী কিছু উঠতি বয়সের ছেলে ও রাধু গুণ্ডার সংস্পর্শে যেন বিশ্বরূপ দর্শন করেন গোকুলবাবু। খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দেন। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে খেটে খাওয়া মানুষের দিনযাপন পর্যবেক্ষণ করেন।

মুখ্য চরিত্রের পাশাপাশি একাধিক পার্শ্বচরিত্রের দেখা আমরা পাই। অমূল্যর বাল্যবন্ধু মদ্যপ ধনী বাসুদেব, পকেটমার ফটিক, ফটিকের স্ত্রী অঞ্জলি ও প্রেমিকা উষসী, হোসিয়ারি ব্যবসাদার বিষ্টু দাস, স্বৈরিণী অরুন্ধতী, ইন্সপেক্টর ভানু রায়, ভেকধারী সমাজসেবী তথা রাজনীতিবিদ আদিত্য দস্তিদার. জগু, সুধন্য, পূর্ণ, বীরেশ্বর ইত্যাদি একাধিক চরিত্রের আনাগোনা নিঃসন্দেহে একটি উপন্যাসের লক্ষণকে চিহ্নিত করে। কিন্তু এ-ও লক্ষণীয় যে, কোনো একটি চরিত্র বা ঘটনা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি এখানে। অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের ঘনসন্নিবদ্ধ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না।

বলা যেতে পারে, 'লড়াই' কোনো ঘটনাপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান উপন্যাস নয়। একক একটি চরিত্রের অক্ষমতা, ক্ষোভ, সীমাবদ্ধতা, অনুশোচনা সর্বোপরি আত্মিক সংকট এবং সংকটের প্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক তথা পুরো সমাজব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাহিনী। আধুনিক উপন্যাসের এও এক লক্ষণ। এই আত্মিক বিশ্লেষণ। কিন্তু বিবিধ চরিত্রের অন্তর্গত বৈচিত্র্য বা জটিলতা বোঝাতে যে চালচিত্র প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা অর্থাৎ প্রতিটি চরিত্র বা ঘটনার পূর্বাপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আমরা পাই না।

কারখানা লক আউট হওয়ার কারণে যে ফটিক পকেটমার ওরফে 'আঙলিদার'-এর জীবিকা নির্বাহ করে, স্ত্রী মাধ্যমিক পাশ শিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও বাইরে রুজির প্রয়োজনে তাকে পাঠাতে যার তীব্র আপত্তি, আবার সুন্দরী সফিস্টিকেটেড প্রাক্তন প্রেমিকা উষসী সম্পর্কে রোমান্টিক ভাববিলাসে মগ্ন হয় যে ফটিক, তাকে কেন্দ্র করে একটি চমৎকার উপকাহিনী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। যেমন সম্ভাবনা ছিল রাধু গুণ্ডা ও আদিত্য দস্তিদারের কাহিনী রূপায়ণের ক্ষেত্রে।

আদিত্য দস্তিদারের সংস্পর্শে গুণ্ডামিতে হাত পাকানো রাধুর ডাকাতি, মস্তানি, জেলে যাওয়া, অরুন্ধতীর প্রতি প্রেম, প্রেমে ব্যর্থতা, প্রতিশোধস্পৃহা, স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফেরার ইচ্ছা, আদিত্য দস্তিদারের রূপান্তরে ক্ষোভ, বিষাদ, ক্রোধ ও বিধ্বংসী 'লড়াই'-এ সামিল হওয়ার এতগুলি উপাদান নিয়ে মূল গল্পের পরিপূরক একটি অঙ্গ কাহিনী গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু লেখকের রচনাশৈথিল্য অথবা বর্ণনাবিমুখতা অথবা বিন্যাসগত দক্ষতার অভাব দেখে মনে হয় ছোটগল্পের পরিধিতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশি।

এমনকি বন্ধ কারখানার কর্মী খগেনের ফেরিওয়ালা বৃত্তি, বাসুদেবের ঠোঙা তৈরির বৃত্তি এবং বাবলার চোরাকারবারে জড়িয়ে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার ঘটনা আলাদাভাবে বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি লেখক। কাহিনীতে এদের কোনো উপস্থিতি আমরা পাই না। কেবল গোকুলবাবুর মনোলগে কোনো এক পরিচ্ছেদে একবার মাত্র

নামোচ্চারণ এবং জীবিকার উল্লেখ ছাড়া। অথচ বন্ধ কারখানার কর্মীদের জীবিকার 'লড়াই' বিশ্লেষণে ভিন্ন এক তাৎপর্যবহ মাত্রা সূচিত করতে পারত এ কাহিনী।

কেন্দ্রীয় চরিত্র গোকুলবাবুকে আমরা দেখি সপ্তদশ (১৭) পরিচ্ছেদে এসে তিনি আবার কাগজ পড়া শুরু করেছেন। তবে 'ইন্দিরা', 'কোসিগিন' বা রাজনীতির খবর নয়। পড়ছেন বিশৃঙ্খল সমাজের স্বেচ্ছাচারী সন্তান তথা পারিপার্শ্বিক মানুষের খবর। তাদের লড়াই বা স্বঘোষিত যুদ্ধের খবর : "...ক্ষুধার লড়াই তো এদিক ওদিক চলছেই, আমি অস্বীকার করছি না। গোকুলবাবু চেহারাটা অত্যন্ত গম্ভীর করে ফেললেন। কিন্তু আমি বলব তার সঙ্গে নীতির লড়াইও শুরু হয়ে গেছে, হুঁ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতির যুদ্ধ..." (পৃ. ২৩৫)—কাহিনীর শেষে গোকুলবাবুব এই চারিত্রিক বিবর্তন প্রার্থিত ছিল।

সব আশা, ভরসা খুইয়ে, ছেলে, বউ-এর সান্নিধ্যে আশ্রিতের মতো দিন যাপনে অভ্যস্ত বৃদ্ধ গোকুলবাবু যে নতুন দিনের স্বপ্ন পোষণ করেন এবং লড়াই-এর পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কথা বলেন, পাঠককে তা ভাবিত করে। তবু উপন্যাসোপম নির্মিতির অভাব এবং এই একমাত্রিক দ্বন্দ্ব চিত্রণের জন্য ছোটগল্পের মতো লড়াই-এর একটা খণ্ডচিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। কিংবা বলা যায় চারপাশে একটা ভীষণ লড়াই বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা মাত্র পাই এ কাহিনীতে। এবং কাহিনীর শেষে সমাজবিরোধীর হাতে ধান্দাবাজ, লম্পট এম এল এ আদিত্য দস্তিদারের খুনের ঘটনায় সৃষ্ট নাটকীয়তা ও দিন বদলের ইঙ্গিত ছোটগল্পের লক্ষণকেই চিহ্নিত করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সর্বাধিক ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস বোধহয় 'সাঁকোর ওপরে নীরা' ও 'বনহরিণী'। আয়তনগত সীমাবদ্ধতা ছাড়া কাহিনী বা ঘটনার সীমাবদ্ধ পরিসর এবং পরিণতি এখানেও লক্ষণীয়।

মাত্র ৬৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে 'সাঁকোর ওপরে নীরা'-র কাহিনী। এ কাহিনীতে কোনো অধ্যায়ভাগ নেই। চরিত্রসংখ্যা তিনজন। নীরা, তপেন, সুজিত। ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন ঘটিত কাহিনী। ঘটনার ব্যাপ্তি একটি দিন। এক ছুটির সকাল থেকে ছায়া ঘনীভূত আসন্ন সন্ধ্যার পরিধিতে আবর্তিত এ কাহিনীর পটভূমি।

ব্যাঙ্ক অফিসার তপেন, অধ্যাপক সুজিত এবং এলিয়ট, শেক্স্পিয়র, রবিঠাকুর পড়া শিক্ষিতা সুন্দরী রুচিসম্পন্না নীরা—অভিন্ন হৃদয় তিন বন্ধু। শহর কলকাতার ভিড়, হইচই, ব্যস্ততা ছাড়িয়ে একদিন নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্যে চড়ুইভাতি করতে যায় তারা। এবং সেখানে গিয়ে একে অপরকে আবিষ্কার করে। কলকাতার সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, কফিহাউসের আড্ডা থেকে উঠে আসা তাদের অকৃত্রিম সখ্যে ফাটল ধরে। নীরার শরীরী সত্তা প্রধান হয়ে ওঠে তার দুই বন্ধু সুজিত ও তপেনের কাছে। নীরা লক্ষ করে তার বন্ধুত্ব অপেক্ষা তার প্রতি অধিকারবোধে কেমন কুটিল সন্দেহে জর্জরিত দুই শিক্ষিত শহুরে 'ভদ্রলোক'। একসময় পাইপগান ও পেটো বোমা হাতে রণাঙ্গনে নেমেও পড়ে তপেন ও সুজিত। আর খালের কালো গভীর জলের উপর তৈরি সাঁকোতে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় নীরা তাদের ভঙ্গুর সম্পর্কের নড়বড়ে সেতুর বিপন্নতা প্রত্যক্ষ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। নীরার মনে হয়—"যাই হোক, ওই যে ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারটা। কই, এই নিয়ে তো কোনোদিন

তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়নি, মন-কষাকষি দেখা দেয়নি। সুজিত যদি কখনো নীরার গালে গাল ঠেকিয়ে ওকে আদর করেছে—তপেনের দিকেও নীরা আর একটা গাল তক্ষনি বাড়িয়ে দিয়েছে—গালে গাল ঠেকিয়ে তপেনও সেভাবে ওকে আদর করেছে। এটা যে সাংঘাতিক একটা লোভনীয় কিছু নয়—তাই প্রমাণ করার জন্য নীরা এমন করত...একলা নীরা কারো নয়। এই বোধ নিয়ে তারা চলছিল বলে স্বার্থপরতার গন্ধ তাদের মধ্যে উঁকি দিতে পারেনি। স্বার্থপরতা থেকেই পাপের সৃষ্টি, নোংরামির সৃষ্টি। এবং তখনই হিংসা ঈর্ষা সন্দেহ মাথা-চাড়া দেয়। এবং তারপর যা ঘটার ঘটে।" (পৃ. ১৪)

বাস্তবিক এক অনিবার্য অঘটন বা মৃত্যুতে এ কাহিনীর পরিণতি। তপেনের প্যান্টের পকেটে রাখা বোমা ফেটে তপেনের মৃত্যু ও সাঁকোর তলায় খালের জলে তলিয়ে যাওয়া ঘটনাকে প্রার্থিত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

বলা বাহুল্য, ছোটগল্পের একাধিক লক্ষণ এ কাহিনীর ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। একটি মাত্র দিনের নির্দিষ্ট সময়ের পটভূমিতে চিত্রিত এ কাহিনীতে অতীত এসেছে ফ্ল্যাশব্যাকে, খণ্ড-খণ্ড রূপে। তা-ও অতীতের আভাসমাত্র। পূর্ণাঙ্গ অতীত নয়। নীরা-তপেন-সুজিতের অতীত ও পারিবারিক জীবন এখানে বর্ণিত হয়নি। তাদের বন্ধুতার উন্মেষ ও বেড়ে ওঠার প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়নি কাহিনীতে। ব্যাখ্যা নেই তিনবন্ধুর পারিপার্শ্বিক চালচিত্রের। এমনকি সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তিন আধুনিক শিক্ষিত মনস্ক মানুষের ধ্যান-ধারণা প্রতিক্রিয়াও বিবৃত হয়নি। কেবল তিন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এক নারীকে ঘিরে দুই পুরুষের আদি-অকৃত্রিম প্রবৃত্তি, ঈর্ষা ও সংঘর্ষের ইতিহাস এ কাহিনীর মূল উপজীব্য।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অভিনব বিশ্লেষণগুণে 'সাঁকোর ওপরে নীরা' কাহিনীগতভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ভাষা, সংলাপ এবং শব্দ দিয়ে ছবি আঁকার মুন্সিয়ানায় দক্ষ জ্যোতিরিন্দ্রের অন্তর্গত শিল্পস্বভাবের পরিচয়টি এখানে বারে বারে সমৃদ্ধ করে আমাদের। তবু 'সাঁকোর ওপরে নীরা'-র কাহিনী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের আধার পায়নি। আদপে ছোটগল্পের আধারে বিবৃত এ কাহিনীতে উপন্যাসোপম বিস্তৃতির প্রত্যাশা থেকেই যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আঙ্গিক প্রসঙ্গে আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নিজে বারবার বলেছেন, গল্পের আইডিয়া আগে থেকে ভেবে লেখেন না। লিখতে লিখতে আইডিয়া ডেভেলপ করে। অর্থাৎ কাহিনীতে ঘটনাগত পারম্পর্য রক্ষার প্রতি যেন এক ইচ্ছাকৃত অবহেলা প্রকাশের কথা বলেন লেখক। বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে এই পারম্পর্যহীন খণ্ড মুহূর্ত সৃষ্টি চরিত্রের স্ববিরোধিতা চিত্রণের ক্ষেত্রে চরম তাৎপর্য বহন করেছে। এই বৈপরীত্যধর্মী বিরোধাভাস জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার অন্যতম লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ, তিনি বলেছেন, "পাঠকের হাতের মুঠোয় যাতে গল্প না চলে যায়, আবার পাঠকের সঙ্গে কম্যুনিকেশন হবে না তাও যেন না হয়, মোটামুটি একটা ইঙ্গিত যাতে থাকে এবং সেটা উইটি হওয়া চাই, এটা আমার লক্ষ্য। ব্যাপারটা যেন একটা ম্যাজিক খেলা, কোথায় গিয়ে শেষ করব সেটা পাঠকও

বুঝবে না, সেজন্য পাঠক তৈরিও থাকবে না। সেটা যে একটা বিস্ময় একটা চমক তাও নয়। একটা মাত্রাবোধ, একটা ছন্দে, সমে এসে থেমে যাওয়া, তারপর যদি একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়, মনে হয় যে আঙ্গিকটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমি আঙ্গিককে এতটা গুরুত্ব দিই।'' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার)

ঠিক এইখান থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে পারি। আঙ্গিকগত এই খুঁটিনাটি তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যথাযথ তাৎপর্য বহন করেছে বলে মনে হয়। মুখ্যত, ভাববৈষম্যহীন একটা চোরাস্রোত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া—যেটা দেখে মনে হতে পারে লেখকের কোনো হাত ছিল না, লেখকের কিছু করার নেই—এমন এক উদাসীন অথচ সতর্ক পদক্ষেপই তাঁর গল্পের কাঠামোকে মজবুত নিরেট পাথরের মতো দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে। কাহিনীর শেষে কখনও নাটকীয়তা এনেছেন। এই লক্ষণ তাঁর উপন্যাসেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু চমক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এই নাট্যমুহূর্ত আনা হয়নি। বরং চরিত্রের অন্তর্লোক পরিস্ফুটনই সেখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল। আবার নাটকীয়তা বর্জিত ক্রমপরিণতির দিকে ঝোঁকও জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের অন্যতম লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে। আলোচনাসূত্রে জ্যোতিরিন্দ্র এ-ও জানিয়েছেন, ''আমি এখন টেকনিকটাকে আরও বেশি ফ্রি করতে চাই, যেন তা আলো বাতাসের মত চরিত্র এবং পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। খুব সাধারণ, খুব সহজ শব্দ যদি এসে যায় আমি ওই শব্দই দেব। যেখানে আমি যথার্থ শব্দ দিয়ে অর্থটা পরিষ্কার করতে পারি, সেখানে খামকা আমি উপমা টেনে আনব কেন? ...আর আমার দৃষ্টিভংগিও বদলেছে, আগে যেমন প্যাশন হলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, রূপ দেখলে দিশেহারা হয়ে যেতাম এখন আর তা হয় না। আমার অভিজ্ঞতার দরুণ, বয়সের দরুণ, মানসিকতার দরুণ এসব হচ্ছে। আমি চাইছি আমার লেখা যেন সরলভাবে এগিয়ে যায়। একটা গল্প আগে যত সময় নিয়ে লিখতাম এখন তার চেয়ে কম সময়ে লিখি। তার কারণ আগে ভাষা বা বর্ণনার অলঙ্করণ আমার লেখায় ছিল, এখন আমার ওই লেখা পড়ে মনে হয় আজ হলে গল্পটা অযথা ভারী করতাম না। এই ভার শব্দের ব্যবহারে, উপমায়, দৃষ্টান্তে। এখন মনে হয় রূপ বাড়াবার জন্য সেগুলো পোশাকের বাহুল্য। আমার খুব অনুশোচনা হয় আমি কেন ওভাবে লিখতে গিয়েছিলাম।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঙ্গিক . ধীমান দাশগুপ্ত)।

'ছিদ্র' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হিংসা' গল্পের কাহিনী শুরু হয়েছে বাড়ির পোষা একটি মুরগিকাটা ও পারিবারিক অভিমানের ঘটনা দিয়ে। স্বামী-স্ত্রী জগদীশ ও রেবার প্রতিজ্ঞা ছিল কোনোদিন জীবহত্যা করবে না। জগদীশের একসময় পাখিশিকারের নেশা ছিল। কিন্তু তাদের একটি পুত্রসন্তান মারা যাবার পর রেবাই জগদীশের কাছে শিকার বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। যাইহোক, গল্পে অহিংসায় বিশ্বাসী রেবা ও প্রতিবেশীর স্ত্রী মীরার অন্তর্জগৎ চিত্রণের মাধ্যমে হিংসার বিবিধ রূপ প্রকাশই লেখকের উদ্দিষ্ট বিষয়।

ডিমওয়ালা মুরগিকাটার খবরে গর্ভবতী মীরার উত্তেজনা, মুরগির পেটের ভিতরটা স্বচক্ষে দেখার জন্য উঠোনে ছুটে যাওয়া, মাংস রান্নার পর সোৎসাহে খাওয়া, অন্যদিকে

সংসারের অকল্যাণ চিন্তায় রেবার রাগ-অভিমান, বিরক্তি ও ক্ষোভ বর্ণিত হয়েছে ২২ পৃষ্ঠার এই কাহিনীতে।

কাহিনী পরিণতিতে পৌঁছয় একটি পরোক্ষ হত্যা অর্থাৎ মৃত্যুতে। হয়তো অন্যভাবেও শেষ হতে পারত এ কাহিনী। কিন্তু কাহিনীর নাম 'হিংসা'। তাই অন্য কোনো পরিণতি বা সমাপ্তি হয়তো প্রার্থিত ছিল না লেখকের কাছে।

গল্পের শেষে রেবার প্ররোচনায় মীরার মৃত্যু ঘটে খুবই আকস্মিকভাবে। মীরা যখন তার স্বামীর অফিসে মাইনে বাড়ার কথা, প্রমোশনের কথা এমনকি বিলেত যাওয়ার খবর ও স্বামীর গয়না গড়িয়ে আনার খবর একে একে অত্যন্ত অভাবক্লিষ্ট রেবার কানে তোলে, তখনই অন্য এক হিংসার বীজ প্রোথিত হয়ে যায় জীবহত্যার পাপে কণ্টকিত রেবার মনে। মীরা বাথরুমে যেতে চাইলে রেবা তাকে শ্যাওলাধরা অন্ধকার পিছল কলতলায় যেতে বলে। ঘরের লাগোযা পরিচ্ছন্ন বাথরুমের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। মিথ্যে করে বলে—"ভুলেই গেছি বলতে—নতুন সিমেন্ট করিয়েছে বাথরুমের মেঝেটা—দুদিন ধরে আমরা কেউ ওখানে ঢুকছি না। ...কলতলায় চলে যা...মীরা ঘাড় কাত করে কলতলায় চলে গেল। ...দরজা ছেড়ে রেবা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেছে ওর, যেন দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে, কান খাড়া রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ও।..."

পোষ্য প্রাণীর প্রতি মায়া ও মমতাবোধে আক্রান্ত এবং জীবহত্যার পাপ তথা সংসারেব অকল্যাণ চিন্তায় কণ্টকিত রেবার অন্তর্গত চরিত্রের পরস্পরবিরোধী জটিলতাই যেন মীরাব মৃত্যুদৃশ্যটি রচনা করেছে এ গল্পে। কেবল তাই নয়, মানুষ ও পরিস্থিতিভেদে 'হিংসা' এবং 'হত্যা' শব্দের আপেক্ষিকতা ব্যক্ত করার জন্যেও অন্তত এই নাটকীয়তা সৃষ্টি ছাড়া যেন উপযুক্ত কোনো পথ ছিল না লেখকের।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের 'ক্ষুধা' গল্পেও আমরা লক্ষ্য করি এক নারী, অর্থাৎ তন্দ্রা কেমন তার অতৃপ্ত কামনার 'ক্ষুধা' চরিতার্থ করতে বিবাহিত স্বামীকে খাবার টেবিলে হত্যা করে।

গৃহশিক্ষক পশুপতি, ছাত্র বিভু ও বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ তন্দ্রার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখক জানিয়েছেন ক্ষুধা ওরফে লোভ-লালসা-পাপের বিচিত্র রূপ কিভাবে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্যবোধকে আড়াল করে দেয়।

দশ বছরের ছেলে বিভু ঢিল ছুঁড়ে শালিকের পা খোঁড়া করে দেয় বলে শিক্ষক পশুপতি ছাত্রকে মারধোর করেন। জীবহত্যা বা জীবহিংসা পাপ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করাতে তৎপর হন ছাত্রের মা তন্দ্রা দেবীকেও। অথচ পশুপতির প্রতি আকর্ষণে স্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করার খবর যখন তন্দ্রা এসে জানায়, তখন শিহরিত হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকে না নিরীহ পশুপতির। গল্পে বিবেকবোধ শূন্য তন্দ্রা তথা চরিত্রটির পরিণতি এবং নীতিবোধ-এর এই মৃত্যু বাস্তবে হয়তো কাম্য নয়। কিন্তু মানুষের আদিম প্রবৃত্তিজনিত আগ্রাসী ক্ষুধার কাছে মূল্যবোধের মর্মান্তিক পরাজয়ের নির্লজ্জ রূপটি তুলে ধরার জন্য তন্দ্রার হাতে মেজোকর্তার খুন বুঝি বা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। অন্তত ছোটগল্পের আধারে এই তথ্যনিষ্ঠ নাট্যলক্ষণ এক ভিন্নমাত্রায় তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে

সন্দেহ নেই।

কিন্তু মৃত্যু, হত্যা বা চমক সৃষ্টিই জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন, "...'ছিদ্র' গল্পে সংলাপ বেশি, সেখানে বর্ণনার দরকার হয় না, ওটা আপনা থেকেই এসে যায়। কিন্তু 'সামনে চামেলী' গল্পে বর্ণনার দরকার হয়ে পড়েছে। সেজন্য গল্পের সিচ্যুয়েশন বুঝে, মিথ বুঝে চরিত্র সমঝে আঙ্গিক বাছতে হয়। এবং গল্পটা চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তারপর কোথায় শেষ করব আমি সেটাকে আঙ্গিকের মধ্যেই ধরি, তার কারণ সেটা আঙ্গিকের প্রধান অঙ্গ, সেটাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্ব দিই।" (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার)।

কাজেই বিষয় ও চরিত্রের প্রকারভেদে ঘটনার ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের কাঠামোকে সমৃদ্ধ করে।

এই দ্বিতীয় ধারার সর্বোৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে 'প্রতিনিধি', 'গোপন গন্ধ', 'বনের রাজা', 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'গিরগিটি', 'তিনবুড়ি', 'মঙ্গলগ্রহ', 'শালিক কি চড়ুই' ইত্যাদি অসংখ্য গল্পের নাম করা যায়।

'প্রতিনিধি' গল্পে মেসবাড়ির আবাসিক অবিবাহিত শিবেনের প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি প্রণয়তৃষ্ণা এক অভিনব পরিণতির পথে আকর্ষণ করে পাঠককে।

গল্পের প্রথমে দেখা যায় শিবেন জানালায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীর স্ত্রীর নানা বিভঙ্গ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু কোনোরকম ইশারা-ইঙ্গিত, লুকিয়ে প্রেমপত্র দেওয়া কিংবা প্রতিবেশীর কাজের মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে যোগাযোগের চেষ্টা সে করে না। কেবল প্রতিবেশীর বাড়িতে উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ানো বিড়ালকে বিছানায় তুলে আদর করে। কথা বলে।

পরস্ত্রীর প্রতি শিবেনের এই অনুক্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা চরম আর্তিতে পৌঁছয়, যখন দীর্ঘদিন প্রণয়িনীর দেখা না পেয়ে এবং তিনি সন্তানসম্ভবা ও বাপের বাড়ি গিয়েছেন শুনে বিড়ালকে কোলে তুলে নেয়—"ঘরে ঢুকে দেখল বিড়ালটা তার বিছানার ওপর দিব্যি শুয়ে আছে। রাগ করল না সে। দরজা ভেজিয়ে দিল। জানালা ভেজিয়ে দিল। তারপর বিছানায় উঠে বিড়ালটাকে টেনে কোলের কাছে নিয়ে এল। ...কেবল থেকে থেকে শিবেনের গায়ের লোম শিরশির করতে থাকে। শিবেন তাই চাইছিল।"

উল্লেখ্য, গল্পের আগাগোড়া শিবেনের প্রণয়তৃষ্ণাকে লেখক 'সূর্যস্তব'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থিত রমণীটিকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় সব কাজ ফেলে জানালার দৃষ্টিপথে প্রতীক্ষারত শিবেন, শিবেনের মনোলগে প্রেম-পরিণয়ের ভিন্নতর ব্যঞ্জনার বিবরণ ব্যক্ত করতে মোট ১১ পৃষ্ঠার পরিসর বেছে নিয়েছেন লেখক। বিড়ালের রূপকল্পে প্রণয়িনীর সঙ্গসুখের হর্ষ সন্ধানে রত শিবেনকে আমরা সাধারণ প্রেমিকের পর্যায়ে ফেলতে পারি না।

প্রতিবেশীর স্ত্রীর দীর্ঘদিন অদর্শনে আতুর শিবেন যখন বিড়ালের 'পোয়াতি' হবার খবর শুনে তাকে দূর করে দিতে বলে, আবার অদেখা প্রণয়িনীর গর্ভবতী হওয়ার খবরে সেই বেড়ালকেই কোলে তুলে আদর করে, তখন বুঝে নিতে দেরি হয় না এ কাহিনী এক হৃদয়তাড়িত পুরুষের গল্প। প্রেমের জন্য যার অনুসন্ধান আছে, প্রতীক্ষা আছে, আবার

দেহমন বিশিষ্ট প্রণয়স্পর্শে মানবিক পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষাজনিত রোমাঞ্চও আছে। কাজেই শরীরী-অশরীরীর মধ্যবর্তী এই বিচিত্র অতীন্দ্রিয় প্রেমভাবনা রূপায়ণের প্রয়াসে কাহিনীর পরিণতিতে এক মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিনিধিত্বে শিবেনের 'বিপরীত বিহার' গল্পের অনিবার্য গতিকেই সমর্থন করেছে বলে মনে হয়। সর্বোপরি শব্দ ও অনুভবের নিশ্ছিদ্র বিন্যাস বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে গল্পের আঙ্গিকগত ভাবনাকেও।

এ পর্যন্ত আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্রের কাহিনীর গঠন বা কাঠামো (structure), তার বিস্তারনৈপুণ্য শিথিলতার কিছু পরিমাপ পাওয়া গেল। কিন্তু প্রখর সংবেদনশীল জ্যোতিরিন্দ্র শব্দ, গন্ধ ও ব্যঞ্জনার প্রয়োগে প্রতীক, চিত্রকল্প, রূপক, উপমা, কল্পনার যে যথাযথ প্রয়োগ ঘটান, লেখকের রচনাশৈলীর তা-ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং অবশ্য উল্লেখযোগ্য। সর্বোপরি জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার সংলাপ ও ভাষা নির্মাণ তথা গদ্যশৈলী বিপরীত ও বিপ্রতীপ ধর্মী যে অদ্ভুত সংশ্লেষ সৃষ্টি করে, নির্মাণ করে গল্প-শরীরের অন্তর্গত চরিত্র, পাঠককে উপহার দেয় দুরূহ কবিতাপাঠের অভিজ্ঞতা—আলোচ্য পর্বে সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যিক।

'অজগর' গল্পে চিত্রকল্পের প্রয়োগ— "...ছেলেবেলার 'রান্নাবাটি' খেলার বালু কাঁকরের ভাত ও শিউলি পাতার মাছের ঝোল খাওয়ার মতন করে মঞ্জু শুধু ঠোঁট ছুঁয়েই খেল। এতেই তার তৃপ্তি সান্ত্বনা। তারপর মঞ্জুকে বুকে নিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে পড়ল। পাখিদের কুলায় ফেরার মতন রাশি রাশি ঘুম চোখ ভরে নেমে এল।"—কুষ্ঠরোগী বরেনের মৃত্যুদৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। 'বালু কাঁকরের ভাত', 'শিউলি পাতার ঝোল'-এর প্রতিতুলনায় বরেনের প্রেমাস্পদ কল্পমানবী মঞ্জুর প্রেমের নিশ্চিত আশ্রয়ে অনন্ত ঘুম বা পরিতৃপ্তির দেশে পাড়ি দেওয়ার ছবি ফুটিয়ে তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য।

শরীরের মৃত্যু হয়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার নয়। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বরেন অনিবার্য মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছেও যে সুন্দরী ষোড়শী মঞ্জুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয় এবং কেবল মঞ্জুর চিন্তাতেই অনায়াসে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে কিন্তু মৃত্যুতেও প্রণয়স্পর্শ অনুভব করতে চায়—সেই আদি অকৃত্রিম প্রেমের স্বরূপ নির্ধারণে চিত্রকল্পটির যথার্থ প্রয়োগ ঘটেছে এখানে।

চিত্রকল্প দুই : 'শ্বাপদ' গল্পে—"সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।"

—মাথামোটা, গ্রাম্য সরল গণেশকে গাছের প্রতি তুলনায় অরণ্যের চিত্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রামের বোকা ছেলে গণেশের মনে যেমন সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি অথচ তার সবুজ সরলতা, আদিম প্রবৃত্তি তোলপাড় করে নারীকে, তেমনই গাছের সজীবতায় প্রবৃত্তির অরণ্যে দুই মানব-মানবী রুবি ও গণেশের হারিয়ে যাওয়ার দ্যোতনা বহন করে এই চিত্রকল্প।

জ্যোতিরিন্দ্রের কাহিনীতে কল্পনার প্রসার প্রকৃতি বনাম মানবপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করে এক দূরপ্রসারী অধিবাস্তব জগতের সন্ধান দেয় আমাদের।

'পঙ্গু' গল্পে—"...বনের পথ ছেড়ে হরিণেরা ঝর্ণার ধারে ছুটে এসেছে। ...হরিণের পিছে হরিণী, হরিণীর পিছে বাচ্চা হরিণের দল। বন থেকে গভীর বন, অরণ্যের নিঃশব্দ অন্ধকারে ওরা হারিয়ে গেল। ...শুভেন্দুর, যার দু'পায়ের একটা পা ট্রাম থেকে পড়ে কাটা গেছে, এখন এক পা সম্বল করে বিছানায় শুয়ে আছে। সেই শুভেন্দু আজ রাত্রে কার মাংস খেতে চাইছে? হরিণের। সরু অথচ ইস্পাতের মত শক্ত চার চারটা পা নিয়ে চোখের পলকে যে অরণ্যের গভীরে ছুটে যায়। আর সেসব জোগাড় করছে কে? হরিপদ শুভেন্দুর চাকর, যার পায়ের মেদ মাংস শুকিয়ে পাটকাঠির মত খটখটে হয়ে আছে, একদিন হয়তো পট করে দুটো পা ভেঙ্গে ও হুমড়ি খেয়ে পড়বে, মরবে।"

শারীরিক প্রতিবন্ধী শুভেন্দুর মনের প্রসার তথা রোমান্টিক ভাববিলাস কিংবা দুঃখবোধের আচ্ছন্নতা প্রকাশ পেয়েছে বর্ণনায়। যেন বিছানায় শুয়েও হরিণদের লম্বা পা ফেলে ছুটে যাওয়া দেখতে পাচ্ছে সে। অনুভব করছে চলচ্ছক্তিহীন জীবনের শোকস্তব্ধ রূপ।

'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে—"ঠিক করতে পারছিল না সে? এখন ঠিক হয়ে গেছে। দেয়ালে পেরেক ঠুকে ছবিটা ঠিক করে দিয়েছে, এখন আর নড়ছে না দুলছে না। ঘুড়িটা বারবার গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ছিল? কানাভারি হয়ে কাত হয়ে হয়ে চরকির মতন আকাশে ঘুরছিল? সুতো ছিঁড়ে দিয়েছে সে। আপদ গেল। এবার হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশের ঘুড়ি যেখানে খুশি উড়ে যাক। অস্থিরকে পেরেক ঠুকে স্থির করে দেওয়ার মতন চঞ্চলকে বাঁধন ছিঁড়ে আলগা করে দেওয়াও এক ধরনের ঠিক করে দেওয়া।" (পৃ. ১)। ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনে সার্বিক ব্যর্থ কবি রামানন্দ সেনের অশান্ত ক্রোধ, ক্ষোভ ও মৃত্যুচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বর্ণনায়। স্প্রিং কেটে যাওয়া অচল দমবন্ধ ঘড়ি, কানাভারি বেয়াড়া ঘুড়ি ও ঘরের দেওয়ালে ঘযটাতে থাকা নড়বড়ে ছবির রূপকে রামানন্দ সেনের নৈরাশ্য, বিষাদ, ছন্নছাড়া জীবনযাপন এবং নঞর্থক চিন্তায় জীবনের বৃন্তচ্যুত হয়ে অস্থির পলায়নী মনোবৃত্তির ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখের সামনে।

'নীলরাত্রি' উপন্যাসে—"তারিখ দেখা শেষ করে মালা নিজেকে দেখতে লাগল। নিজের আত্মা না মন না হৃদয় না। শুধু শরীর। ...কার সঙ্গে কিসের তুলনা করা যায় চিন্তা করতে করতে উপমাটা মালা আবিষ্কার করল। নরম পায়রার মাংস পাক করার মতন তাপ হলেই তোমার হয়, তার বেশি চাই না, মাংসটুকু উদরসাৎ করে নিটোল এক ঘুমে রাত শেষ করে দিয়ে পরদিনে হৃষ্টমনে অফিস করতে যাবে। শুধু এই। শুধু এই? ..."

'মাংস'-র রূপকে 'নারী' এখানে পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত। উপন্যাসের নায়ক নীরদ বিপত্নীক। বাড়িতে তার একটি পঙ্গু ছেলে রয়েছে। নাম বাবু। নায়িকা মালা বিবাহিতা। স্বামীর অত্যাচারে ঘর সংসার ছেড়ে দাদা-বউদির সংসারে আশ্রিতা। নীরদের সঙ্গে মালার গোপন সম্পর্ক এবং দীর্ঘ অভিসারের পর নীরদ যখন মালাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে, সম্পর্কের মূল্যায়ন হয়ে যায় তখনই। মালা উপলব্ধি করে নীরদের কাছে তার মূল্য কেবল শরীরের। সহায়সম্বলহীন এক নারীর অসহায় অবস্থা ও সমাজ-সংসারের

চোখে তার ধার্য মূল্য নিরূপণে সুস্বাদু, সহজলভ্য নরম পায়রার 'মাংস'-র রূপক ব্যবহার কাহিনীতে মালার অনিবার্য পরিণতিকেই চিহ্নিত করে।

'পঙ্গু' গল্পে—"উত্তর দেয় না শুভেন্দু। চোখ ঘুরিয়ে আবার সে একসঙ্গে নিশ্চল ঘড়ির কাঁটা ও মেয়ের মুখ দেখল।"—কেন্দ্রীয় চরিত্র চলচ্ছক্তিহীন প্রতিবন্ধী শুভেন্দুর নিথর সাংসারিক অবস্থানগত সাদৃশ্য নিরূপণে 'নিশ্চল ঘড়ির কাঁটা'র প্রতীক প্রয়োগ।

'বুটকি ছুটকি' গল্পে—"ক্লাস সেভেনের পড়া অসমাপ্ত রেখে এই গহ্বরে ঢুকেছে পর বাপ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ পেল না কথা বলতে মিশতে।"

—দারিদ্র্যক্লিষ্ট, মাতৃহীন, সঙ্গীহীন, সদ্য যৌবনবতী দুই সুন্দরী বুটকি ছুটকির চোখে তাদের ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের এক অন্ধকার গলির ততোধিক অন্ধকার 'ঘর'কে এখানে 'গহ্বর' অর্থাৎ জনমানব সম্পর্কচ্যুত নিঃসঙ্গ এক গুহার প্রতীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'সামনে চামেলি' গল্পে উপমা প্রয়োগ : 'কানে কানে কথা বলার মতন মূল্যবান গন্ধটুকু'— শব্দ ও গন্ধের তুলনা। 'মেয়েদের মুচকি হাসির মতন একটু সময়ের জন্য ঠাণ্ডা পরিচ্ছন্ন জুঁই-এর গন্ধও টের পাই'—দৃশ্য ও গন্ধের তুলনা। 'ঐ একফোঁটা শব্দকে আড়াল করে সে দাঁড়াতে পারত।'—শব্দ ও দৃশ্যের তুলনা।

'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে : 'কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এপাশ থেকে ওপাশ ফেরার শব্দ।'—শব্দকে স্পর্শে তুলে আনা।

'ট্যাক্সিওয়ালা' গল্পে : 'গলা বাড়িয়ে আবার ওর পায়ের মাংসের গোছা দেখলাম। কেন জানি আমার তখন গরম ফাউলকারীর কথা মনে পড়ে গেল।'—দৃশ্যকে স্বাদে তুলে আনা।

'মীরার দুপুর' উপন্যাসে : 'মীরার বুকের মধ্যে কেমন খুট ক'রে ওঠে। একটু আগে গাড়িতে যা ঘটতে চেয়েছিল তার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে কি।' ... (পৃ. ১৪৫) —দৃশ্যকে শব্দে তুলে আনা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে কোনো উপন্যাস এবং গল্প নির্বিশেষে তাঁর কুশলী ভাষা নির্মাণ ও সংলাপ রচনা পাঠকের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে 'ভাষার কৌশল' ও 'ভাষার রহস্য'—এ দু'য়ের ওপরই জোর দেন তিনি। রহস্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি প্রথমদিকের রচনায় উপমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। ক্রমে উপমা এবং অলংকারের নির্ভরতা ছেড়ে, জ্যোতিরিন্দ্রের কথায় 'পেরেন্টিজম' বাদ দিয়ে যথাসম্ভব 'হ্যাক্‌নিড' শব্দ বাদ দিয়ে খুব 'ফ্রি' 'কমন' অর্থাৎ প্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগে ভাষাকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এগিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে ভাষার কৌশলগত দিক প্রাধান্য পেয়েছে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত। তবে তা কাহিনী ও চরিত্রে 'ইমোশন'কে যাতে প্রভাবিত না করে, দাঁড়িপাল্লার চুলচেরা ওজনে সেই আবেগ ও নান্দনিক সমতার দিকটিও রক্ষা করেছেন লেখক। এ প্রসঙ্গে তিনি কিছুটা হেমিংওয়েপন্থী। হেমিংওয়ে একবার বলেছিলেন, "Sometime I make some technical deficiency in order to make it emotionally more valid."

জ্যোতিরিন্দ্রও এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "আমি অনেককে দেখেছি গল্প লেখার

সময় বিশেষভাবে সচেতন হয়ে যাচ্ছে। এমন শব্দ বসিয়ে দিল যেটা ভাবনার সঙ্গে মেলে না। আমি এব্যাপারে খুব বেশি সচেতন। একটা গেরস্থ মেয়ের চিন্তাধারায় আমি কোন সফিসটিকেটেড শব্দ ব্যবহার করব না। ওই পরিস্থিতি শব্দ টেনে আনবে। আমার নিজের কোনো ইচ্ছে থাকবে না। সেখানে আমি পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করব। .. লেখক কিছু করে না। লেখকের কিছু করার নেই। আমি সেদিক থেকে এখন কিছুটা হেমিংওয়েপন্থী।'' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার)

উদাহরণ : ''হেমকিরণ চুপ করে তাকিয়ে আছে আর শব্দ শুনছে। ছপ্ ছপ্ শব্দ করে রাজলক্ষ্মী খায়। এই শব্দ তারা শুনতে চাইছিল—এই শব্দ। কেননা এখানে জীবন। অন্য সব শব্দ আড়াল করে রাজুকে জীবনের মধ্যে ধরে রাখতে দুই বুড়ীকে কি এতক্ষণ কম পরিশ্রম করতে হয়েছে। এবার তারা নিশ্চিন্ত। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হল। অল্প অল্প হাওয়া।'' (তিনবুড়ী)—এখানে বৃদ্ধা রাজলক্ষ্মীর খাওয়ার 'ছপ্ ছপ্' শব্দের মধ্যে নৌকার দাঁড় বা বৈঠা টানার শব্দগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার খায় দু'ভাবে। গ্রোগ্রাসে গপ্ গপ্ শব্দে। অথবা আভিজাত্যের প্রলেপ মিশিয়ে 'টুকটুক' করে। ইঁদুরের মতো। কিন্তু ভীষণ রকম খিদে বা বনেদিয়ানার চিহ্ন না রেখে লেখক উল্লেখ করলেন 'ছপ্ ছপ্' ধ্বনিটি। অর্থাৎ বার্ধক্যে উপনীত রাজলক্ষ্মী যিনি জীবনের বৃন্ত থেকে খসে পড়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন, নিরানন্দ, বিষণ্ণতা, নৈরাশ্য যাঁর জীবনযাপনের প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে, তাঁরই সমবয়সী দুই সঙ্গিনী হেম ও কিরণের সান্নিধ্যে, যত্ন, আপ্যায়ন ও ভালোবাসায় সেই রাজলক্ষ্মী আবার শিশুর মতো চঞ্চল উদ্বেল হয়ে ওঠেন। অগাধ জলে বৈঠা ফেলে নৌকা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতোই পুনরায় জীবনশক্তিতে তরতাজা হয়ে ওঠা রাজলক্ষ্মীর সহজ সাবলীল আনন্দঘন ছন্দপ্রকাশে অলংকার আড়ম্বরহীন প্রাঞ্জল শব্দের ব্যবহার—'ছপ্ ছপ্'।

আবার শেষ দুটি বাক্যে : 'ফোঁটাফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হল।' 'অল্প অল্প হাওয়া।'—শব্দচয়নের তাৎপর্য লক্ষ্য করার মতো। 'তিনবুড়ী'-র পারিবারিক জীবন এবং বার্ধক্য জনিত সমস্যা থেকে মনের আকাশে যে মেঘ জমেছিল, বাহ্য প্রকৃতিতেও সেই মেঘের আনাগোনা।

আকাশের মুখভার করে থাকার মতোই তিনবুড়ী যখন বিষাদাচ্ছন্ন, সেই সময় রাজলক্ষ্মীর ছপ্ ছপ্ শব্দে দুধখই খাওয়ার অনুষঙ্গে দুই বুড়ীর মনের মেঘ সরে যেতে থাকে। একইসঙ্গে আকাশেও মেঘ কেটে বৃষ্টির সূত্রপাত ও মৃদু হাওয়ার আবহে যেন তিনবুড়ী প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পান। ফিরে পান নিঃশ্বাস নেবার মতো মেঘমুক্ত বাতাস।

'সর্পিল' উপন্যাসে : ''একটা তেতো ঢোক গিলে ঢেমনাও চুপ করে বসে রইল। আর তার কিছু করার ছিল না। উনন নিভিয়ে দিয়েছে। তা হলেও ঘরের ভিতর গরম লাগছিল, দাওয়ার কাছে সরে এসে একটা খুঁটির গায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে সে বসে রইল। রৌদ্র দেখছিল। আশ্বিনের রোদ আগুন ছড়াচ্ছিল। কোথায় যেন একটা টিকটিকি দু'বার ডেকে উঠে তারপর থেমে গেছে। কিন্তু শব্দ করছিল একটা ঘুণ পোকা। যেন চৌকাঠের কাঠ কুরে কুরে খাচ্ছিল আর একটা চাপা ঘুসঘুস শব্দ বাতাসে

ছড়িয়ে দিচ্ছিল।" (পৃ. ১২০)— ঢেমনা চাকরের নাম। সে একসময় কাপড়ের ফেরিওয়ালা ছিল। পরে শৈশবের বন্ধু ধনীপুত্র নিমাইয়ের দাসত্ব গ্রহণ করে মানবিকতার তাগিদে। কিন্তু নিমাইয়ের ক্রমিক ব্যভিচার, বন্ধুকে উপেক্ষা, উদ্ধত ব্যবহার, সর্বোপরি গ্রামের নিষ্পাপ নির্বোধ মেয়ে কুন্তীর সর্বনাশ করে শহরের এক বেশ্যাকে ঘরে তোলা, ও গর্ভবতী কুন্তীর মৃতবৎ অবস্থানের প্রেক্ষিতে বিষাদক্লিষ্ট ঢেমনার মনোবিকলনের বর্ণনা ফুটে উঠেছে আলোচ্য অংশটিতে।

বন্ধু নিমাইকে, খুনের অপরাধে দণ্ডিত নিমাইকে বাঁচাতে ও তার বাবার অনুরোধে শহরে ফেরিওয়ালার স্বাধীন পেশা ছেড়ে গণ্ডগ্রামে নিমাইয়ের সঙ্গে গা ঢাকা দেয় ঢেমনা। কিন্তু নিমাইয়ের চাকরের চাকর বনে গিয়েও কুন্তীকে অথবা বন্ধু নিমাইকে পাপের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না ঢেমনা। উপরন্তু বন্ধুর বাবার অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে যেতেও পারে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঢেমনার অসহায় মানসিক অবস্থা চিত্রণে বিস্বাদ 'তেতো ঢোক' টিকটিকির ডাক শোনার ভয়ংকর নির্জনতা ও ঘুণপোকায় কাঠ কুরে খাওয়ার মতো শরীরের অন্তর্গত চরিত্রে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জাগিয়ে তোলে। বাতাসে 'ঘুসঘুস' শব্দ ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেও ঢেমনার মানসিক অবসাদ তথা জ্বরো আবহাওয়ার অসুস্থ লক্ষণ চিহ্নিত হয় অনায়াসে।

সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও একইরকম সচেতন উদাসীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। বিষয়ের সঙ্গে যায় এবং চরিত্রের সামগ্রিক অভিব্যক্তির সঙ্গে মেলে—এমনই সাবলীল অথচ দুরূহ সংলাপ রচনায় সিদ্ধহস্ত জ্যোতিরিন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে।

'সর্পিল' উপন্যাসে, "...ফড়িং-এর একরকম, মানুষের একরকম। শহরে একরকম, গাঁয়ে একরকম। ...আমি যে কুমারী মেয়ে। ...তাতে কি। হরেক রকমের দাওয়াই সাজানো আছে শহরের ওষুধের দোকানগুলিতে। তোমাকে একবেলার জন্যও অ-কুমারী হতে দেবে না।

—আমি যে বিবাহিত।

—তাতে কি, বাড়ি গিয়ে গা ধুয়ে ফেলবে। কর্তা আপিস থেকে ফিরে এলে মিষ্টি হেসে গরম কফির পেয়ালা হাতে তুলে দেবে। সব দোষ কেটে যাবে।

—আমি যে বেশ্যা।

এই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম। অনেক ঠেকে ঠেকে ..." (পৃ. ৭২) — লম্পট নিমাইয়ের চারিত্রিক তথা সামাজিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয় চিত্রায়ণ এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিটি শব্দে শ্লেষের অনবদ্য প্রয়োগ সংলাপে বিশ্বাসযোগ্যতা এনেছে।

অ্যাপ্রোচ/দৃষ্টিভঙ্গি : তীব্র বৈপরীত্যধর্মী লেখকের সচেতন দোলাচল বৃত্তি, আবেগ-নিরাবেগ, আসক্তি-নিরাসক্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত সংরাগ ও সংহারের যে তীব্র প্যাশনেট বর্ণনা গড়ে তোলে সেখানে লেখকের অ্যাপ্রোচ বা দৃষ্টিভঙ্গি রং, শ্লেষ ও চাপা দর্শনের সম্পৃক্ত রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য বিন্যাসের কথা বলে।

রং : ছায়া ও রোদ, বিষাদ ও বাসনা, হত্যা ও আত্মহত্যার বর্ণনায় স্পষ্ট সাদা

কালো কিংবা সিপিয়া, বাদামী ও জাম এবং কমলা, হলুদ ও আগুন রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসে "...সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত—দুবারই একটা আশ্চর্য ছটা বাড়ির গায়ে এসে লাগে। তাই সকালের দিকে দুধের মতো সাদা ধবধবে সরযূধাম স্থলপদ্মের মতন ঈষৎ লাল হয়ে ওঠে, বিকেলের দিকে রক্তকমলের গাঢ় রং ধরে।" —এছাড়া, 'বনের রাজা' গল্পে ধূসর বাদামী মণি, কালচে ঠোঁট, গাঢ় নীল থুথু, দুধ রং জামরুল, হলদে রঙের গাড়ি, সাদা ধূসর লোমে ঢাকা দাদুর শরীর—উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

শ্লেষ : 'নীল রাত্রি' উপন্যাসে—"এটাই সবচেয়ে নিরাপদ, বুঝলে না? কি, যদি, দরকার হয় সুবিধা বুঝি এখানকার ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি না হয় তোমাদের বরানগরে গিয়ে থাকব। তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি কোন ঘরটর নিশ্চয়ই ভাড়া পাওয়া যাবে। ...না, বলছিলাম কি এরচেয়ে ভাল কিছু ব্যবস্থা হতে পারে না। ওদিকে তোমারও স্বামী সংসার বজায় রইল, অথচ আমাদের—আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝেছ।" —নায়িকা মালার প্রতি নীরদের প্রেমাবেগ অপেক্ষা শ্লেষই যেন কাজ করে বেশি।

'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে দুঃখ আঘাতে ক্লান্ত জর্জরিত রামানন্দর উদ্দেশে শিল্প-সাহিত্যানুরাগিণী রেখার মন্তব্যে দর্শনের আলোকপাত—"আমি নন্দকে তাই বোঝাচ্ছিলাম, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আছে, চিরকাল থাকবে, যখন মাধবী ফোটে তখন গাছতলায় ঝরে পড়া শুকনো বাসি ফুলও কম জমে ওঠে কি! কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি না, বরং গাছের থোকা থোকা রঙিন ফুল দেখে আনন্দে আত্মহারা হই—তাই না রামানন্দবাবু!" (পৃ. ৩২৩)

'সমান্তরাল' উপন্যাসে নারী বনাম প্রকৃতির বর্ণনায় সৌন্দর্যদর্শন : "কচি পাতার রঙের জামা গায়ে। তাই শরীরটাকে বসন্তের নূতন পাতায় মোড়া ঋজু নাতিদীর্ঘ শিশু দেবদারুর মতন দেখাচ্ছিল। যেন ওপরটা কোমল। ভিতরটা কঠিন। গাছের মতন। গাছের ভিতরে শক্ত শাঁস আছে না।

...আমি তার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত ছিমছাম চাঁদের ফালি কপাল দেখছিলাম। চিবুকটাকে মনে হচ্ছিল কোনো কাঁচা ফলের নিচের দিকটা। এখনো সবুজ থেকে গেছে। কেবল আকাশের রৌদ্র শুষে নিচ্ছে। তারপর যখন বর্ষা নামবে তখন প্রচুর বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে ফলের ডাঁশা রং ধরবে। হয়তো তখন স্বাদটাও মিষ্টি হবে। এখন কষায়।" (পৃ. ৪৪-৪৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কনটেন্ট (content) বা বিষয়গত ভাবনায় জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টি কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। যুদ্ধোত্তর কাল এবং তার পরবর্তী সময়সীমায় বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধ্বস্ত ক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন শ্রেণীহীন (classless society) মানুষের কথকতাই তাঁর রচনার মূল উপজীব্য। সেক্ষেত্রে 'মধ্যবিত্তের সংকট' এবং 'মধ্যবিত্তের অভিমান'—এই দুই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে লেখকের বিষয়ভাবনা। আবার এই বিষয়ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত হয়েছে

প্রেম-প্রকৃতি-মনস্তত্ত্ব। প্রসঙ্গত জ্যোতিরিন্দ্রের সৌন্দর্যচেতনা ও ঈশ্বরচেতনাও সমান্তরাল প্রেক্ষিতে আলোচনাযোগ্য। সর্বোপরি 'অন্তর্বাস্তবতা'র (inner-reality) সন্ধান ও 'জাদু বাস্তবতা' (magic realism)—তাঁর সৃষ্টিকে দান করেছে বৈচিত্র্য, সমৃদ্ধি ও বিশ্বাসযোগ্য বৈধতা।

'মধ্যবিত্তের সংকট' এবং 'মধ্যবিত্তের অভিমান' প্রসঙ্গে বলা যায়, সংকট দ্বিবিধ। প্রথমত, দুঃখ দুর্দশার কথা উঁচু গলায় ঘোষণা করতে এরা অপারগ। দ্বিতীয়ত, মাথা নিচু করে অন্ন তথা করুণা ভিক্ষা করতেও এদের মর্যাদা বিপন্ন হয়। আদতে ভঙ্গুর আত্মসম্মানবোধ এবং নিত্য অভাব বা সাংসারিক দারিদ্রের যুগপৎ তাড়নায় মিশ্র চরিত্র এই মধ্যবিত্ত বাঙালি। নিছক প্রাণ ধারণের জন্য ছোটখাটো ছলনা এবং জোচ্চুরির আশ্রয় এরা নেয়। তারপর হাত পাকাতে পাকাতে কখনো দাগী আসামিতে পরিণত হয়। কিন্তু বহিরঙ্গে, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিকের দৃষ্টিতে স্বঘোষিত সততার ভাবমূর্তি (image) ও কৌলীন্য রক্ষা করার প্রয়াসে এরা বদ্ধপরিকর। বলা বাহুল্য, তথাকথিত 'ভদ্রলোক' সাজার চেষ্টায় ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হয়ে যায় মানুষগুলি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাহিনীর এইসব চরিত্র তাই এক একটি নিঃস্বতার প্রতিমূর্তি। 'তারিণীর বাড়ি বদল', 'ভাত', 'মঙ্গলগ্রহ', 'সেই ভদ্রলোক', 'ট্যাকসিওয়ালা', এবং 'লড়াই', 'কলকাতার নট', 'মীরার দপন' 'সূর্যমুখী', 'বারো ঘর এক উঠোন' ইত্যাদি একাধিক উপন্যাস ও গল্পে এই নিঃস্বতার মূক আর্তনাদ ধরা পড়েছে লেখকের নির্বেদ বিশ্লেষণে।

'মধ্যবিত্তের অভিমান' অনেকাংশে কাঁচের পদার্থের মতো ভঙ্গুর। অসাবধানী ব্যবহারে অথবা চাপের মুখে যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে, ধুলোয় মিশে যেতে পারে জেনেও সযত্নে তুলে রাখা। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মায়া-মমতা-মানবমনের এই সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিও অনেক সময় পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে। সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ে যখন আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মরক্ষাই মূল ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়, তখন চাহিদা ও জোগানের আনুপাতিক অসাম্য নষ্ট করে দেয় হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি। মারাত্মক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত মানুষগুলির হৃদয়ে কিন্তু তখনো প্রচ্ছন্ন দম্ভ। ঐশ্বর্যের অধিকার একদিন তারও ছিল। কাজেই ফুটিফাটা সংসারের জোড়াতালি লুকিয়ে রাখার ভীষণ প্রয়াস তখন অভিমানের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পের একটি দৃশ্য উল্লেখযোগ্য —''তুম শালা চোট্টা আছো।' তারিণী কথার উত্তর দিচ্ছে না তাই রামশরণ গর্জে উঠলো। তারিণী প্রতিবেশীদের দরজা-জানালার দিকে একবার সকাতরে তাকালো। তাতে ফল হ'লো না বিশেষ। 'বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছে', নিচু-গলায় প্রতিবেশীরা বলাবলি করছিল, 'ঋণের দায়ে পালাচ্ছে, স'রে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কি আগে জানতাম, না, কোনোদিন এসেছিলো ও কারো কাছে। অমন একটাকা দু-টাকা ক'রে সাহায্য করলেও তো তারিণী অনেকটা হাল্‌কা হ'তে পারতো, পাড়ায় এতজন ছিলুম আমরা।'

তারিণী শুনলো কি শুনলো না ঠিক বোঝা গেল না। 'আত্মসম্মানবোধ টনটনে'। মৃদু-গলায় কে আর-একজন মন্তব্য করলো, 'আটগণ্ডা ছেলেপুলের বাপ, একটা সুবৃহৎ

তরণীর হাল ধ'রে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। চাকরি করছে বাজারে নামও লিখিয়েছে। এখন ওর খুকির দুধের দাম, রেশন খরচের জন্যে আমাদের দরজায়—বুঝলে না?' 'মানুষের দুর্বুদ্ধি'। আব-এক জন প্রতিবেশীব ঘন নিশ্বাসপতনশব্দ শোনা গেলো। কি, তারিণীর ধার করতে যাওয়া, না সে-সব শোধ না ক'রে পালিয়ে যাওয়ার মতলব, প্রতিবেশীদের আলোচনা থেকে এর পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেলো না।"

'কলকাতার নট' উপন্যাসে দারিদ্রপীড়িত নিরন্ন আত্মাভিমানী একদা মধ্যবিত্ত অধুনা বিত্তহীন চরিত্র অবিনাশ চৌধুরীর অভিজ্ঞান, "কিন্তু তা বলে তো আর ফুটো এলুমিনিয়ামের থালা কি কলাইকরা বাসন নিয়ে ফুটপাথের ওপর সে বসে যেতে পারে না। যারা এভাবে বসে গেছে বা বসবার জন্য এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে তাদের সঙ্গে না মিশে একটু দূরে, আলাদা সে দাঁড়িয়ে থাকে।

...সরাসরি কাঙাল হয়ে যেতে আটকায়। এখনও আটকাচ্ছে। কেননা তার গায়ে আজও একটা ছিটের শার্ট, পরনে ধুতি, হতে পারে ছেঁড়া ময়লা, পায়ে একজোড়া চটি। ওদের মতন উদোম গা কি পুরোপুরি নেংটি পরা মানুষ হয়ে যেতে পারেনি। এই জন্য তাকে বিস্তর অসুবিধেও ভোগ করতে হয়। যেমন হোটেলওয়ালা কি খাবারওয়ালা প্রথমটা বুঝতে পারে না এই মানুষ ঠিক ভিক্ষে চাইছে কি না। যে জন্য ভয়ানক সন্দেহের চোখ নিয়ে তারা তার চোখের দিকে তাকায়, তারপর জিজ্ঞেস করে : মশায়ের নাম? নিবাস? কি করা হয়—ইত্যাদি।

..যে জন্য এক একসময় তার ইচ্ছে করে জামাকাপড় ছেড়ে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথার চুলে ধুলোবালি মেখে নেংটি পরে একটা ফুটো মগ কি বাটি হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে আরম্ভ করুক, তাতে কাজ হবে ভাল। অথচ সাহস পাচ্ছে না।" (পৃ ৫৯-৬১)

উল্লেখ্য, সর্বতোভাবে পলকা বা ভঙ্গুরও নয় মধ্যবিত্তের অভিমান। তার পবিচয় পাই 'চোর' গল্পটিতে। আর্থিক প্রতিকূলতা এবং অসম সমাজ ব্যবস্থা সত্ত্বেও আত্মসম্মান বা মর্যাদাবোধ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা লক্ষ কবা যায় কিশোর মিন্টুর মধ্যে। 'চোর' গল্পের কথক ছোট্ট মিন্টুর অভিমান গল্পে সদর্থক চেহারা নিয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ইতিবাচক। আদতে মিন্টুর সংকট বা অভিমান দারিদ্রেব নয়, নিজস্ব পবিধির মধ্যে অবস্থান কবে আপন সীমাবদ্ধতাকে পরিমাপ কবার চেষ্টা। এবং সত্য উপলব্ধির যন্ত্রণা থেকে পলাতক না হয়ে যন্ত্রণার কেন্দ্রে অবিচল ঋজুতায় খাড়া থাকার প্রয়াস-ব্যাকুলতা।

'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রসঙ্গটি আজ বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে নিছক 'বাস্তবতা' বা 'বাস্তববাদ' বললে ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয না। কারণ দৃশ্যজগৎ এবং ব্যক্তিক অনুভূতির প্রেক্ষিতে পরীক্ষিত জগতের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। একজন লেখক কেবল একজন দর্শক নন, পর্যবেক্ষক (observer)-ও বটে। চোখ, কান, নাক ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের মতো একটি যষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও নিয়ত উন্মুক্ত রাখেন তিনি—যা ঘটনা বা চরিত্রের কেবল বাহ্যপ্রকৃতিই নয় অন্তর্প্রকৃতি নির্ণয় করারও ক্ষমতা রাখে। সাহিত্য তাই একটি বিশুদ্ধ সৃজনশীল প্রক্রিয়া, কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয়। লেখক-স্রষ্টার 'কল্পনা' এবং 'কৌতূহল' এক বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে সেখানে। রোজার ফ্রাই বলেছেন,—"We are

given our eyes to see things, not to look at them."

বলা বাহুল্য, এই 'see' এবং 'look' শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগেই শিল্পসৃষ্টির কৌশলটি জানা হয়ে যায়।

বাস্তবিক দৃষ্টি এবং সৃষ্টি দু'য়ে মিলে লেখক। ব্যবহারিক দৃষ্টি এবং কৌতূহলী দৃষ্টি— সৎসাহিত্য সৃষ্টির জন্য দুটোই প্রয়োজন। কেননা দৃষ্ট বস্তুর লেবেল বা শ্রেণী-পরিচয় জানা হয়ে গেলেই ব্যবহারিক দৃষ্টির আগ্রহ ফুরিয়ে যায়। আবার বস্তুর বাহ্য আবরণ ভেদ করে ভেতরের আধারটিকে চিনে নেওয়াই কৌতূহলী (curiosity vision) দ্রষ্টার কাজ।

এখন প্রশ্ন হল, কে কিভাবে দেখেন। আবার, বস্তুজগৎ এবং সাহিত্যের জগৎ-এর মধ্যে দূরত্ব কতটা আপেক্ষিক কতটাই বা ধ্রুব। অর্থাৎ যা কিছু ঘটছে বা ঘটে চলেছে তা-ই সাহিত্যের বিষয় হবে, না লেখক তাঁর মন এবং মননের সূক্ষ্ম মায়াজালে অথবা রোমান্টিক কল্পনার মিশেলে গ্রহণ এবং বর্জন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবধারায় জীবনের লেখ্যরূপ পরিবেশন করবেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, সাহিত্যে ধ্রুবসত্য বলতে কিছু নেই। পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে কিংবা সূর্য পূর্বদিকে ওঠে—এ তথ্য ধ্রুবসত্য হতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে কোনো কথাই শেষ কথা নয়। আজ যা বাস্তব ঘটনা কালের বিচারে তা-ই অবাস্তব হয়ে যেতে পারে। অথবা বর্তমান ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতেও হতে পারে। কিন্তু একই ঘটনা অর্থাৎ শাসন, শোষণ, দারিদ্র, অত্যাচার, ভ্রষ্টাচার-এর চর্বিতচর্বণ দেশকালভেদে পৌনঃপুনিক ধারাবাহিকতায় চলতে থাকলেও তা-ই একমাত্র বা ধ্রুবসত্য নয়।

বস্তুত দর্শনশাস্ত্রের 'realism' শব্দটি থেকে বাস্তববাদের প্রচলন হলেও সাহিত্যে শব্দটির প্রয়োগ ভিন্নধারায় প্রবাহিত। দর্শনের 'রিয়ালিজম' বস্তুকেন্দ্রিক। সাহিত্যে আবার বস্তুজগতের বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে (external reality) 'রিয়ালিজম' বলা হয়ে থাকে। অথচ বস্তুজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা বা অনুকরণ কখনও সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। তা হয়ে পড়ে নিছক প্রচারধর্মী পোস্টার বা বাস্তবের তথ্যচিত্র। কাজেই বাস্তবসত্য ও কল্পনার আপস দু'য়ে মিলেই সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়।

অর্থাৎ সাহিত্যে বাস্তবতা থাকবে। কিন্তু 'বাস্তববাদী সাহিত্য' বলে কিছু থাকবে না। কারণ মানবমনের কিছু চিরকালীন অনুভূতি আছে যা বাস্তব সমাজের অভাব, অসাম্য এবং অনৈতিকতার পাশাপাশি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতোই প্রবহমান। সাহিত্য সেই প্রবহমান শাশ্বত বোধের কথাও বলে। দেশীয় পটভূমিতে একটি নির্দিষ্ট কালের ছবি যে রচনার উপজীব্য, সেখানে বাস্তবতার প্রাধান্য নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়। কিন্তু মানবমনের শাশ্বত অনুভূতিকে তুলে ধরতে হলে প্রয়োজন অন্তর্লোক উন্মোচন। 'ইনার রিয়ালিটি'র সন্ধান। এককথায় অন্তর্বাস্তবতা প্রকাশেই একটি রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার যোগ্য হতে পারে।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'—তখন বুঝি বাস্তবে বা পার্থিব জগতে ফুল ফোটার সমাচার নেই। কিন্তু কবির মনে বসন্তের অভ্যর্থনা সূচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ মরুভূমিসদৃশ কঠোর রুক্ষ বাস্তব আছে, তবু সেখানে

দাঁড়িয়েই কবি তাঁর মনের রঙে সময়কে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন। দৃশ্যজগতের আড়ালে মানুষের চাহিদা ও স্বপ্নের গোপন দাবিটিকেই প্রকাশ করে অন্তর্বাস্তবতা।

একটি নিটোল ছোটগল্প বা উপন্যাস যেহেতু কবিতার মতোই জটিল সংযত ও ব্যঞ্জনাময়, সেহেতু নিছক বাস্তব বা ব্যবহারিক জগতের বর্ণনা কখনো সেই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। নিছক বাস্তবতা তাই জড়বাদী চিন্তার ফসল মাত্র।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে এই জড়বাদী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক। মানবমনের অন্তর্লোক উন্মোচনের প্রয়াসে মুখর হন ভার্লেন, লাফোর্গ, র‍্যাঁবো, মালার্মে প্রমুখ কবিরা। ফলে, বস্তুর বাহ্য আকৃতিব রূপ বদল ঘটে কবির চোখে। যার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় বোদ্‌লেয়ারের সনেটে।

বাংলার কবি জীবনানন্দের রচনাতেও ধরা পড়ল বস্তু ও মনোজগতের রং বদলের চিন্তাশীল প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত বোধের দরজায় অনুচ্চ শব্দে কবাঘাত করতে লাগল। জাগিয়ে তুলল চেতন-অবচেতন মধ্যবর্তী বিচিত্র অন্তর্লীন বহুমাত্রিক জীবনকথা। ফলে, রোদের গন্ধ, কচি লেবুপাতার গন্ধ, নরম ভোর, ধূসব বিকেল, সোনালি সন্ধ্যা কিংবা শিশিরের শব্দের মতন রাত্রি এসে—রূপ-বস-গন্ধময় জীবনের সার্বিক সম্ভার ছড়িয়ে দিল সাহিত্যের বিস্তৃত পক্ষপুটে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখনীও বাস্তবের মাটিতে প্রোথিত অন্তর্বাস্তব জগতের অনুসন্ধান ক্রিয়া। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ভারতের মন্বন্তর, দেশভাগ ও মধ্যবিত্তেব অবক্ষয় তাঁর রচনার পটভূমি হলেও রুক্ষ বাস্তব সমাজচিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি তিনি মানবমনের গভীর গোপন রহস্য উন্মোচন করেছেন নির্ভীক ডুবুরির মতোই। তিনি দেখেছেন বাহ্য প্রকৃতির চাপে মনের পরিবর্তন। কিংবা বাইরে যখন নিস্তরঙ্গ শান্ত হৃদয়, গভীরে তখন অশান্ত ঘূর্ণি। মানুষ-মানুষির অসুখ-অভাবে প্রকৃতির রং পরিবর্তন কিংবা বস্তুজীবনের আলো-আঁধারির প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ স্নায়ুযুদ্ধ। তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল, অন্তর্মুখী স্বভাবের মানুষটি মানবমনের গোপনভাব-বিভাবকে আপাতসভ্য জগতের পাতলা আস্তরণ বা মুখোশ ছিঁড়ে বাইরে এনেছেন চরম নিরপেক্ষতায়। ঐকান্তিক নিষ্ঠায়। অন্তর্লোকের চাপা রহস্য প্রকাশে অনন্য কুশলতায় প্রয়োগ করেছেন তাঁর 'ম্যাজিক আই'। অন্তর্বাস্তবের সন্ধানে তাঁর রচনার ভাষাকে বলিষ্ঠতা দান করেছে জাদু বাস্তবতার ছোঁয়া।

বস্তুত রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রনীতির ছিদ্র বা ক্ষতিকর দিকগুলি সমালোচনার প্রয়াসে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক প্রসূত আমদানি এই 'ম্যাজিক-রিয়ালিজম্'। সরাসরি সমালোচনার সুযোগ না থাকায় কৌশলে, রূপকথার আড়ালে, উদ্ভট কৌতুকের ছলে গোপন সত্য প্রকাশই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। সাহিত্যে শব্দটির অনুপ্রবেশ সেই থেকেই। কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধারায় মর্মলীন চেতনার গুহ্য অথবা খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে ভাষাকে গভীর তাৎপর্য দান করার প্রয়াসে জ্যোতিরিন্দ্রও আশ্রয় করলেন জাদু বাস্তবের কল্পলোক। কাজেই সর্বাঙ্গীণ বিচারে বা তাত্ত্বিক মূল্যায়নে জ্যোতিরিন্দ্রকে কখনোই নিছক বাস্তববাদী শিল্পী বলা যায় না। বরং বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তব সংমিশ্রণে তাঁর রচনার আবেদন জীবনসত্যের জটিল রহস্যের অন্বেষণে বৃত।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে বিত্তবানের প্রতি বিত্তহীনের আক্রোশ-অবজ্ঞা প্রকাশের বাস্তব প্রতিফলন—'' 'আমি বসে আছি কি ঘাস কাটছি তাতে তোর কি? চারু আমার বন্ধু হলেও এখানে সে তৃতীয় ব্যক্তি, কি বলেন আপনি?' চকিতে শিবনাথকে দেখে কে. গুপ্ত বনমালীর দিকে ঘাড় ফেরাল। আমার ইচ্ছা নেই, তাই পারিজাতের ছেলেমেয়েদের ভালতে আমি সাহায্য করছি না। কী হবে লেখাপড়া শিখিয়ে শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে। গলা পর্যন্ত খায়, খাট পালঙ্কে ঘুমোয়। বেশ আছে। বাপের টাকায় এখন ঘি-দুধ খাচ্ছে, বড় হলে মদ খাবে, মেয়েমানুষ পুষবে। সাবেককালে এই করত সব পয়সাওলা ঘরেব ছেলেরা। দেশ ঠাণ্ডা থাকত, শান্তি ছিল ঘরে ঘরে। এখন শালারা লেখাপড়া শিখেই আরম্ভ করে রাজনীতি, ইলেকশন ফাইট, ধুয়ো ধবে সোশ্যাল রিফর্মেশন, সার্ভিস ফর হিউম্যানিটিজ সেক্।'' (পৃ. ১৯২)

'ছাতা' গল্পে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাজাব অর্থনীতির দোলাচল অবস্থা—''লাইব্রেরির বই কেনাব আব একটা মরসুম এসে গেল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। মানুষ গিশগিশ করতো গলিটার ভিতব। গোলক তাকিয়ে দেখছিল একটা ছালবাকল-ওঠা নেড়িকুত্তা ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছে। মানুষ নেই।. পাশের ঘরের ললিত বলছিল স্রেফ চালের জন্য বইয়ের বাজারটা এমন মেদামারা হয়ে আছে, চালের দাম কমলেই বইয়ের বাজারটা উঠবে, একটা বাজাব আর একটা বাজারকে দেখে। কিন্তু ও-ঘর থেকে আর একজন লোটাস পাবলিশার্সের রসিক মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, অসম্ভব, যে হাবে কা:খানায় কারখানায় লকআউট আরম্ভ হয়েছে, দু-মাস অন্তব রাস্তায়-ঘাটে পটকা ফাটছে, ট্রাম-বাস পুড়ছে, রোজ মিছিল বার করার যেমন হিড়িক প'ড়ে গেছে. দেশেব মানুষ এখন বই কিনবে কি, বইয়ের কথা তারা একদম ভুলে গেছে, তাদের মাথায় অন্য চিন্তা দোসরা ভাবনা, বলে কিনা ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই-ই নিয়মমত কিনে দেওয়া হচ্ছে না, তায় কিনা গল্প উপন্যাস—উহু পাঁচ বছরেও আমাদের বাজার উঠবে না নিশ্চিন্ত থাকতে পারো; বুঝলে ব্রাদার, আবো ঘোর দুর্দিন আসছে সামনে।'' (শ্রেষ্ঠ গল্প)

'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে দারিদ্র-জাত শ্রেণীবৈষম্য ও অন্তর্জগতের টানাপোড়েন—''না, রাত্রে ওদেব ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের বেড়ির বাতিব বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যতই উজ্জ্বল ও অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন সকালে, যখন একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও ব'সে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বড়লোক—ভাবলাম—এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা-পড়া পুরোনো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপায় নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হল আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনো যাত্রী এসে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হবো না যে আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্তত এদিক দিয়ে থাকবে না। ধীরে-ধীরে আলাপ-পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই তো স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার আছিলায় ওদিকের

পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।" (শ্রেষ্ঠ গল্প)

'শ্বাপদ' গল্পে বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির মিশ্রণজনিত অবচেতনের গূঢ় সত্য প্রকাশ—"একটা দমকা হাওয়া উঠল, আবার সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। কেননা একটু সময়ের জন্য বাতাসটা কেমন যেন অস্বস্তি জাগিয়ে দিয়ে গেল। ..দুবার আমি রুবির নাম ধরে ডাকলাম, তিনবার গণেশকে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। বা বলা যায় আমার ডাকের উত্তরে আতাবনের ওদিকটা থেকে বাদুড়ের পাখার ঝাপটা ভেসে এল। ...আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম ওরা সেখানে নেই; আবার পেয়ারাতলায় ফিরে এলাম, দীঘির ধারে ছুটে এলাম। জলের বুক কালো হয়ে গেছে। অন্যদিন এসময়টায় ঝিকিমিকি ছবি ধরে রাখে দীঘিটা আরসি হয়ে—আজ সেরকম কোনো ছবি ছিল না, অথবা ছিল, আমিই দেখিনি, দেখাব চোখ ছিল না; চোখদুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠল একটু সময়ের মধ্যে। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে যে-কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি বাগান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ঠিকই হয়েছিল। আর দশজনের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে গিয়ে তা চিবকালেব সত্য হয়ে বইল। ..যাকে বুনো বলতাম গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষেব আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদেব বালিগঞ্জেব ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।" ('শ্বাপদ শযতান ও রূপালী মাছেরা')

তৃতীয় অধ্যায়ে ছোটগল্প আলোচনা পর্বে ম্যাজিক রিয়ালিজম্ বা জাদু বাস্তবতার দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।

আদতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাহিনীতে প্রেম-প্রকৃতি ও যৌনতা মানব-মানবীর নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব ও অস্থিরতাসূচক। তিনি প্রেমের থেকে প্রেমহীনতার কাহিনী রচনা করেছেন বেশি। একটা অস্থির সময় এবং সময়োচিত নাগরিক অসুখ 'এলিয়েনেশন' ও 'এক্সপ্লয়টেশন' তাঁর কাহিনীতে ছায়াপাত করেছে বারবার। তাই প্রেমহীনতা। প্রেমহীন যৌনবিকার, পাপ, হত্যা ও রক্তপাত।

প্রসঙ্গক্রমে 'এলিয়েনেশন' এবং 'এক্সপ্লয়টেশন'-এর ব্যাখ্যা এখানে অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমরা জানি বিচ্ছিন্নতা একটি বোধ। এই বোধেরই ইংরেজি প্রতিশব্দ 'এলিয়েনেশন'। আবার, estrangement, apathy, indifference, non-involvement ইত্যাদি বিযুক্তিবোধক শব্দ প্রয়োগেও 'এলিয়েনেশন'-এর মর্মার্থ ব্যাখ্যা করা চলে। তবে সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা বা এলিয়েনেশন বলতে—বিচ্ছেদ, নিঃসঙ্গতা, আত্মবিস্মৃতি, বিচ্যুতি এবং অনন্বয়কেই বোঝায়। আবার এ কথাও সত্য, একটি 'বোধ' বা মানস অনুভূতির সঠিক ব্যাখ্যা ভাষায় সম্ভব নয়। 'বিচ্ছিন্নতা' একটি আত্মিক সংকট। এই সংকটের সুড়ঙ্গপথে দিশেহারা আধুনিক সভ্যতার প্রতিটি মানুষ। আদতে মানুষ যখন আপন স্বরূপ না জেনে, ব্যক্তি মানুষের সীমাবদ্ধতার সত্য উপলব্ধি না করেই বস্তুজগতের ঐহিক সুখের সন্ধানে হাত বাড়ায়, অথচ প্রতি মুহূর্তে সামাজিক অসাম্য ও দুর্নীতির শিকার হতে থাকে অথবা যাবতীয় ন্যায়নীতি মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে সবকটা সিঁড়ি টপকে সাধারণের উচ্চতা ছাড়িয়ে

হঠাৎই আকাশ সমান লম্বা হয়ে ওঠে—বিচ্ছিন্নতার শুরু সেখান থেকেই। শুরু হয় একাকীত্ব বোধ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, ''মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপনমনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না।''

মার্কসীয় বিচারে আবার 'বিচ্ছিন্নতা' একটি দার্শনিক কথা। শ্রমের মূল্য এবং শ্রমজাত ফসলের অধিকার—এ দুয়ের অনন্বয়ে আসতে পারে বিচ্ছিন্নতা। অর্থাৎ যে বাড়ি মানুষ বানাচ্ছে সেখানে সে থাকছে না, ন্যূনতম মজুরি মিলছে মাত্র। যে ফসল ফলাচ্ছে তার ভাগ সে পাচ্ছে না, চলে যাচ্ছে জোতদারের গোলায়। শ্রমিক-কৃষক নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

মানুষের নির্ভরতা দু'জায়গায়। সে একদিকে সমাজ নির্ভর আর একদিকে প্রকৃতি নির্ভর। সমাজ তার কাছে কী চায় কিংবা সে নিজে সমাজকে কী দিচ্ছে তার যথার্থ মূল্যায়ন ব্যতিরেকে মানুষ যখন নিজের সুখ-সুবিধা স্বার্থসিদ্ধির দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে তখনো সে বিচ্ছিন্ন। আবার, যে-পটভূমিতে তার বাস, যে পরিবেশের বৃত্তে তার আবর্তন—তার মূলকেন্দ্রের সঙ্গে অপরিচয়ও বিচ্ছিন্নতার নামান্তর। মুখ্যত সমাজ এবং পরিবেশ—উভয়ের মিলিত যোগফল নিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিচয়।

মার্কসও মানুষ এবং জগৎকে সমান মর্যাদায় দেখেছেন। তিনি মনে করেছেন মানুষ যখন তার পরিপার্শ্বের মধ্যে নিজের পরিচয় উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তার যথার্থ বিকাশ। নচেৎ সমাজ প্রেক্ষিতে নিজেকে আবিষ্কারের ব্যর্থতা বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন করবে তাকে। নিজেকে তখন সে সামাজিক ও জাগতিক সমগ্রতা থেকে সরিয়ে নিতে থাকবে। গুটিয়ে নিতে থাকবে। তলিয়ে যাবে পাতাল অন্ধকারে। মহাশূন্যের গর্ভে।

আবার, প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ দান জল-আলো-হাওয়ায় সমৃদ্ধ মানুষ যখন ইট-কাঠ-কংক্রিটের জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায় তখনো সে বিচ্ছিন্ন। বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ, ঝিঁঝি-র ডাক, শিশিরের টুপটাপ শব্দ, ভরাকোটালে সমুদ্রের রূপ, বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রং পরিবর্তন যে না দেখেছে সভ্যতার অন্দরে তার নীরব আর্তনাদ বিচ্ছিন্নতারই বাণী বহন করে।

আদতে যে কোনোপ্রকার বিচ্যুতি, বিচ্ছেদ, ভাঙন এবং অপরিচয় জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতাবোধের। নাগরিক সভ্যতার সবথেকে বড় ট্র্যাজেডি হল এই বিচ্ছিন্নতাবোধ। মানুষ যেদিন থেকে কমোডিটি (commodity) বা পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, সেদিন থেকেই এই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত।

লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো অর্থবহ। বাহ্যজগতের ক্রমিক অবক্ষয় এবং প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের টানাপোড়েনে সমাজসংস্রব থেকে বিচ্যুত হয়ে শান্তির প্রত্যাশায় শিল্পী গড়ে তোলেন নিজস্ব এক বলয়। ধ্যানের এক স্বতন্ত্র জগৎ। স্পেণ্ডার বলেছেন, ''Poets prefer losing themselves within themselves to

losing themselves outside themselves in external reality."

বাস্তবিক, বহির্বিশ্ব অপেক্ষা নিজের অন্তর্লীন আশ্রয়ে স্বেচ্ছাবন্ধী হওয়াকে কবি-সাহিত্যিকের দল ঢের বেশি শ্রেয় মনে করেন। কারণ তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি। তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধ। সমাজ-সংসারের নশ্বরতা ও অনিশ্চয়তা তাঁদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে যে বিষণ্ণতা বা অবসাদ, মনের সেই অনন্বয়ের স্তর থেকেই পার্থিব জগতের আড়ালে মনকে সরিয়ে আনেন তাঁরা। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আশ্রয় নেন কল্পনার জগতে। হয়তো সকলের ক্ষেত্রেই সত্য নয় এ তথ্য। কল্পলোক ও মননের সংমিশ্রণে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশও বিরল নয়। তবু কমবেশি বিচ্ছিন্নতাবোধআক্রান্ত প্রতিটি মানুষ। কারণ মানুষ যত জ্ঞানী ও সভ্য হতে থাকে তার অভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্যের দরুন, তথাকথিত গণ্ডিবদ্ধ সমাজ সংসারের সঙ্গে ইনভলভমেন্ট বা সংযোগসূত্র ততই শিথিল হতে থাকে।

লেখক সামাজিক জীব বলেই সমাজ জীবনের অনন্বয় ও বৈসাদৃশ্যজনিত বিচ্ছিন্নতার শিকার হতে হয় তাঁকেও। আবার, সমাজজীবনে যখন আগুন জ্বলছে, তখন কেউ যদি ঘরে বসে নিছক প্রেমের কাব্য রচনা করেন—সেই প্রেমের কবিতাও নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্নতার ফসল। বিশ শতকের গোড়া থেকেই বিক্ষিপ্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অশান্তি অবক্ষয় এবং বিষণ্ণতা মানুষের মনে বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। ঘুণপোকার মতো কুরে খাচ্ছিল তার হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম দরজাটিকে। বাণিজ্যিক লেনদেন সর্বস্ব বাজারমুখী জীবনে হৃদয়বৃত্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ বা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল অনিবার্য উদাসীনতায়। আবার, নিছক বুদ্ধির প্রয়োগে সৃষ্টি বা জীবনের স্পন্দন ব্যাহত হয়। ফলে, সমাজ সংসারে নিজের কাজের সঠিক মূল্য বা সার্থকতা খুঁজে না পাওয়ায় হতাশা ও বিষাদের শিকার হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ তথা লেখক-বুদ্ধিজীবীর দল।

কবি জীবনানন্দের বেদনাহত জিজ্ঞাসা ছিল—"...সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?/আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?/আমার পথেই শুধু বাধা?/ .—তবু কেন এমন একাকী?/তবু আমি এমন একাকী!/...মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়— কোনো এক বোধ কাজ করে।/আমি সব দেবতারে ছেড়ে/আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,/বলি আমি এই হৃদয়েরে :/সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!" (বোধ : ধূসর পাণ্ডুলিপি)

বিচ্ছিন্নতাবোধের এ এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। লক্ষণীয় 'একা' শব্দটি চারবার ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে। প্রথাসিদ্ধ প্রাত্যহিক জীবন ও ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বভাবধর্মে বিচ্যুত কবি যেন নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধেই আলাদা হয়ে গেছেন। ছিটকে গেছেন মূল স্রোত থেকে। পৃথক সত্তার নির্দেশে বৌদ্ধিক জগৎকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি হৃদয়ের সঙ্গেই কথা বলায় প্রবৃত্ত হন আবার হৃদয়কেই তিরস্কার করেন তার ভ্রূক্ষেপহীন গতিবিধির জন্য। জীবন ও কর্মাদর্শের অনন্বয় সঞ্জাত এই বিচ্ছিন্নতাবোধ আদতে এক হৃদয়বৈকল্যেরই ফসল—এ কথা জানাতে ভোলেননি কবি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাহিনীধারায় এলিয়েনেশনের শিকার এমন একাধিক চরিত্র বা ঘটনাসমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়, যারা জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনো উপলব্ধির ধারক

না হলেও স্বভাবধর্মে বিচ্ছিন্নতার শিকার। জীবিকার তাগিদে, দৈনন্দিন জীবনযাপনের তাগিদে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে সমাজ-সংঘর্ষের মুখোমুখি হয় তারা। অন্তর্গত চরিত্রে ভীরু দুর্বল হয়েও লড়াই বা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু প্রত্যক্ষত সংগ্রামে লিপ্ত হতে না পারার বেদনা ও চারিত্রিক অসহায়তা তাদের বিচ্ছিন্ন করে। ক্লান্ত করে। আইডেনটিটি হারায় তারা আপন ব্যক্তিস্বরূপের কাছেই। দ্বিতীয় সত্তাকে শনাক্ত করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। নিরন্তর দুঃখ-শোকের ক্ষতমুখ ছুঁয়ে থাকার ভয়ংকর বিষাদময়তায় ঘটে যায় অনিবার্য মনোবিকলন।

পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার অভাবও জগৎ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে মানুষকে। একটি ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু সমাজের দুঃস্থ কুশীলব জ্যোতিরিন্দ্রের চরিত্ররা দুটি ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের চাহিদায় প্রায়শ পাপের পথে পাড়ি দেয়। ক্রমাগত দুর্নীতিমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। বিস্মৃত হয় সুস্থ জীবনের 'কোড অফ কনডাক্ট'। লিপ্ত হয় প্রেমহীন যৌনসঙ্গমে। অথবা ভালোবাসাহীন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়। একটি খুন বা হত্যার রক্তাক্ত অধ্যায় সূচনা করে।

আবার, ব্যক্তিজীবন এবং সামাজিক পটভূমির দ্বৈরথ যুদ্ধে কাহিনীস্রষ্টা বা শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নিজেই এক বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার। 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসের রামানন্দ সেনের মতোই। এক সংখ্যালঘু স্বতন্ত্র চরিত্রের জ্যোতিরিন্দ্র সৃষ্টির যথার্থ মূল্য পান না সমাজের কাছে। পাঠক মনোরঞ্জনের দায় তাঁর নেই। পাঠকের কথা ভেবে তিনি লেখেন না। তাঁর সৃষ্টির প্রথম ও শেষ পাঠক তিনি নিজেই। একটি তমসাচ্ছন্ন সময়ের ক্যানভাসে কালির সূক্ষ্ম আঁচড় দিতে দিতে যখন অবশেষে ছোট্ট আলোকবিন্দুর উদ্ভাস ঘটান, তখন সেই আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়ে শিল্পী দেখেন এক বুক শূন্যতার মাঝখানে তিনি একা। নিঃসঙ্গ, তবু প্রেম-প্রীতি-মমতায় ভরা একটি ভালোবাসার ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন প্রেমিক শিল্পী। এই সত্যই তাঁর প্রেম-অপ্রেম মূলক কাহিনীর উপজীব্য।

ক "অমিয় একা একা বেড়ায়। তেমনি ছেলেমেয়েরা। কারো সঙ্গে যোগ নেই। হয়তো এটাই আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলা। বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা। কারো গায়ের সঙ্গে কেউ লেগে থাকবে না। যার যখন খুশি বেড়াতে বেরোবে কি চুপ করে ঘরে বসে থাকবে, কি খবরের কাগজ পড়বে বা সেলাই করবে বা রেডিও শুনবে।" (শেষ বিচার : পৃ. ৬)

খ. সব শালা এ-বাড়িতে, এ-পাড়ায় স্বার্থপর। ...বলাই-এর গলার স্বরে সারা বাড়িটা গুমগুম করছিল। যেন এ-কথার উত্তর দিতে কেউ নেই। সব চুপ। প্রতিবাদ করতে গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। বস্তিবাড়ির দস্তুর। ...আজ সন্ধ্যাবেলা রুণুকে ওরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং অক্সিজেনের জোরে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে, সংবাদটা বুড়ীর কানে পৌঁছে গেছল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু ডুকরে বেশিক্ষণ কাঁদতে পারেনি প্রমথর দিদিমা। সেই ঘরের পুরুষ বুড়ীকে সাবধান করে দিয়েছে: 'দরকার নেই অত আত্মীয়তা ফলিয়ে। গেছে অমুক নম্বর ঘরের লোক গেছে, আমাদের

কি—শহরে, শহরতলিতে রাতদিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। ...তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে পুলিস এন্‌কোয়ারি আছে, জিজ্ঞাসাবাদ আছে, অমুক ঘরের ছেলে, তোমার কে হয়, তুমি কে.— ওদের সংসারে রোজগেরে নেই. তো দিনের পর দিন খাচ্ছে কি, উপার্জনের রাস্তা কোনটা—'...সুতরাং চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রমথর দিদিমা আর কাঁদেনি।" (বারো ঘর এক উঠোন : পৃ. ২১৫)

গ. "একটা ক্লান্ত হাসি তার ঠোঁটের প্রান্তে লেগে রইল। আজ নিজেকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। এই পরিমলকে দেখতে সে প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত সে কি আশা করেছিল তাও যেন এখন মনে করতে পারছে না। তা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে হাতড়াবার মতন জেলের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু হতাশ হল। কত তাড়াতাড়ি সে সব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে নির্মমভাবে সে নির্বাসিত হয়েছে। তাই এত অসহায় বোধ করছে। যেন তার দিকে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নাই। বড় নিঃসঙ্গ একাকী এখন পরিমল।" (প্রেমের চেয়ে বড় : পৃ. ৬৬)

বৌদ্ধিক চাতুর্যের মায়াজাল বিস্তার করে মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতার মধ্যে নিহিত রয়েছে 'একস্‌প্লয়টেশন' নামক গভীর অসুখটির মর্মকথা। এই পণ্য বাজারে বিবেক, মনুষ্যত্ব এবং যৌনতার মতোই ভালোবাসাও বিক্রয়যোগ্য। ভয়ংকর লোভ এবং শঠতা এই বাজারের নিয়ন্ত্রণশক্তি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কাহিনীতে ভাববৈষম্যহীন বিপথগামী চরিত্রগুলি এই এক্‌সপ্লয়টেশনের শিকার হয় অতি স্বাভাবিক ক্রিয়ায়। যুগধর্মের অনিবার্য নির্দেশে।

উল্লেখ্য, বুদ্ধির জমকালো প্রচার কখনোই অভিপ্রেত ছিল না লেখক এবং ব্যক্তি জ্যোতিরিন্দ্রের। তাতে জীবনের সুস্থতা নষ্ট হয় বলে তিনি মনে করতেন, অথচ অসুস্থ সমাজনীতির সঙ্গে যুঝতে জটিল মানসক্রিয়া অনিবার্য হয়ে পড়েছিল বিশ শতকের জীবন তথা সাহিত্যে। ব্যক্তিসাধারণের ছোটখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষা লোভ চরিতার্থ করতে বুদ্ধির জটিলতা ভিন্ন পথ ছিল না। কাজেই অসম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অসম যুদ্ধের জন্য দেখা দিয়েছিল ছলে অথবা কৌশলে একে অপরকে 'ব্যবহার'-এর ঘৃণ্য তিক্ত জৈবিক বিকার।

ক. "নিশ্চয়ই। আর দরজায়-দরজায় নয়, যে-দরজায় তার যাওয়া সাজে, যেখানে আকাশ এখনো অভিমানে নীল হ'য়ে আছে, যে নিঃসঙ্গ ঘরের ছায়ায় ভালোবাসা মৃতবৎসার মতো প'ড়ে আছে, মীরা সেই ঘরের দরজায় টোকা দেবে, হাত পাতবে, 'ওঠো', 'জাগো', ব'লে চিৎকার করে সারা দুপুর কাঁদবে। শুধু আজ নয়, কাল, পরশু— এখন থেকে রোজ মীরা অমরেশের কাছ থেকেই টাকা আনবে। এনে হীরেনকে খাওয়াবে। আর-কিছু করার নেই তার—আর-কিছু করতে সে জানে না। যন্ত্রচালিতের মতো মীরা বাসের পাদানিতে পা বাড়ালো।" (মীরার দুপুর : পৃ. ৮০)

খ. "তপতী বলেছিল, কেবল শিল্পী ও গুণীদের ডাকা হোক। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যারিস্টার জজ ডেকে কি হবে। বিভাবতী তপতীকে ধমক লাগাল। 'এখানে তোমার লেখাটাই সব নয়। কেবল তাঁরা তোমার এবং তোমার চার-পাঁচটি বন্ধু-বান্ধবীর গল্প

শুনবেন বা সাহিত্য আলোচনা করবেন—আর এর জন্য এত টাকা খরচ করে আমি গ্রীষ্মবাসর ডাকছি তা কখনও মনে ভেবো না। আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে—আমার আরও উদ্দেশ্য আছে বড়লোক আর তাঁদের ছেলেদের ডেকে সন্দেশ ফল খাওয়ানোর।'
'...তার মানে এখন আর নিছক সাহিত্য-প্রীতি নয়—একসঙ্গে দু'কাজ সারবার মতলব?'
নিশ্চয়। মা বলছিলেন, 'তোমার কি, তুমি ব্যোমভোলা মানুষ। আমাকে সব সময় ভাবতে হচ্ছে, তপতী বড় হয়েছে, তপতীর বিয়ে—'' (গ্রীষ্মবাসর পৃ. ৫৭)

বস্তুতপক্ষে বিকল সময় এবং সমাজের চালচিত্রে 'এলিয়েনেশন' এবং 'এক্সপ্লয়টেশন' জ্যোতিবিন্দ্রের কাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করলেও লেখকের বিশুদ্ধ প্রেমভাবনাকে তা চাপা দিতে পারেনি। কারণ প্রেমের ক্ষেত্রে এক অখণ্ড শিল্পদর্শনে বিশ্বাসী জ্যোতিরিন্দ্র। নাগরিক জীবনে প্রেমের ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের কথা যেমন বলেছেন তেমনি প্রেমের সর্বজনীন রূপটিও তুলে ধরেছেন। সে প্রেম শিল্প-সৌন্দর্যের কথা বলে। নর-নারীর প্রচণ্ড জীবনপিপাসার কথা বলে। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যদর্শনে মুক্তি পায় সে প্রেম।

ক ''আক্রোশ? যেহেতু বেড়াচাঁপার এসে দেখলাম আমার প্রথম প্রেম একটা মাটির ডেলা হয়ে গেছে, বা রসকসহীন একটি গ্রাম্য যুবক ছাড়া আর কিছু তাকে এখন বলার নেই, অথবা নীতিবাগীশ হবার জন্য বাইশ বছরের যুবক প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাই কি রাগে, দুঃখে দুরন্ত আক্রোশের জ্বালায় কাঁকড়ার মতন আমি আমার দ্বিতীয় প্রেমকে আঁকড়ে ধরলাম?'' (দ্বিতীয় প্রেম : পৃ ২)

খ. ''ভালবাসার একটা সমুদ্র বুকে নিয়ে রনধীরের স্ত্রী রাণীরবাগের সেই ঘরে বসে আছে। বাইরে যেতে তার ইচ্ছা করে না। কেবল ঘর গুছোচ্ছে ঘর সাজাচ্ছে, ঝি চাকরকে সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতে রান্না করছে, আর এসব করার পর যদি হাতে সময় থাকে, তখন গোলাপবাগানে গিয়ে প্রাণভরে গোলাপের গন্ধ শুঁকছে।

...তাই খরগোসের বাচ্চাকে সীতাংশু ভালবেসে ফেলেছিল শুনে মহিলা চমকে উঠল না। হাসল না। ঠাট্টা করল না। কেননা, সব ভালবাসাই তার মনে ঝঙ্কার তোলে। ভালবাসার নেশায় যুবতী বুঁদ হয়ে আছে।'' (ঝড় : পৃ. ৭০)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সৃষ্টিকর্মের সামগ্রিক বিচারে প্রকৃতিকে বিশ্লিষ্ট করে দেখবার কোনোই অবকাশ নেই। প্রকৃতি তাঁর রচনায় অনুসঙ্গ মাত্র নয়। বলা যায়, প্রকৃতি ও মানবজীবন সেখানে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত। দিনরাত্রির সীমারেখায় আবর্তিত মানবজীবনের প্রতিটি সংরাগের মতোই প্রেম-ঘৃণা-ঈর্ষা-বিষাদ, অশ্রুপাত, বিবেকহীন যৌনবিকার—জন্ম ও মৃত্যুর ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে চলে প্রকৃতি। এই বিশ্বাসই লেখকের আশ্রয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির আশ্রয়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো একটি কাহিনীর কথাও ভাবা যায় না জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায়। সে অর্থে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরোপুরি বিচার্য না হলেও, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা রসসাহিত্যধারায় 'ন্যাচারালিজমের' মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রের রচনাতেই।

মুখ্যত, ১৮৫০ সালে ফরাসি উপন্যাসক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদের প্রথম প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা।

বাস্তববাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিতেই উদ্ভব এই প্রকৃতিবাদের। উদ্‌গাতা নিঃসন্দেহে ফ্লোবেয়ার (যদিও তিনি বাস্তববাদের প্রবক্তা হিসেবেই পরিচিত)। মাদাম বোভারির রচনায় এই প্রকৃতিবাদের স্বাদ ফরাসি উপন্যাসের কক্ষপথে সূচনা করে দুঃসাহসিক পালাবদল। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হন বোভারি। আরো আগে শিল্প-সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ নিয়ে প্রথম কথা বলেন দার্শনিক মনোবিজ্ঞানী হিপোলাইট টেইন। ১৮৮০ সালে এমিল জোলার 'The Experimental Novel' রচনাটি প্রকৃতিবাদের ম্যানিফেস্টো হিসেবে গৃহীত হয়।

প্রকৃতিবাদকে কেউ কেউ যথাযথবাদ বা পরিবেশবাদ বলেও আখ্যা দিয়েছেন। কারণ পরিস্থিতি বা পরিবেশের নির্ভুল আলোকচিত্র বা ফোটোগ্রাফি তুলে ধরাতেই বিশ্বাস তাঁদের। সেক্ষেত্রে কেবল জগৎ ও জীবনের পর্যবেক্ষণ নয়, চরিত্রসমূহের রুচি, আবেগ ও সংবেদনশীলতার অনুপুঙ্খ সংকলনের মাধ্যমে রসায়নবিদের মতো বস্তুজগতের কারবারী হবেন একজন প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিক। আদতে প্রকৃতিবাদীর মূল বক্তব্য হল:

ক. মানুষ নিয়তির কাছে অসহায়, তারা সব Helpless products of heredity and environment.

খ. দেহজ কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও তার জড় বিধান মানবজীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ শক্তি।

গ. মানুষের জীবনে অলৌকিকতার কোনো স্থান নেই। তার কর্ম, জীবনযাপন সবই কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত।

বলা বাহুল্য, প্রকৃতিবাদীদের সবকটি লক্ষণ জ্যোতিরিন্দ্রে বর্তায় না। তাঁর কাহিনীতে প্রকৃতি নিজেই একটি চরিত্র। ঘটনাবলির মূল আবহ। নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কোথাও চরিত্রের আত্মগত সুখ-দুঃখ ও বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতার ধারক তথা আধার হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। জ্যোতিরিন্দ্রের কাহিনীতে আদ্যন্ত প্রকৃতির প্রচ্ছদ। তবু প্রকৃতিকেই তাঁর কাহিনীর একমাত্র নিয়ন্তা বলা যায় না। আদতে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনে আপ্লুত জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টিতে কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম রোমান্টিকতার বিরোধাভাস। একদিকে মানুষের দুঃখ শোকে বিবিক্ত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট প্রকৃতি। অন্যদিকে সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার নিঃসীম প্রকৃতি। জ্যোতিরিন্দ্রের চরিত্ররা কখনো কখনো সব অসহায়তা ও নিয়তির নির্দেশ অমান্য করে আত্মানুসন্ধানের পথে পাড়ি দেয়। সেই আত্মানুসন্ধান ঐশ্বরিক শক্তি বা আধ্যাত্মিক সন্ধানে মুক্তি পায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিতে যা অলৌকিক বা কার্যকারণ সম্পর্কহীন।

জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতিভাবনা বিশ্লেষণে যাঁর নাম অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তিনি নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সৃষ্টির গতি-প্রকৃতিতে বিভূতিভূষণের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কোনো অর্থেই তুলনীয় নন। পার্থক্য দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেন শিশুর দৃষ্টিতে। কখনো সহজিয়া বাউলের মতো। তাঁর 'প্রকৃতি' সহজ, সাবলীল। জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃতি জটিল মর্মযন্ত্রণার ধারক। মানুষের অসুখ করলে প্রকৃতিরও অসুখ করে। তাঁর প্রকৃতিতে তাই প্রায়শই হলুদ পাতার বিবর্ণতা। সর্বোপরি জ্যোতিরিন্দ্র প্রকৃতিকে দেখেন পুরুষ প্রেমিকের দৃষ্টিতে। নারী ও প্রকৃতি তাঁর কাছে একই সত্তার দুটি রূপ।

'পঙ্গু' গল্পে প্রকৃতির সাহচর্যে এক পুরুষের উষ্ণ আলাপন—"সিগারেট শেষ করে শুভেন্দু হেমন্তের বেলাশেষের রোদ দেখতে লাগল। রূপসী রোদের হলুদ বর্ণ গাঢ় হয়ে এখন কমলা রং ধরেছে। লম্বা আঙুল বাড়িয়ে শুভেন্দুর বিছানা ছুঁই ছুঁই করছে। আর দশ মিনিটের মধ্যে ও এসে বিছানায় উঠবে, শুভেন্দুর বুকের ওপর কাটা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়বে। রক্তহীন শীতল একটা দেহকে উৎসাহিত করতে রূপসীর চেষ্টা কি কম। কৃতজ্ঞ গাঢ় দৃষ্টি মেলে শুভেন্দু অনেকক্ষণ ধরে উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন রৌদ্ররেখা দেখল। তার বিছানা তার শরীর গরম করে রোদ এক সময় মিলিয়ে গেল।" ('খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পগ্রন্থ)

'বৃষ্টির পরে' গল্পে মানবমনে প্রকৃতির প্রভাব—"যেন জেনে শুনেও আমি বন্ধুকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে এনে বসালাম। ওই তো বসে আছে সে। স্থির স্তব্ধ। চোখ বুজে সিগারেট টানছে। আমি জানতাম, আমার লন-এর কৃষ্ণচূড়ার ম্লান বিষণ্ণ চেহারা, আমার বাগানের বকুল চাঁপার দীর্ঘশ্বাস, আমার ছাদের ওপরকার আকাশের ধূসর রং প্রভাতের মনের ওপর সুন্দর কাজ করবে। তার ঔদ্ধত্য চঞ্চলতা ঈর্ষা বিদ্বেষ থাকবে না। থাকল না তো?" (নির্বাচিত গল্প সংকলন)

'গাছ' গল্পে নাগরিক ক্লান্তিতে প্রকৃতির আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা—"ইট, লোহা, সিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।" (নির্বাচিত গল্প সংকলন)

জ্যোতিরিন্দ্রের ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ব নির্ভর কাহিনীগুলিতে মানব-মানবীর সংগুপ্ত যৌবনবাসনা বা যৌনতা চিত্রণ পাঠকের কাছে স্মরণীয় উদ্ভাব। লেখক বিশ্বাস করেন, মানব মনের অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলির মতো যৌন প্রবৃত্তিও এক স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু সচেতন শিক্ষার অভাবে, নৈতিক মূল্যবোধের অভাবে অসংযত চিত্তের বিকার যখন দেখা দেয়, যৌনতা তখনই 'পার্ভার্সন' (perversion)-এ পর্যবসিত। এহেন মনোবিকলন-এর একাধিক কাহিনী রচনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। কিন্তু কখনোই শৃঙ্গাররসের অনর্থক বর্ণনা বিস্তারে মুখর হননি। তিনি বলেছেন যৌনবাসনার কাছে অসহায় আত্মবিসর্জনের কথা।

আদতে 'মরমিড' এবং 'মরোজ' অর্থাৎ বিকৃত ও বিষণ্ণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র জানাতে চেয়েছেন অবসাদগ্রস্ত, সংগ্রামবিমুখ, বৈচিত্র্যহীন, অবক্ষয়ী জীবনে সেকস বা অবাধ যৌনাচারের ঘোলাজল ঢুকে পড়তে বাধ্য। কারখানার কুলি বা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে শুঁড়িখানায় হল্লা জমানোর মতোই আর্থিক ও সামাজিক সমস্যাভারে জর্জরিত বেকার, দিশেহারা, গৌরবহীন মানুষগুলির অবৈধ যৌনসংসর্গে লিপ্ত হওয়াও এক ধরনের আত্মবিস্মরণ। আত্মহননের নামান্তর। আবার স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিকযুগলের আবেগঘন মিলনদৃশ্যে সেক্স-এর ভূমিকা এক অনিবার্য সত্য। মধুর, বাঙ্ময়—এ কথাও জানাতে ভোলেন না জ্যোতিরিন্দ্র। তিনি বিশ্বাস করতেন সুস্থ যৌনজীবন দীর্ঘতর করে মানুষের আয়ু।

ক. "যেন আমি চাইছি কেবল পরিমলকে নয় নীলাদ্রিকে নয়। দুরন্ত হাওয়ার মতন আরো পুরুষ আসুক আমার জীবনে। আর ঐ কালো ভোমরার মতন স্থির থেকে তাদের সব দুরন্তপনা উপভোগ করব। ...তাই আজ অশ্বত্থতলার ছায়ায় একটা কিশোর যখন পুরুষের লোভ নিয়ে, লালসা নিয়ে মুঠো করে আমার হাত ধরে কোলের ওপর টেনে নিল, অসহ্য সুখে আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল। ...আর দ্বিধা করলাম না। দু'হাতে তার মাথাটা জড়িয়ে ধরে আমার বুকের ওপর চেপে ধরলাম। কেমন নির্জীব হয়ে রইল সে একটু সময়।" (নাগকেশরের দিনগুলি : পৃ. ৯৫)

খ. "স্নান হয়ে গেলে মেনকা ফরসা সুন্দর হাত দুটো নেড়ে নেড়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দেয়। তখন যদি বাইরের মানুষ, যেমন নিবারণের সঙ্গীরা, মেনকার চেহারা দেখত। কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠা ওর সুন্দর চোখ দু'টোতে পরিপুষ্ট অধরের বাঁকে বাঁকে ফুটে ওঠে। যেন দরকার হলে তোয়ালে ফেলে দিয়ে মাথার নিবিড় ঘন চুল দিয়ে পাথুরে শরীরটার সবটুকু জল শুষে নেবে ও। যেন একটা মূল্যবান পাথর যত্ন করে তুলে রাখবে বলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিল মেনকা।" (সমান্তরাল : পৃ. ৭৮)

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় বিশ শতকের চারের দশকের শুরুর লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাঁচের দশকে এসে গল্পের বিষয়-পরিধি বিশেষ বাড়াতে না পারলেও সমকালীন জীবন ও সমস্যাকে তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাধর্মী কাব্যগন্ধী লেখনীতে তুলে ধরেছেন। সমাজ এবং বৃহত্তর পৃথিবীর বুকে যাদের জীবনযাত্রা কোনো গূঢ় বার্তা বহন করে না, তাদের রেখাপাতহীন নিরাবয়ব অভিব্যক্তিকে কলমের দু'একটি খোঁচায় সূক্ষ্ম আঁচড়ে রূপদান করেছেন প্রকৃত মগ্ন শিল্পীর মতোই।

জ্যোতিরিন্দ্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাঁর অসাধারণ নির্মাণকৌশল। হেমিংওয়ের মতো অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ লেখক তিনি নন। নন অন্নদাশঙ্করের মতো মননশীল। কিন্তু নির্ভার শব্দচয়ন, নিটোল ভাষা, শাণিত সংলাপ, ঘটনা ও চরিত্রের নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও সযত্ন অলংকরণের জাদুকরী অভিঘাতে তিনি হ'য়ে উঠেছেন যথার্থ কথাশিল্পী, ভাষার কারিগর, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক।

কোনো কোনো সমালোচক তাঁর রচনায় ডি.এইচ লরেন্স ও আলবেয়ার কামুর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কেউ কেউ সার্ত্রের কথাও বলেছেন। কিন্তু তাঁর বড় কৃতিত্ব, শেষ পর্যন্ত আপন পূর্ণতায় স্থিত হতে পেরেছিলেন তিনি। অর্জন করেছিলেন শৈল্পিক সাম্য, শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রের অন্বিষ্ট সত্য। কাজেই, তাঁর তুলনা তিনিই।

জ্যোতিরিন্দ্র : দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি

কবিতার চোরাস্রোত

এবার আপনার সঙ্গে উত্তমপুরুষে কথা বলব জ্যোতিদা। এ পর্যন্ত আমি লেখক তথা শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রের রচনাকে এক ভাবে দেখবার-দেখাবার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও বিদগ্ধ জনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে তোলপাড় করেছি এই বালখিল্যের ভাবনকক্ষ। আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি আপনার রচনার কেন্দ্রীয় সত্যের স্বরূপ। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের কর্মশালায় যে একই সঙ্গে বিচিত্র আলো-আঁধারির খেলা। সেখানে যেমন কেবল অন্ধকার এবং অপ্রেমের চর্চা হয় না, তেমনই নিছক প্রেম-রোমান্স-সত্যাসত্যের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যাও নয়। সেখানে এক এবং একাধিকের প্রবল দ্বন্দ্ব। পুর নারী বনাম বারনারী, গদ্য থেকে কাব্য এবং ঈশ্বর-না ঈশ্বর-শয়তানের বিপন্ন অবস্থান।

এই খেলায় সামিল হ'তে গেলে দূরত্বটুকু ঘুচিয়ে ফেলতে হয় জ্যোতিদা। যেখানে আমার উপলব্ধিও জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে থমকে দাঁড়ায়, সেখানে আপনি, একমাত্র আপনিই দ্বন্দ্বের নিরশন করতে পারেন। এতক্ষণ বৈঠকখানায় ছিলাম। এবার টাইমমেশিনে চেপে আঠারো বছর আগে আপনার অন্দরমহলে হানা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আপনার মুখোমুখি। আপনার উত্তর জানার জন্য। সাহিত্যপ্রেমী এই কলমচির কাছে এখন আপনি প্রিয় জ্যোতিদা।

প্রসঙ্গে আসি। খবরে প্রকাশ, শৈশবে কাঁচা পদ্য রচনার সূত্রে লেখালেখির জগতে আপনার আত্মপ্রকাশ। পরে পদ্য ছেড়ে গদ্যে প্রবেশ। গদ্য ভাষায় আপনি সমাজ ও জনজীবনের ছবি আঁকেন। গদ্য অলংকারে নারীর রূপ বর্ণনা করেন। ঝোপ-জঙ্গল, আকাশ, নদী, সাঁকো, পশু-পাখি, বৃক্ষ, গুল্মলতা, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন, প্রেম-অপ্রেম সবই আপনি সৃষ্টির প্রকরণগৃহে এনে জুড়ে দেন অন্তঃমিল-বিহীন গদ্যের মুন্সিয়ানায়। আর তখন সন্ধি-সমাসহীন শব্দের জালে বোনা আপনার গল্পের ভুবনটা হয়ে যায় পাঠকের নিজস্ব ভুবন। কল্পবাড়ির প্রতিটি বারান্দায়, উঠোনে পায়চারি করি আমরা। জ্যোতিরিন্দ্রের মানসলোকে

তৈরি চরিত্রের ছদ্মবেশে এই বহির্বিশ্বের মানুষেরা।

আর বিস্ময়ের মোড়কে বিস্ময়! আপনার ঋজু গদ্যে তৈরি বাক্যবন্ধ অন্তঃশরীরে হঠাৎ হঠাৎ কবিতার কথা বলে! কবিতার নির্যাসে ভরে যায় পাঠকের হৃদয়। কবিতার 'গোপন গন্ধ' বনের রাজার শরীরের লতা-গুল্ম-শাপলা মিশ্রিত মায়াবী গন্ধের মতোই আচ্ছন্ন করে ঠাট-বাট-সর্বস্ব গদ্যজীবন।

আপনার কবি-ভাষা যেন আরবসাগর থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়া। গদ্যের ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা, ড্যাশ-হাইফেন-সেমিকোলন, ছেদ-যতির বিবিধ ঠাসবুনোট মুহূর্তে ছত্রখান করে দেয়। বিচ্ছুরণ ঘটায় শব্দের মায়াদ্যুতিব। তাই আপনি লেখকদের লেখক। সমসাময়িক এবং অধুনা আগ্রহী কবিকুলের প্রিয়জন হয়ে পড়েন।

এটা কেমন করে সম্ভব জ্যোতিদা! ধরে নিলাম, আপনি ভাষার কারিগর। জীবনের কামারশালায় নিরন্তর আগুনে পুড়িয়ে ঝাঁঝরা করে নিচ্ছেন আপনার হৃৎপিণ্ডকে। যুক্তিবুদ্ধির রক্তচক্ষু শাসন আপনি মানেন না। হৃদয় অন্তর্গত ভাব-বিভাব-আবেগ নিয়ে প্রতিনিয়ত অনিবার্য দহনক্রিয়ায় সামিল হন। হাতুড়ি পেটাই করেন। তারপর ইস্পাতের ফলার মতো ঝকঝকে শব্দের উদ্ভাস ঘটে আপনার গদ্যশরীরে। কিন্তু শুধু কি তা-ই! আর কোনো রসায়ন নেই! কোনো পাগলামি!

নিরন্তর কাটাকুটি! একটা অক্ষরকে একশোবার কেটে ছিঁড়ে শব্দের অ্যানাটমি পাঠ! খবরে প্রকাশ, আপনার পাণ্ডুলিপি পড়তে সন্ত্রস্ত বোধ করতেন সম্পাদককুল। জীবনভর আপনি এত ভেবেছেন, এত কেটেছেন...! অথচ লিখেছেন অনেক কম। আবার যা লিখেছেন সেখানে, এমনকি বিষয়-বৈচিত্র্যহীন নিছক একঘেয়ে কাহিনীতেও, আপনার কাব্যগন্ধী ভাষা হয়ে উঠেছে শিল্পের জাদুঘর।

আসুন কবিতা সম্পর্কে সমালোচকের মতামত একবাব জেনে নিই। অরুণকুমার ঘোষ তাঁর 'ছোটো গল্পে কবিতার সংক্রাম' নামক নিবন্ধে জানিয়েছেন, ''ফলতঃ 'কবিতা' শব্দটির অভিধা অনেক ব্যাপক; শিল্প সাহিত্যের সকল মহৎ সৃষ্টিরই একান্ত গহনে ওতপ্রোত হয়ে থাকে আমোঘ, অনিবার্য সেই 'কবিতা'। সাম্প্রতিক কালেই অন্যান্য সাহিত্য শাখায় বিশেষ করে ছোটোগল্পে কবিতার অনস্বীকার্য সংক্রামের কথা আমরা বহুল উচ্চাবিত হতে শুনেছি। তবে এই কবিতা অনেকেরই ছোটোগল্পে, নিতান্ত উপরিভাগ, ভাষার বাহ্য গীতলতায় বা পেলব মধুরতায় আটকা পড়ে থাকে, গল্পের একেবারে মর্মে, সামগ্রিক গঠনে-অভিঘাতে তা সঞ্চারিত হয়ে যায় না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটোগল্পে কিন্তু কবিতার এই সংক্রাম নিছক ভাষার গীতিঝংকারে পর্যবসিত না থেকে একেবারে আভ্যন্তর সত্য হয়ে উঠেছে : নিগূঢ় ইঙ্গিতময়তায়, বাহ্য ঘটনার চমৎকারিত্বকে এড়িয়ে বা ছাড়িয়ে নিহিত ভাবসত্যের উদ্‌ভাসনে, শব্দের শিল্প-সচেতন বিন্যাসে চিত্রকল্প নির্মাণে, অনুপুঙ্খ-ঋদ্ধ সূক্ষ্ম বর্ণনায়, ইন্দ্রিয় সংবেদনার তীক্ষ্ণতায় ও তীব্রতায় আবহ গড়ে তোলার নৈপুণ্যে, সামগ্রিক গঠন সৌষ্ঠবে, অভিঘাতের অনুরণনময়তায়।''

লেখক সমালোচক এ-ও জানিয়েছেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে, তাঁর ছোটোগল্পে জীবনানন্দের কবিতার গভীর প্রবর্তনার কথা, কুণ্ঠাহীন স্পষ্টতায় স্বীকার

করে গেছেন : "পূর্বাশায় যখন আমি গল্প লিখি, যেমন ধরুন মঙ্গলগ্রহ, চামচ বা খেলোয়াড়, তখন আমি জীবনানন্দের কবিতা পড়তে শুরু করি। তার আগে আমি তাঁর কবিতা পড়িনি। এই সময় আমি তাঁর প্রকাশিত প্রায় সব কবিতা পড়েছি।"

ওই একই সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্যও জানিয়েছেন যে, জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটির চিত্রকল্প তাঁকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছা হয়েছিল তিনি ওরকম সুন্দর শব্দ সাজিয়ে গল্প লেখেন।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে কবিতার সংক্রাম বিষয়ে অরুণকুমার ঘোষের আরো কিছু মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "শুধু গল্পের শব্দ এবং চিত্রকল্পগত অবয়ব নির্মাণে এই শিল্পসচেতনতার প্রকাশেই নয়, গন্ধের তীক্ষ্ণ তীব্র অনুভূতির, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম সংবেদনার দিক দিয়েও এই দুই স্রষ্টার নিবিড় সাযুজ্য আমরা অনুধাবন করি। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় গন্ধের পৌনঃপুনিক উল্লেখ তো বহুল উদ্ধৃত; 'অবসরের গান' কবিতাতেও পরপর পাই 'মাঠের ঘাসের গন্ধ', 'শিশিরের ঘ্রাণ', 'শৈশবের ঘ্রাণ', 'প্রচুর শস্যর গন্ধ', 'পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণ', 'রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ', 'ফলন্ত ধানের গন্ধ', 'দূরের নদীর মত সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ', 'অনেক দিনের গন্ধ', 'ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধ'। 'রূপসী বাংলা'-র একটি কবিতায় গন্ধ-র অভিনব উল্লেখে জড়িয়ে থাকে রহস্য আর বিস্ময়: "পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি—রৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে/স্বপনের!" 'বনলতা সেন'-এর 'ঘাস' কবিতায় কবি 'এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎমদের মতো গেলাসে গেলাসে পান' করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। 'মহাপৃথিবী'-র 'মনোবীজ' কবিতায় তাঁর 'স্নিগ্ধ সব ধ্যানগন্ধী প্যাঁচাদের প্রেম মনে পড়ে' যায়। আর 'সাতটি তারার তিমির'-এও 'ঘোড়া' কবিতায় 'আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়!' 'আমার সাহিত্যজীবন আমার উপন্যাস' (দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২) শীর্ষক উন্মোচক এক আত্মজৈবনিক লেখায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমাদের জানিয়েছিলেন যে, তাঁর শৈশব থেকেই সবকটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছিল অতি মাত্রায় প্রখর, সজাগ। ...এই তীব্র তীক্ষ্ণ গন্ধের অনুভূতি প্রায়শই যে তাঁর গল্পে সঞ্চার করেছে একটি অমোঘ অভিঘাত, সংযোজন করেছে একটি অতিরিক্ত মাত্রা, উন্মোচন করে দিয়েছে অন্য এক দিগন্ত, আর এই ভাবেই ছুঁতে পেরেছে সেই সর্বাতিক্রমী পরমতাজ্ঞাপক কবিতাকে,...।' [শোনপাংশু : ডিসেম্বর ১৯৮২]

হ্যাঁ জ্যোতিদা, গল্পে বা কাহিনীতে কবিতার নির্ণয় প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা এসে যায়। কবিতায় নিছক ফুল পাখি আকাশ নিষিদ্ধ এখন। সেই 'কল্লোল'-এর কাল থেকেই চলে আসছে এই ধারা। কবেই যেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,/চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য/কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া" (মে-দিনের কবিতা)। আপনিও তো এক ধ্বংস এক অবক্ষয়ের মুখেই কলম ধরেছিলেন জ্যোতিদা। এমনকি, মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের সার্থক কথাকার বলেও চিহ্নিত হয়ে যান একসময়।

সেই আপনি 'মেয়ে শাসন' গল্পে একটি আঠারো বছরের কিশোরীর মনের ঘর বর্ণনায় জানাচ্ছেন, "একটা অজানা ফুলের কলি অজানা গন্ধ বুকে আটকে রেখে বড়ো

হচ্ছে, ফুটতে তৈরি হচ্ছে।"

বাস্তবিক শৈশব পেরিয়ে কৈশোর এবং যৌবনের মধ্যবর্তী এক আগন্তুক অবস্থানে দাঁড়িয়ে যে মেয়ে, যে নিজের কাছেই এক বিস্ময়। বিস্ময়-মুগ্ধ বহিঃপ্রকৃতির অকৃত্রিম রহস্য রাগমালায়। যার শরীরের পর্ণ মোচনের মতোই বোধেরও সংশ্লেষ ঘটে একটু একটু করে, তার চরিত্রের বিস্তারে নাম না জানা ফুলের কলির পূর্ণ বিকশিত হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তের চিত্রকল্প যথোচিত না হয়ে যায় না। আপনার বর্ণনার বৈভবে বুঝে নিতে হয় কবিতা সম্বন্ধে প্রথাবদ্ধ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কত অর্থহীন।

আবার, রূপক-প্রতীক-অলংকার-এর বাহ্যাড়ম্বরও যেন অভিপ্রেত নয় এই সময়ের কবিতায়। এখন সহজ কথা (?) সহজভাবে বলার যুগ। মন ও মননের, শরীর ও শারীরবৃত্তীয় যা কিছু অকৃত্রিম অকপট বাচনে প্রকাশ কবিতার প্রধান শর্ত। দৈনন্দিন জীবনযাপনে চলিত একেবারে মুখের ভাষা থেকে উঠে আসছে কবিতার লাইন। কোনো আড়াল-আবডাল নেই। যৌবন, উত্তর-যৌবন (পোস্টমডার্ন) কিংবা আরো পরবর্তী কোনো বিপজ্জনক ধাপ পেরিয়ে চলেছে আজকের কবিতা। এক পক্ককেশ প্রাজ্ঞ যেমন তাঁর শিশুবয়স বা প্রথম যৌবনের নিষিদ্ধ কৌতূহল, গোপন প্রণয়, নির্বিকার চৌর্যবৃত্তি, লোভ, হিংসা, কাম, প্রেম, বিষাদ, হনন-লিপ্সার কথা প্রকাশে দ্বিধা বোধ করেন না, তেমনই পরিণত মানসে কথা বলছেন আজকের কবি।

কবিতার অধ্যাত্ম আবরণ খসে গেছে। মর্ত্যবাসীর কাছে মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সরস শব্দচয়ন করতে হয় না। কবি পূজা চান না। তাঁর বেদনা, আক্রোশ, অসহায়তা, অহংকার, অভিমান, আত্মরতি সমস্ত বাগ্‌দেবীর চরণে নিবেদন করে মুক্ত হতে চান তিনি। ইমোশনের চূড়ান্ত প্লাবন ঘটিয়ে প্রেম প্রত্যাশা করেন কবি। জীবনভর সন্ধান করে ফেরেন সেরা শব্দটির।

আবার, কবি এ-ও বলেন, "...এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে/সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়" (সঙ্গিনী : শঙ্খ ঘোষ)। অর্থাৎ কিনা সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কটা বড় সহজ নয়। কখনও বা পাতাল প্রবেশের আশঙ্কা থেকে যায়। যুগ ও জীবনের সমস্ত রকম প্রহার মাথায় করে 'নেট' এবং 'গ্যাট'-এর প্রবল থাবা বাঁচিয়ে যখন কবি এক নতুন যুগমানসের প্রজনন ঘটান, তখন কিছু প্রতিবন্ধী, কিছু রুগ্ন, নির্জীবেরও জন্ম হয়। হারাধনের দশটি ছেলের মতোই। যুগলক্ষণ চিহ্নিত নতুন শব্দচয়ন মাত্রই কাব্যভাষার মর্যাদা দাবি করতে পারে না; যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া।

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের মতোই কিছু পুরনো সাবেকি শব্দ, সাবেকি অলংকার ব্যঞ্জনাও পুনর্জীবন লাভ করতে পারে যুগান্তরের কবিতায়; উজ্জীবিত করতে পারে কবিভাষা। সবটাই নির্ভর করে প্রয়োগ শিল্পের উপর।

জ্যোতিদা, আপনার গদ্য কাহিনীতে কবিতা এল। ফুলের রূপকল্পে। শব্দ এল। সনাতনী পথ ধরে। নারীর রূপ, নারী নির্মিতির মনস্তত্ত্ব বর্ণনায়। তবু আপনাকে প্রাচীনপন্থী মনে হল না। 'মেয়ে শাসন' গল্পের রুণিকেও নয়।

নারীকে আপনি কখনো দানবী-র চিত্রকল্পে প্রতিস্থাপন করেন। সে নারী স্বৈরিণী

কিংবা স্বেচ্ছাচারিণী। 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে কবি রামানন্দ সেন-এর ব-কলমে রচিত কবিতায়, "গোধূলি বেলায় গাছের তলায়/রমণী এক/সুন্দর কিশোর নিয়ে খেলা করে, খেলা করে—/ রমণীর চোখে অরণ্য আদিম/কিশোরের চোখে লোভী সূর্য,/ খেলা করে, দুটিতে খেলা করে—রক্ত নিয়ে খেলা?/অন্ধকার বিদ্ধ করার দুরন্ত/উল্লাসে সূর্য/ধ্বক ধ্বক জ্বলে, দানবী মানবী/সিংহ শিশু নাচাবার মতন/চপল নধর কিশোর নিয়ে খেলা করে—"

এখানে আপনি আক্ষরিক অর্থেই কবি ভূমিকায়। কিন্তু আপনার ভাষা যতটা না কাব্যিক তার থেকে অনেক বেশি দ্যুতিময়। যৌনতা শিল্প সাহিত্যে কতখানি প্রকাশযোগ্য তার থেকেও বড় কথা যৌনবাসনা বা যৌনক্রীড়া প্রকাশের এমন অদম্য অকৃত্রিম ভাষ্য কবিতার পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে তোলা।

একদিকে ছত্রিশের সুন্দরী, রূপসী, লাস্যময়ী মাধুরী। অন্যদিকে কিশোর অবোধ মনতাজ। একদিকে স্বামী সঙ্গহীন (মাধুরীর স্বামী অক্ষয় হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন) মাধুরী। অন্যদিকে নারী সঙ্গ স্বাদ বিরহিত অজ্ঞ অনাঘ্রাত কৌতূহলপ্রিয় মনতাজ। একটি মুরগি কাটার চিত্রকল্পে এই কবিভাষ্য যুগপৎ মনতাজ ও মাধুরীকে খাদ্য ও খাদকের ভূমিকায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে।

মানবসন্তান মনতাজ বয়ঃসন্ধির আগ্রাসী খিদে তথা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির তাড়নায় সিংহশিশুর মতোই ভয়ংকর। একবার রক্তের স্বাদ পেলে সে কী ভীষণ হয়ে উঠতে পারে, ফ্রয়েড স্যার তা ভালোই জানতেন। কিশোরের চোখ তা-ই 'লোভী সূর্য'। যে কেবল পোড়ায়। লালসার আগুন ধরিয়ে দেয় নারীর চোখে। আবার, সেই কিশোর তথা সিংহশিশুর রক্তে যে আগুন ধরাতে পারে, তাকে নাচাতে পারে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের সুতোর পাকে, সেই মাধুরী তো রিপু-তাড়িত আদিম মানবী। দানবীও বৈকি।

এদিকে 'গিরগিটি' গল্পে নারীর সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপনি টেনে আনলেন ডালিমচারার উপমা। —"অনেকদিন আগেই ওটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন নতুন করে ও ডালিমচারাটা দেখতে পেল। চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল! আঙুল ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলিমিলি। হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুলে বিলি কাটছে আর খিলখিল হাসছে। আর একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া। আধফোটা একটা কলি সিঁদুরের রেখা হয়ে পাতার মাঝখান থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি লুকিয়ে যাচ্ছে। আর একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দুবার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিলখিল হাসল।

...শোয়া ছেড়ে একসময় ও উঠল। আস্তে দরজার দুটো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে

উঠোনের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশিতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত সব দেখতে পায়। না, আরশি মুখ করে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। ব্লাউস খুলে ফেলল, শাড়ি সায়ার বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে সব ঠেলে সরিয়ে দিল ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে! ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় ছড়িয়ে পড়া যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা করে গেল, টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ করে তখন বেজে উঠল ঝম ঝম ঝম। ঘরের চালে শব্দ হচ্ছিল, বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশ ভেঙে জোরে বৃষ্টি নামল...।''

এ কি সত্যি কোনো গল্পকথা জ্যোতিদা নাকি কবির সৌন্দর্য তৃষ্ণা! যা শরীরে শিরা ওঠা ভাড়াটে বৃদ্ধের চোখে প্রতিফলিত হয় আর তার সৌন্দর্যসাধনাকে নীরবে প্রণতি জানায় মায়া, মায়া-নারী। কবির সৌন্দর্যসাধনা তাই কেবল নারী নয় ভাষাকেও দান করে অবিকল্প প্রমা। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি এলোমেলো বাগানের কোণে অযত্নে বেড়ে ওঠা ডালিম গাছ যৌবনবতী প্রাণোচ্ছল নারীর মতোই সপ্রাণ কথা বলে পাঠকের সঙ্গে।

আপনার কাহিনীতে নারী ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার। এই যুগলবন্দি সম্ভব করে তোলে আপনার কবিকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি যেখানে নিজেই নিজের উপমা তখন তার কাব্যমাধুর্যও কম লক্ষণীয় নয়। যেমন 'চন্দ্রমল্লিকা' গল্পে, ''...বকের পাখার মতন শাদা ধবধবে দু'খণ্ড মেঘ পশ্চিম দিকে চুপ করে শুয়ে ছিল। আর সারা আকাশ জুড়ে গভীর নীল প্রশান্তি। আর কিছু ছিল না। একটা পাখীও না। দূরগামী উদাসী কোন চিলের ক্ষীণতম চিহ্নও কোথাও ছিল না। ছিল শুধু ঝকঝকে রৌদ্র। অফুরন্ত নীল আর বকের পাখার মতন দু টুকরো শাদা মেঘের এক আশ্চর্য সকালে তার কথা আমার মনে পড়ল। সবুজ ঘাসের বুকে বিরল শিশিরবিন্দু কখনো সোনালী কখনো বেগুনী নীল দ্যুতি নিয়ে থেকে থেকে জ্বলছিল। আর সেই ঘাসের শিশির ঘিরে হলদে প্রজাপতিরা দল বেঁধে নাচছিল।''

—গভীর নীল প্রশান্ত আকাশের বুকে বকের পাখার মতন একখণ্ড সাদা মেঘ যখন চুপ করে শুয়ে থাকে তখন কেবল শব্দের ব্যঞ্জনাতেই তার কাব্য মহিমা আকৃষ্ট করে। দুই প্রেমাস্পদের অপ্রত্যক্ষ চিত্রকল্প চোখের সামনে ভেসে উঠলেও আমরা উপলব্ধি করি প্রকৃতি নিজেই এক অনন্য কবিতার পঙ্‌ক্তি উপহার দিয়ে চলেছে। তাই সকালের আকাশে ওই গভীর প্রণয়বার্তা পাঠ করে আপনার গল্পের চরিত্রটিও। অনেকদিন পর তার হঠাৎ মনে পড়ে প্রণয়িনীর কথা।

গভীর ব্যাপ্ত আকাশের বুকে শ্রীময়ী নারীর মতোই যখন মেঘ চুপ করে শুয়ে ছিল তখন সেখানে দূরগামী উদাসী কোনো চিলের ক্ষীণমাত্র আভাসও ছিল না বলে

জানিয়েছেন আপনি। প্রশ্ন হল এই 'চিল' কি সুখের পরিপন্থী! জীবনে সহজ হবার সাধনাকে প্রতিনিয়ত ছোঁ মেরে হরণ করাই যার নিয়তি!

আর 'চুপ করে শুয়ে থাকা'-র মধ্যে আপনি কী দেখলেন জ্যোতিদা। প্রেম? গভীর মিলনের প্রগাঢ় তৃপ্তি নাকি নিছকই আলস্য, বিষাদ, নিঃশর্ত সমর্পণ! বাস্তবিক নির্দিষ্ট কোনো অর্থ-বন্ধনীতে এই কবিভাষ্য বেঁধে দিতে ইচ্ছে করে না। কেবল শব্দের মায়ায় বুঁদ হয়ে থাকি।

'গাছ' গল্পে যে চিত্রকল্প দেখতে পাই সেখানেও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, নৈর্ব্যক্তিক ব্যঞ্জনা এবং বাস্তব ও পরাবাস্তব মধ্যবর্তী যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করেছে একটি বৃক্ষ, তা-ও কবিতার আঙ্গিককেই মনে করিয়ে দেয়—"গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা যেন ইচ্ছে করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।"

গাছ কি তা হলে অতিমানব জ্যোতিদা! গাছের ছায়ায় মানুষ আশ্রয় নেয়। আবার, তার বুকে যথেচ্ছ কুঠার চালায়। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে মানুষকে বাঁচাতে এই গাছই ডালপালা ছড়িয়ে রচনা করে এক অবিকল্প তাঁবু। আদিমাতার মতো। অথচ মানুষ কত নির্বিকার চিত্তে তার ফুল ছিঁড়ে পাতা ছিঁড়ে গাছের হৃদয় চিরে শস্য নিয়ে যায় ঘরে। এই গাছের কাছে মানুষ মৈত্রী ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা নিতে পারত। কিন্তু মানুষের উদাসী অজ্ঞতা গাছের নীরবতার থেকেও কত ভয়ংকর!

কিন্তু গাছ যদি একবার চোখ বোজে, তার অতিমানবিক ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাকে ঘুম পাড়িয়ে চরম অমনোযোগী হয়ে পড়ে বিশ্ব সংসারের প্রতি, তা হলে যে সমূহ বিপর্যয়।

জ্যোতিদা, প্রকৃতির সেই প্রতিশোধ রোধ করতেই বুঝি আপনি প্রেমিক কবির ভূমিকা নিলেন। গাছকে ঘিরে মানুষে মানুষে সংঘর্ষ সম্ভাবনাকে প্রেমের স্ফুরণে দূরে সরিয়ে দিলেন এক নর ও নারীর সান্নিধ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে। কবিমানস উদ্ভূত কল্পলতা গাছ তাই নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এক প্রত্যয়ী ঔদাস্যকে সঙ্গী করে।

'বনের রাজা'য় আপনার কাব্যগন্ধী কলম যেন গাছের মধ্যে প্রাণও সঞ্চার করে। প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় রসেবশে অংশ নেয় সেই গাছ।—"ডাহুকটা ভীষণ জোরে ডাকছে। পেঁজা তুলোর মতো সাদা পাতলা মেঘগুলো এখন গায়ে গায়ে লেগে একটা বিশাল শ্বেত পদ্মের চেহারা ধরতে আরম্ভ করল না। আশ্চর্য এক মেঘের ফুল। খুশী হয়ে মতি দাদুকে দেখছিল। টপটপ জল ঝরছে কান থেকে, নাকের ডগা থেকে, থুতনি থেকে, হাতের আঙুলগুলি থেকে। দাদুর উলঙ্গ ভেজা শরীরটা দেখে মতির মনে হচ্ছিল একটা পুরনো গাছ। অনেকদিন জলের নিচে থাকার পর এখন উঠে এসেছে। গাছের রাজা তো গাছই হবে, মতি ভাবল। দাদুর গায়ের শাদা ধূসর লোমগুলি যেন গাছের গায়ের শ্যাওলা। শ্যাওলা থেকে টুপটাপ জল ঝরছে। হরিতকী গাছের সরসর শব্দটা মতি কান পেতে শুনল।"

শহর থেকে বেড়াতে আসা ছোট্ট মতির ঠাকুর্দা সারদার প্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতির

এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন-কলা তো চিরকাল কাব্যময় শব্দের অন্তর্লীন বুনোট শৈলীর প্রত্যাশাই করেছে শিল্পীর কাছে। মতির চোখে কবির সেই শৈল্পিক অঞ্জন বুলিয়ে না দিলে কেমন করে সম্ভব হত এই অভিনব বীক্ষণ!

আবার 'শালিক কি চড়ুই' গল্পে আপনার কবিপ্রেরণা যেন কেবল শব্দচয়ন ও চিত্রকল্প নির্মাণেই থেমে থাকে না। একটা গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বজাত নির্বেদ ইঙ্গিতময়তার পরিচয় বহন করে। যে ইঙ্গিতধর্মীতা ছোটগল্পেরও অনিবার্য লক্ষণ। আদতে একটি নিটোল ছোটগল্প তো একটি সুসংহত কবিতার মতোই গভীর অর্থবহ, ব্যঞ্জনাময়।

গল্পের শেষে তারাপদ তার বিবাহিত স্ত্রী শানুর প্রাক্ বিবাহপর্বের প্রণয়প্রার্থীদের সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'কে জানে কাল আবার কি আসে, শালিক না চড়ুই।'

প্রতিটি মধ্যদুপুরে তারাপদর অনুপস্থিতিতে তাব ঘরে অতিথির আনাগোনা। ঘরের পাঁচিলে বারান্দায় শালিক এবং চড়ুই-এরও নিত্য যাতায়াত। শানু যখন স্বামীর সঙ্গে কৌতুক করে সেই শালিক এবং চড়ুই-এর দৃষ্টান্ত দেয় তখন বিহ্বল তারাপদ যেন দুটি নিরীহ পাখিকেই অবলম্বন করে তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য। স্ত্রীর প্রতি প্রেম, সন্দেহ এবং আর্ত হৃদয়েব যন্ত্রণা প্রকাশ করে কেবল একটি মাত্র বাক্যে, তির্যক ইঙ্গিত দিয়ে। স্ত্রীর প্রাক্তন প্রণয়ীদের সম্পর্কে তারাপদর এই অস্ফুট উচ্চারণ পাখিদুটি অর্থাৎ শালিক ও চড়ুই-এর চঞ্চল অনির্দিষ্ট গতিবিধিতে এনে দেয় প্রতীকের দ্যোতনা। অন্তত শালিকের সঙ্গে শানুর পূর্বতন প্রেমিক পল্লব সেনের সাদৃশ্য উপলব্ধিতে কোনো দ্বিধা থাকে না।

'খুকী' গল্পে—"যেন সতের বছরের একটি ধানশীষ। ওপরের রং পাকা সোনার মত হচ্ছে শক্ত হচ্ছে মনের দুধ। খুকী বড় হচ্ছে।"

শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখা খুকীর বর্ণনা প্রসঙ্গে সবুজ ক্ষেতের সজীবতা, লকলকে ধানশীষের সঙ্গে কিশোরী অঙ্গে নির্মেদ বিভঙ্গ, এবং ধানশীষের দুধের সঙ্গে কিশোরী হৃদয়ের অন্তর্গত সারল্য ও যৌবনের চৌকাঠে পা রাখার আনন্দ-সংকট ঋদ্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে পবিপক্ক ব্যক্তিত্বের আভাস—এতগুলি অনুযঙ্গকে মাত্র তিনটি বাক্যে, ১৮ টি শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ-ও কি কবির ভাবসংযম ও প্রতীকের কুশলী প্রয়োগ নির্মাণ ব্যঞ্জনার পরিচয় বহন কবে না!

কবিতায় কথা বলা যে-লেখনীর ধর্ম সেখানে গল্প-উপন্যাস নির্বিশেষে কাহিনীর অভ্যন্তরীণ চোরাস্রোত রক্ষা করে চলে এক চিরবিরহী প্রেমিক কবিমানস। জ্যোতিদা, আপনার সমগ্র রচনাতেই ছড়িয়ে রয়েছে এমন অসংখ্য উদাহরণ। যেখানে কেবল নারী, প্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতি নয়, পুরুষ এবং পুরুষপ্রকৃতি বিন্যাসেও আপনি বেছে নিয়েছেন কবিতার সান্ধ্যভাষা।

'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসে তেমনই এক প্রেমিক পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যন্ত্রণার অবিমিশ্র সাধনার আভাস পাই কবিতার রূপকে, "তার চোখের সামনে এখন একটা আলো জ্বলছে। ...চোখে হেমন্ত অপরাহ্নের লালাভ-রৌদ্রের স্বপ্ন, রক্তে একঝাঁক পাখির কিচিরমিচির, নিঃশ্বাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতার মর্মর—তার অন্তরে যদি গোলাপ কলির মতন সুন্দর পবিত্র একটি কুমারী গান গেয়ে না উঠবে তো সে পরিপূর্ণ হবে কেমন

করে!" (পৃ. ৩৪৪)

জেলফেরত খুনের আসামি পরিমল প্রসঙ্গে তার ভ্রাতৃবধূ রমলার এই বিশ্লেষণ প্রকৃতির অনুষঙ্গে এক চরিত্রের বিবর্তন বা আত্মিক বিকাশ যেমন পরিস্ফুট করে, তেমনই একই সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ব্যক্তির কাব্যসুষমা অনুভূতির দরজাও খুলে দেয় প্রকারান্তরে। জেলে থাকাকালীন একাধিক বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শ এবং প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতায় পরিমল যে শোধনক্রিয়া অনুভব করেছিল তার শরীর-মন—সর্বাঙ্গে, সেই অনুভূতির আলোকপাত যেন এই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশভঙ্গি ছাড়া সম্ভব ছিল না।

হেমন্তের অপরাহ্নের রোদ অর্থাৎ গ্রীষ্মের দাবদাহ বর্জিত আসন্ন শীতের মেদুর প্রশান্তি। রক্তে একঝাঁক পাখির কিচিরমিচির অর্থে জীবনের প্রতি তথা নারীর প্রতি প্রেমে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় উদ্দাম কলরব। নিঃশ্বাসে কৃষ্ণচূড়ার পাতার মর্মর অর্থে হৃদয়ে সবুজ যৌবনের চিরন্তন পদধ্বনি—যা এক প্রেমিক মানুষ সর্বদাই শুনে থাকেন।

সর্বোপরি আপনাকে একটাই প্রশ্ন জ্যোতিদা, রক্তের সেই বিপন্ন কলরব কি আপনিও শুনেছিলেন? তাই কি এক খুনি, স্বৈরিণী, বৃদ্ধ, অসহায় পঙ্গুকেও কবিতার আভরণে অলংকৃত করতে চান, দিতে চান অপার্থিব প্রেমের আস্বাদন!

বিষয় নারীনির্মাণকলা

অথ ঃ নারীনির্মাণ কথা। জ্যোতিদা, আপনার সৃষ্টিতে নারী প্রায়শই দ্বি-চারিণী। স্বৈরিণী। তারা পরপুরুষে আসক্ত হয়। বিবাহ বর্হির্ভূত (extra marital) সম্পর্ক লালন করে। কখনো স্বামীর অপদার্থতার কারণে। কখনও নিছক স্বভাবদোষে। প্রবৃত্তিজাত অদম্য স্পৃহায়। আপনার বর্ণনায় নারীর শরীরসত্তা প্রকট। মননশীলতা নয়। আপনার রচনায় নারী পরকীয়া প্রেমের জন্য বেপরোয়া হয়। নির্লজ্জ উন্মাদনায় মেতে ওঠে। আবার শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে বিয়ে করা পুরুষের বুকে মুখ লুকিয়ে নিরাপত্তার ঘুমও ঘুমিয়ে নেয়। প্রেমকে, প্রেমাস্পদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না তারা।

আপনার নারী খেলুড়েও বড় কম নয়। জীবন-মৃত্যুর সর্বনাশা খেলায় মত্ত আপনার নারীচরিত্র পুরুষের থেকে কিছু কম হিংস্র নয়। স্বামীর খাবারে বিষ মিশিয়ে পরক্ষণেই জ্যোৎস্নামাখা হাসির ঝিলিক তুলে পরপুরুষের দরজায় এসে দাঁড়াতে পারে সে নারী। ছল-বল-কৌশলে সর্বশাস্ত্র পটীয়সী সে। সে কখনো স্বেচ্ছায় পুরুষ পতঙ্গের জালে শিকার হয়ে ধরা দেয়। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। কখনো নিজেই শিকারী পতঙ্গের বেশে গ্রাস করে পুরুষকে। তাবৎ সামাজিক সম্পর্কের মূল্যকে নস্যাৎ করে দেয়। 'শেষ বিচার', 'নাগকেশরের দিনগুলি', 'হৃদয়জ্বালা', 'দ্বিতীয় প্রেম', 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাস ও 'পতঙ্গ', 'ক্ষুধা', 'হিংসা' ইত্যাদি অসংখ্য গল্প ও কাহিনীতে এমন

প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সেগুলি আলোচিত। তাই দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। কেবল এ কথাই বলব, আপনার কাহিনীতে অন্তত কোনো পুরুষের হাতের পুতুল হয়ে কোনো নারীর জন্ম হয়নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'নীলরাত্রি'-র মালা প্রসঙ্গে। স্বামী-পরিত্যক্তা মালা পরপুরুষ ও বিপত্নীক নীরদের প্রতি আসক্ত হয়। প্রেমে না অপ্রেমে সম্ভবত সে নিজেও জানত না। এই আসক্তি নীরদের সন্তানের প্রতি নারীর স্বাভাবিক বাৎসল্য টান কিংবা নীরদের প্রতি নিছক যৌন চাহিদা দুটোই হতে পারে। লেখক স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু প্রসঙ্গ হ'ল নীরদ যখন মালাকে বিবাহ করতে অসম্মত হয় তখন মালা নিজেকে যৌন লাঞ্ছনার শিকার মনে করে। 'পায়রার মাংস' রূপকে (অন্যত্র আলোচিত) মালা তার একান্ত মনোলগে জানায় নীরদের কাছে নিছক এক ভোগ্যবস্তু ছাড়া কোনো মূল্য তার ছিল না। যদিও সামগ্রিক বিশ্লেষণে আমরা জানতে পারি নীরদ আসলে এক অসহায় মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতিভূ। পৌরুষের অভাব, অর্থের অভাব সর্বোপরি মর্যাদাবোধের অভাব দিয়ে সে তৈরি।

মালা শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তারপর স্বামীর ঘরে ফিরে যায়। উল্লেখ্য, এই মালাকে পুরুষের হাতের পুতুল বলা যায় না। অসহায় অনিচ্ছুক মালার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন পুরুষ শাসিত সমাজের চেহারা যত না প্রকট করে তার থেকেও বেশি চিহ্নিত করে একটি সামাজিক ক্ষত। যেখানে নারী-পুরুষ উভয়েই অসহায়তার শিকার। তাছাড়া মালার স্বামী মানিক তাকে ফিরিয়ে নিতে এলে তবেই মালা ঘরে ফেরে। এখানে নীরদের অক্ষমতার কথা প্রতিবন্ধকতার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে মালার আত্মোপলব্ধি এবং স্বামীগৃহে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণেব মধ্যে বরং এক ধরনের আত্মমর্যাদাবোধই প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু কেন মালা অসহায়ের মতো অত্যাচারী স্বামীর সংসারে ফিবে গেল? কেন আর্থিক স্বনির্ভরতার কথা ভাবল না? কেন সমাজ সেবামূলক কোনো কাজ অথবা সুস্থ আরেকটি বিবাহিত জীবন-যাপনে সচেষ্ট হল না—এতগুলি প্রশ্নে আলোড়িত হতে পারে পাঠকহৃদয়। সেক্ষেত্রে হয়তো আপনাকে দায়ী করা যায় জ্যোতিদা। শিক্ষা এবং মননশীলতার বিস্তৃত পরিধিতে পূর্ণাঙ্গ নাবীব বেখাচিত্র আপনি আঁকেননি। আপনার নারীরা তাই দেহজ রূপ এবং বাসনার কাছে আপনা থেকেই বলিপ্রদত্ত। 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'।

এই অক্ষমতা আপনার জ্যোতিদা। কিন্তু এইসব নারীরা পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। বরং পুরুষ বশীকরণ মন্ত্রে দীক্ষিত যুগপৎ অকপট এবং অকৃত্রিম।

কিন্তু এই প্রবৃত্তিতাড়িত নারী যখন জননী এবং জায়ার ভূমিকায় সুখী গৃহস্থের জীবন যাপন করে এবং তারই মতো এক নারী গর্ভবতী জেনেও তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় (হিংসা গল্প দ্রষ্টব্য) তখন যুক্তি-বুদ্ধি-হৃদয়ের এই বীভৎস পরাজয় মেনে নিতে দ্বিধা হয়।

কেবল তাই নয়, 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে আপনি জানিয়েছেন নারীমাত্রেই

সাত হাত লম্বা জিভের অধিকারিণী। এমনকি শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগিণী, বোদ্ধা রুচিসম্পন্না রেখাকেও কিঞ্চিৎ বারনারী রূপে চিত্রিত করেছেন আপনি।

তাহলে একে কী বলব? নারীর প্রতি বিদ্বেষ! নাকি নারীবাদ!

না, আপনি কোনো ইজমে বিশ্বাসী নন। যতদূর জানি, কোনো তত্ত্ব প্রচারের জন্য কিংবা সংস্কারবশে আপনি কলম ধরেননি। আসলে আপনি যা বলতে চেয়েছেন তা, এক অসুখের কথা। সেইসব অসুস্থ-বিকৃত মানসের কথা, যারা নিজেকে অতিক্রম করতে না পারার অসহায়তায় প্রতিনিয়ত পরিপার্শ্বকে আঘাত করে চলে। একটি বেদনা ভুলতে একাধিক বেদনাময় পরিস্থিতির সূচনা করে। কিংবা আদিম গুহামানবী হয়ে মনোবিকলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচরণ করে। আসলে আপনার কলমটা মুরগি কাটা ছুরির ফলার মতোই ধারালো, ক্ষমাহীন। যার এক খোঁচায় হৃৎপিণ্ডে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। সত্যের এমন অকপট প্রলাপ এমনভাবে কে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন, আপনার মতো পাগল ছাড়া! লোকভয় তো পাগলেরই থাকে না শুনেছি।

'হিংসা' গল্পে রেবা তার প্রতিবেশিনী মীরার সংসারের ঐশ্বর্য, তার স্বামীর ভালো চাকরি, বছর বছর প্রমোশনের খবরে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। সমান্তরালভাবে নিজের সংসারে প্রাত্যহিকীর গ্লানি, স্বামীর ছোটখাটো দিন মজুরের কাজ, গর্ব করার মতো অলংকার-ঐশ্বর্য-প্রেমের অভাব থেকে জাত হীনম্মন্যতাবোধ তাকে তাড়িত করেছিল। কাজেই সুখের সাতকাহন শুনে ঠাণ্ডা মাথায় একটি খুনের ছক কষে ফেলে রেবা। নিছকই মেয়েলি অসূয়া বশত শ্যাওলা ধরা পিছল কলতলায় যাওয়ার জন্য পূর্ণমাস গর্ভবতী প্রতিবেশিনীকে প্ররোচিত করে।

এই রেবা আমাদের পরিচিত। এই রেবা আমাদের কাছে ব্রাত্য নারী। ব্রাত্য 'ক্ষুধা' গল্পের তন্দ্রা, 'পতঙ্গ' গল্পের রূপা এবং 'বন্ধুপত্নী' গল্পের অরুণাও। এদের মেনে নিতে আমাদেব কষ্ট হয়। কিন্তু এরা সমাজ বহির্ভূত বা প্রান্তিক নয়। ঘাত-প্রতিঘাত বহুল জীবনের টানাপোড়েন বিচিত্ররূপিণী নারীর যে কোলাজ আপনার কাহিনীর পটভূমিতে ঘুরে ফিরে আসে সেখানে এরা অবাস্তব বা অসঙ্গত নয়, এ কথা বলা যায়। আপনি 'বন্ধুপত্নী' গল্পে অরুণা সম্পর্কে কথকের জবানীতে বলেছেন, "...এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু সাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ মধ্যরাত্রে আমাকে, হ্যাঁ, রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলাম। গায়ে ব্লাউজ ছিলো না।"

অর্থাৎ আপনার নারী-নির্মিতি-কলায় বুদ্ধির ভূমিকা রয়েছে! স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু সে বুদ্ধি কেবল সর্পিণী নারীর ছলনার কাজে লাগে। কোনো মহৎ উৎকর্ষ সাধনে উপনীত হয় না! বোধহয় সে-কারণেই একই পঙ্‌ক্তিতে এই লাইনটাও জুড়ে দিলেন যে "অরুণার গায়ে ব্লাউজ ছিলো না।"!

এই নারী নিজে কামনার বশ নয়। অন্তত স্বামীর বন্ধু অর্থাৎ পরপুরুষের সঙ্গে মধ্যরাতে কোনো যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে দেখা করতে সে যায় না। পুরুষের কামোদ্দীপক

হিসেবেই নিজেকে কাজে লাগায় অরুণা। নিছক স্বার্থচিন্তায়। সংসারে সাশ্রয় চাহিদায়। স্ত্রীসঙ্গ বিচ্ছেদে কাতর সুধাংশুর কামনাকে উস্‌কে দিয়ে সংসারে তার কর্তৃত্বের ভিত একটু পোক্ত করে নিতে চায় অরুণা। তাই স্বামী সুবিনয় ঘুমিয়ে পড়ার পর মধ্যরাতে বন্ধু সুধাংশুকে নানা ছলে সে জানায়, "...কথাটা সন্ধ্যেবেলা বলবো ভেবেছিলাম, সুযোগ পাইনি। এখন ও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। টাকা-পয়সা সুবিধামতো যা পারেন আপনি দেবেন, তার জন্যে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না। হ্যাঁ, নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে, দু-টাকা এক-টাকা পাঁচ দশ কুড়ি— যখনই যা দিচ্ছেন সবটাই যেন আমার হাতে দেওয়া হয়। না, ওর হাতে একটি পয়সা না, বুঝতে পাচ্ছেন?"

আবার এই অরুণা মুক্তকণ্ঠে সতীত্বের বিঞ্জাপন জাহির করতেও ভালোবাসে। সুধাংশুর স্ত্রী রেবা প্রসঙ্গে বলে, 'বাবা, কি ক'রে যে পারে এ-সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে—'

নিজের নগ্ন দুটি সুডোল বাহু সুধাংশুর বুকের সামনে ঝুলিয়ে আন্দোলিত করতে করতে এই মেয়ে এ-ও বলে, 'সব আমায় দিলে রেবার জন্যে রাখবেন কি। পরে ও এসে আমার চুল ছিঁড়ে খাবে।'

সুধাংশুর হাতের মুঠোয় তার নরম তুলতুলে করকমল সহসা ধরা পড়লে সে ছাড়িয়ে নেয় না। বরং একটু বেশি সময় ধরা দিয়ে বলে, 'এ-মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে...'

এ মেয়ে বুদ্ধিমতী বই কী! সব জে[illegible] নাটকের প্রতিটি দৃশ্য অরুণা নিজেই ছক কষে রচনা করে। কিন্তু এই বুদ্ধির সঙ্গে তীব্র বিরোধ রয়েছে গভীরতম বোধ-এর। যাকে আমরা বলি মননশীলতা। সম্ভবত 'মননশীল' শব্দটাতেই আপনার বিশ্বাস ছিল না। কিংবা-বুদ্ধি-শিক্ষা-রুচি সত্ত্বেও যৌনকাতর মানুষ নিয়তির মতোই কত অসহায়, এ কথা ব্যক্ত করাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। আবার বুদ্ধি যখন চালাকিতে পর্যবসিত হয় তখন সে মানুষ খুনির সংক্রমণে চালিত জৈবিক প্রাণী বিশেষ, এ-কথা জানাতেও ভোলেন না আপনি। 'সতীত্ব' শব্দটা কত ভুয়ো, ভিত্তিহীন অলীক এবং সহজেই 'মরণশীল' এ তথ্যও জানা হয়ে যায় পাঠকের।

'এই তার পুরস্কার'-এর রেখা কিংবা মাধুরী কিন্তু সতীত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাধুরী বিশ্বস্ত গৃহিণীপনায় অক্ষয়ের সংসার সাজায়, গোছায়। অসুস্থ অক্ষয়ের অনুপস্থিতিতেও রামানন্দ সেনের জন্য রান্না-খাওয়া করে। আবার একইরকম অনায়াস দক্ষতায় কিশোর শফী এবং মনতাজ-এর সঙ্গে হাস্যে-লাস্যে মত্ত ক্রীড়ায় লিপ্ত হয়। মাধুরীর কোনো সংস্কার (ইনহিবিশন) নেই।

এ দিকে রেখা, যে শিল্পানুরাগিণী এবং শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নিজের পরিচয় বহন করে, তাকে আড়ালে পাড়া-পড়শি 'বেশ্যা' বা 'বারনারী' আখ্যা দেয়। কিন্তু রেখা ভ্রূক্ষেপহীন। সে নিজের ভালোলাগাকে প্রশ্রয় দেয়। রেখা গল্পকার নন্দদুলালকে বিয়েও করে। কিন্তু বিয়ের দিনই নন্দদুলালের উপস্থিতিতে রেখা একটি

অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটায়—"আমি আমি আমি,—নন্দদুলালকে চমকে দিয়ে, রামানন্দকে প্রায় হতভম্ব করে দিয়ে রেখা সোফা থেকে ঝুঁকে পড়ে রামানন্দর দু' কাঁধ জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেল। সঞ্জীবনী সুধা হয়ে আমি আপনাকে প্রেরণা যোগাব,..." (পৃ. ২৭১)

এই রেখা বেপরোয়া। তার সদ্য বিবাহিত স্বামী নন্দদুলাল খুব সহজেই এরপর বলে, রেখার সঙ্গে দু'এক রাত কাটালেই রামানন্দ অভিভূত হবেন। নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন।

বাস্তবিক রেখা যেন আমাদের পরিচিত সমাজের কেউ নয়। তার ইঙ্গিত রেখার কথাতেও—"...নিশ্চয়, সারাজীবন আর পাঁচটা স্বামী-স্ত্রীর মতন দুটো এঁদো পুকুর হয়ে থাকতে আমরা একজন আর একজনকে বিয়ে করিনি—।" (পৃ. ২৭১)

এরা কেমনতর নারী জ্যোতিদা? ধরে নিলাম, এ আপনার বিদ্বেষ নয়, বিশ্লেষণ। কিন্তু এই বিশ্লেষণ কতখানি গ্রহণযোগ্য বা বাস্তবানুগ? এইসব নারীর কোনো ছায়া কি আপনি পার্থিব জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন? যদি তা-ই হয়, তা হলে একটাই প্রশ্ন, যৌনাচারের এই খোলাবাজারে কিছু নীল মাছির অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থেকে যায় না কি!

বলা বাহুল্য, এ আমার প্রশ্ন, অভিযোগ নয়। কারণ লক্ষ্য করেছি আপনার ছাকনি জালটি বড়ই মজবুত। মাধুরী খেলার মধ্যে নিজের জীবনের অনিশ্চয়তা ও দ্বন্দ্ব ভুলে থাকে। কিন্তু অবাধ যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয় না।

আর উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে রেখার বুদ্ধিদীপ্ত কথা ও মুখশ্রী দেখে আপনার রামানন্দ সেনই তো রীতিমতো মুগ্ধ, বিস্মিত। এই রেখা আর্ত দিশেহারা রামানন্দর মাথা কোলে রেখে বলে তারা যেমন মৃতবন্ধুর সৎকারে যাবে তেমন নন্দদুলালের জন্মদিনের জন্য উপহার কিনতেও যাবে। কোনোকিছুর জন্যই সৃষ্টি বন্ধ থাকবে না। এই রেখা আরো বলে, "...জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু আছে, চিরকাল থাকবে, যখন মাধবী ফোটে তখন গাছতলায় ঝরে পড়া শুকনো বাসি ফুলও কম জমে ওঠে কি! কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি না, বরং গাছের থোকা থোকা রঙ্গিন ফুল দেখে আনন্দে আত্মহারা হই—তাই না রামানন্দবাবু!" (পৃ. ৩২৩)

এই রেখার প্রাণের জোয়ারের স্পর্শেই রামানন্দ আবার (যিনি কবিতা লিখবেন না বলে মনেপ্রাণে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন) একটি ভালোবাসার কবিতা লেখেন।

আদতে কোনো নীতি, আদর্শ এবং সংযমের তরল ভাষায় নারীনির্মাণ যথেষ্ট মনে হয়নি আপনার। আপনি বিশ্বাস করেন কিছু কিছু ঘটনা, কিছু মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের ঊর্ধ্বে এক অন্তর্লীন বাস্তব জগতে বিচরণ করে। যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মাধুরী কিংবা রেখা তাই মর্ত্যের নারী নয়, স্বর্গের দেবীও নয়। তারা শিল্পনারী।

তা হলে কী বলব জ্যোতিদা। নারী সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত? কয়েকটা নমুনা দিই।

মাধুরীর কথা বলি। 'রুপালী মাছ'-এর মাধুরী। সুন্দরী, অকপট, অসতী মাধুরী। মাধুরীকে ঘিরে দুই পরুষ। স্বামী পর্ণেন্দ ও নীচের তলার ফ্ল্যাটের ভাড়াটে বাসিন্দা অবিবাহিত শিবদাস।

পূর্ণেন্দুর খাদ্যতালিকায় রয়েছে পেঁপে, লেবু, আনারস, মাখন, ওটসের শিশি। আমিষের মধ্যে বড়জোর মুরগির ডিম।

আর শিবদাস? রোজ দুবেলা মাংস, তৎসহ বোতল এবং গ্লাস তার প্রিয় খাদ্যাভ্যাস। শিবদাসের রান্নাঘরে আদা পেঁয়াজ গরম মশলার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ।

পূর্ণেন্দুর জন্য আদা, জিরে, মৌরির নরম সুবাস।

শিবদাস একটা ঝড়, ভূমিকম্প। প্রায়শ গাড়ি পাল্টায়। নারীও। শিবদাসের সবকিছুই ভয়ংকর কোলাহলদীর্ণ।

পূর্ণেন্দুর ঘরে অমেয় শান্তি; পুঞ্জ পুঞ্জ পবিত্রতা। ঘড়ির টিকটিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই সেখানকার নীরবতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে না।

বলা বাহুল্য, দুই পুরুষের এই তীব্র বৈপরীত্যই আপনার মনগড়া। দুই পুরুষকে ঘিরে মাধুরীর দ্বন্দ্ব-অস্থিরতাও আপনার লেখনী-নির্দিষ্ট। উদ্দেশ্য সূচক। আপনি জানিয়েছেন, মাধুরী শিবদাসকে শরীর দেয়, ঘর করে পূর্ণেন্দুর। কৌশলে আপনি এ-ও জানিয়েছেন, মাধুরী-পূর্ণেন্দুর বিবাহিত জীবনের বয়স আটবছর। তারা নিঃসন্তান।

মাধুরী-পূর্ণেন্দুর এই দাম্পত্য অপূর্ণতাকে কেন্দ্র করেই মাধুরীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের আগমন কার্যকারণ সম্পর্কে জুড়ে যেতে পারত। কিন্তু সেটা হ'ত বাস্তবের এক জোলো সংস্করণ।

আসলে নারী কী চায় এবং পুরুষ সেই চাওয়া পাওয়ার অন্তর্বর্তী রূপকে কতটা অনুঘটকের কাজ করে কিংবা আদৌ করতে পারে কি না—এটাই আপনার গল্পের প্রসঙ্গ। নারীবাদী চিন্তার উৎস।

প্রকরণগত বৈপরীত্যের পথ ধরে তাই আপনি প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, মাধুরীর পুরুষ সঙ্গীদের একজন দেবতা তো অন্যজন অসুর।

কাজেই পূর্ণেন্দু ও শিবদাস সম্পর্কে মাধুরীর মূল্যায়ন, "দেবতার হাতে পাকা আম শসা কলা লেবু তুলে দাও। দেবতারা অজীর্ণতায় ভোগে। তাই বিশুদ্ধ পবিত্র ফলের গুণকীর্তন। অসুরের খাদ্য মাংস। ...কিন্তু শিবদাস তা স্বীকার করবে কেন। রোজ দুরকমের মাংস রেঁধে চাকর মিটসেফে তুলে রাখে। রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে শিবদাস ঘরে ফিরে মাংস নিয়ে বসে, টেবিলে বোতল গেলাস সাজানো থাকে। তুমি বলতে পার তামসিকতা—কিন্তু এই আমার জীবন। প্রচুর খাটতে হয় তাই প্রচুর খেতে হয়।"

পুরুষের আরোপিত দেবত্ব এবং ভ্রূক্ষেপহীন বীরত্বের অহংকার—এ দুটোই আসলে তার শাসকের চেহারাটা চিহ্নিত করে। যা দীর্ঘকাল আমাদের সমাজে চলে আসছে। যা নারীর কাম্য ছিল না কোনোদিন। আপনার নারীবাদী চিন্তার সূত্রপাত বোধহয় এখানেই।

আসলে মাধুরীর একাকীত্ব নয়, মাধুরীর নিঃসঙ্গতার বেদনার ছবি আঁকতে চেয়েছেন আপনি। যা সে 'অল্টারনেটিভ সেকস্' বা বিকল্প যৌনতার ভিতর ভুলে থাকতে চায়।

মাধুরীকে আপনি এক অকৃত্রিম শব, অসহায় শব আখ্যায় শনাক্ত করেছেন বারবার—"সোনার রঙের স্তন নিতম্ব কাঁধ গলা কোমর হাত পা নিয়ে ফুলে ওঠা ভেসে ওঠা শরীরের কোথাও গাত্রাবাসের চিহ্নটি নেই বলে বনের কাছের কোন স্তব্ধ জলের

ছবি মনে পড়ে শেওলার গন্ধ মনে পড়ে; অকৃত্রিম এক শব, শব ঘিরে অপরিসীম বেদনা আর নিঃসঙ্গ মধ্যদিনের বিহ্বলতা।

...এখন রৌদ্রের জলে ভাসমান স্থির স্তব্ধ অসহায় শব ছাড়া ওর শরীরটা কিছু নয়। শবের মধ্যে কোন বিকার থাকে না। পবিত্র শুদ্ধ। কথাটা চিন্তা করে মাধুরী নিজের মনে হাসল। এবং গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলল। অথচ এই মাংসের পিণ্ড শিবদাসের ঘরে কত বিকৃত বীভৎস মনে হয়। যেমন মাছিটা। শিবদাসের বাথরুমে ছটা নোংরা বীজাণু বাহক একটা কিছু—এখানে পবিত্র নিরীহ, পদ্মকোরকের পাশে চুপ করে বসে থাকা অসহায় পতঙ্গ।"

এই মাধুরীর কাছে শরীরের লাজ-লজ্জা মূল্যহীন। কারণ সে তার জীবনযাপন ও বোধের সাযুজ্য ঘটিয়ে প্রাত্যহিকের চাওয়া-পাওয়াকে মেলাতে পারেনি। এও তো নারীবাদী চিন্তারই ফসল। কিন্তু তীব্র মুখর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে না মাধুরী। সমস্ত আভরণ বিসর্জন দিয়ে মেকি আভিজাত্য উপেক্ষা করে দুঃখের অগাধ জলরাশিতে মৃতবৎ নীরব অবগাহনই তার প্রতিবাদ।

দেবতা কিংবা অসুরের সঙ্গে তো সাধারণ মানুষের লড়াই চলে না। অথচ এক মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয় অপেক্ষা করে।

জ্যোতিদা, সম্ভবত আপনি এ-ও জানাতে চেয়েছেন, নারীর যৌন বেদনায় অবিমিশ্রভাবে মিশে থাকে একটি শিশু সন্তানের আকাঙ্ক্ষা। যাকে সে ধারণ করতে চায়। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকতে চায়।

তাই মাধুরীর স্বপ্নে একটি সবুজ পার্ক, প্যারাম্বুলেটর ও শিশুর আনাগোনা। কিন্তু যে পুরুষের চোখে নারী কেবল মাংসের তাল মাত্র সেখানে এই অনুভবের মূল্য কতটুকু! মাধুরী তথা নারীর এই বেদনা আপনার কলমকে জারিত করে জ্যোতিদা। তাই আমরা দেখি, "...তার চোখের সামনে ভেসে উঠল মেহগনির উঁচু খাটের বিছানায় শায়িত স্তব্ধ এক তাল মাংস। অথচ কত ধবধবে দুধ সাদা বিছানা, দুধের ফেনায় দেবশিশু গড়াগড়ি যাচ্ছে কল্পনা করতে পারতে যদি সেখানে হাঁটু গেড়ে জানোয়ারের চোখ নিয়ে পুরুষ বসে না থাকত, ...যদি তুমি সেখানে বিশুদ্ধতা পবিত্রতার মন্ত্র উচ্চারণ করতে যাও তো জানোয়ারের চোখ নিয়ে যে বসে আছে সে সবগুলি দাঁত মেলে দিয়ে হাসবে। দেবভোগ্য—নির্দিষ্ট এক দেবতার জন্য নিবেদিত এই মাংস শুনলে সে বিশ্বাস করবে না।"

উল্লেখ্য, মাধুরী তার স্বামী পূর্ণেন্দুকে বারবার 'জীবনদেবতা' আখ্যায় বিদ্রূপ করে। তার ঘরে সেই জীবনদেবতার ছবি ঝোলে। আর ঝোলে একটা টাইমপিস। পূর্ণেন্দুর অনুপস্থিতিতে রোজ দুপুরে মাধুরী যখন নীচের তলায় শিবদাসের ফ্ল্যাটে হানা দেয় তখন তার জীবনদেবতার ছবি এবং দেওয়াল ঘড়ি যেন তাকে সতর্ক পাহারা দেয়। মাধুরী উপলব্ধি করে, "ঐ ফটোর চোখদুটো কখনও বুজে আছে মনে হয় না। সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পাহারা দেয়। ...আর দেওয়ালের তাকের ওপর রাখা টাইমপীস প্রভুভক্ত ভৃত্যের

মতো সারাক্ষণ টিকটিক করে একটা শব্দ শুনিয়ে যাচ্ছে : ফাইডেলিটি ফাইডেলিটি ফাইডেলিটি; সাত্ত্বিক মানুষের যোগ্য প্রহরী বটে।''

আদতে 'সতীত্ব' কী? তা কি কেবল নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! কেবল শরীর নির্ভর। নাকি শরীর মন সবটুকুর পবিত্রতা দাবি করে এই শব্দবন্ধ! কিংবা আদৌ 'সতী' শব্দটা সঠিকভাবে প্রনিধানযোগ্য কি না, বোধহয় সেই প্রশ্নের মুখোমুখি পাঠক তথা সমাজকে দাঁড় করানোই আপনার উদ্দেশ্য ছিল জ্যোতিদা।

বাস্তবিক আপনার ওই 'ফাইডেলিটি' শব্দটা কি পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়!

আমরা দেখি নিরামিশাষী, মিতাহারী, গীতাঞ্জলি-রঘুবংশ পড়ুয়া পূর্ণেন্দু কেমন অবলীলায় ভোজনবিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল শিবদাসের অনিবার্য মৃত্যুর নিদান হাঁকে। আর মাধুরী তার মৃদু প্রতিবাদ কবায় উত্তেজিত অস্থির হয়ে ওঠে। এহেন স্বঘোষিত দেবতাটি একই সঙ্গে শিবদাসের 'অপঘাত মৃত্যু', 'অবধারিত মৃত্যু' ও 'সন্নিকটবর্তী মৃত্যু'র কামনা করে। যে পূর্ণেন্দু ঘরে শিঙ্গি মাগুর কাটার দৃশ্যও চোখ খুলে দেখতে পারে না।

আবার এই পূর্ণেন্দুই (মাধুরীর স্বপ্নদৃশ্যে) নার্সিংহোমে তার 'ভ্যাজেক্টমি' করিয়ে আসার গল্প সাড়ম্বরে ঘোষণা করে শোনায় শিবদাসকে। বউকে লুকিয়ে অন্য নারীসঙ্গও করে। একদিন শিবদাসের বিছানায় মাংসাশী পূর্ণেন্দুকে আবিষ্কার করে মাধুরী, ''...ভেবে অবাক হল মাধুরী', শিবদাসের দুধ সাদা বিছানায়ও একজোড়া নগ্ন উরুর মাজা পালিশ ডোল মন্দিরের সোনার থামের কথা মনে করিয়ে দিল, ...আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে না তো জানোয়ারের, ধূপকাঠি জ্বলছে; গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা খাটের বাজুর ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে। তবে কি—...মাধুরীর চোখ জ্বালা করছিল।''

আপনার অসাধারণ শিল্প-প্রকরণ এবং গভীর মনস্তত্ত্ব এরপর আর কিছুই ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না জ্যোতিদা। গল্পে স্বপ্নদৃশ্যগুলির অভিনব সংযোজন থেকে মনে হতেই পারে এ সবই লেখকের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কিন্তু প্রাথমিক সংশয় কেটে গেলে আমরা লক্ষ করি আপনার দৃষ্টির স্বচ্ছতা। যেখানে নারী কিংবা পুরুষ নয়, শিক্ষিত কিংবা মূর্খ নয়, মনুষ্যত্ব এবং প্রজ্ঞার অভাব এক একটি চরিত্রকে কীভাবে পতনের শেষ ধাপে নিয়ে যায় তারই অতিবাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আপনি।

আর, সবরকম বেদনা ও দীনতার ভিতর অস্তিত্বের বিপন্ন ধ্বনি শুনতে শুনতে বিহ্বল নির্বাক মাধুরী কেমন প্রবল বিষক্রিয়ায় জলের ওপর ভেসে ওঠা 'রূপালী মাছ'-এর মতোই স্তব্ধ শব হয়ে যায়, তা-ও প্রত্যক্ষ করি আমরা। নারীর এই অকৃত্রিম বেদনা, নীরব অভিব্যক্তিও কি নিঃশব্দে এক বিপ্লবের সূচনা করে না!

'রাক্ষসী' গল্পে চোদ্দ বছরের নিম্‌কি কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে ওঠার আগেই এই পুরুষশাসিত সমাজের চেহারাটা দেখে ফেলেছে। সতীত্ব কী, কৌমার্য কী নিম্‌কি জানে না। দেহ-মনকে বিশ্লিষ্ট করে দেখবার বয়স তার হয়নি। তবে সৎ থাকার একটা সহজাত বোধ তার রয়েছে। যদিও কোনো শিক্ষিতমনস্ক, অভিজাত ঘরের মেয়ে সে নয়।

নিম্‌কির মধ্যে বয়ঃসন্ধির চপলতা এবং ছেলেমানুষিও রয়েছে। যেটা স্বাভাবিক। নিম্‌কি মাতৃহীন। বাবার অনাদর-অত্যাচার, পিসির শাসনে সংসারে উদয়াস্ত খেটে শরীরে

মনে ক্লান্ত অভুক্ত কিশোরী নিম্‌কি আমাদের মনে আলাদা কোনো সহানুভূতির ঢেউ তোলে না। কারণ, গরিবের সংসারে এমন জন্ম-শ্রমিক আগাছার মতো হেলায় বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়ে অনেক দেখেছি আমরা। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত চোখ মেনে নিয়েছে এই বৈষম্য।

নিম্‌কি পাঁজা পাঁজা বাসন ধোয়, ভাত রান্না করে। মদ্যপ বাবার জন্য মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে ভাত বেড়ে দেয় আবার কেরোসিন, নুন, লঙ্কা-জিরা-হলুদ-এর বাজার সারতে বাইরেও ছোটে। এই নিম্‌কি ধুমসি, ধিঙ্গি বিশেষণে আপ্যায়িত হয় তার ঘরের মানুষগুলির কাছে। সময়মতো বাড়ি ফেরা না হলে কিল-চড় ঘুষিও জোটে। তার শ্রমের মূল্য হিসেবে।

কিন্তু বাইরের লোকগুলো কী চোখে দেখে নিম্‌কিকে। কী অভ্যর্থনা, কোন্ রহস্যের গোপন ইঙ্গিত হাতছানি দিয়ে ডাকে স্বাস্থ্যবতী কিশোরীকে! মুদি দোকানের কানাই প্রায়শই ওজনে ফাঁকি দেয় তাকে। সেই কমতি ঢাকতে ফাজলামি করে। ভিড়ের ব্যস্ততা দেখিয়ে দোকানে দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর খদ্দের চলে গেলে নির্জন দোকানে হেলেদুলে মশলাপাতির মোড়ক বাঁধে। আরো দেরি করিয়ে দেয় নিম্‌কির। তার দাঁতের হাসিতে ঝিলিক দেয় ফস্টিনস্টির ইঙ্গিত।

অজানা আতঙ্কে ভীত কিশোরী জিনিস নিয়ে কোনোরকমে ছুটে বেরিয়ে আসে দোকান থেকে। কিন্তু তারপরেও তাকে বেশ কয়েকটি কানাগলি পার হতে হয়। বিস্কুটের কারখানা, নন্দীদের কাঠগোলা, টিনের বেড়া দেওয়া ছাতার দোকান এবং একটি সরু বাঁশের সাঁকো! সন্ধ্যের মুখে ঝুপসি অন্ধকার আক্ষরিক অর্থেই এক ভয়ংকর প্রতীকী আঁধার-এর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় নিম্‌কিকে।

পালাবে কোথায়? বোধকরি পালাবার কথা ভাবেও না সে। কেবল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা ভাবে। তবু আধঘণ্টার জায়গায় এক-দুই-তিনঘণ্টা দেরি হয়ে যায় নিম্‌কির। মার খায়। এই বোধহীন পৃথিবীর সঙ্গে কিছুতেই যুঝে উঠতে পারে না সে।

মাতৃস্নেহবঞ্চিত নিম্‌কি গা ছমছম করা ভূতুড়ে অন্ধকারে সহসা চকচকে সাদা একটা জিনিস দেখে প্রলুব্ধ হয়। বুকের ভিতর চেপে রাখা ভয় এবং কৌতূহলের ধুন্ধুমার লড়াই শুরু হয়ে যায় তখন।

চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে একটা সাদা জিনিসের উজ্জ্বলতা তাকে টেনে নিয়ে যায় ছাতা কারখানার ভূতের কাছে। যার পাটনাই পেঁয়াজের মতো চোখ, ঝাঁকড়া এক মাথা চুল, হাতে বড় নখ। সন্ধ্যের অন্ধকার আর গলির সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে মিশে থাকা লোকটাকে 'ভূত' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সেই অন্ধকারের পথে পা বাড়ানো ভূতনি নিম্‌কি। ভূতের কাছে হাত পেতে পয়সা নেয় নিম্‌কি। এখনও চিনেবাদাম, লজেন্স খাওয়ার শখ তার। সে পয়সা পিসি কিংবা বাবা দেবে না। কাজেই ভূতের কাছে যদি পাওয়া যায়।

নিম্‌কির এই স্বভাবচাপল্য তার বয়সের সঙ্গে মানানসই। কারণ সে জানে এটা চুরি নয়, এটা লোভও নয়। একজনের দান হাত পেতে নেওয়া। যদিও ভূতটার উদ্দেশ্য তার অজানা নয়। কাজেই ছাতা দোকানের খুপরির অন্ধকারে ভূতের যারপরনাই আহ্বান

সত্ত্বেও সেদিকে পা বাড়ায়নি নিমকি। পাঁচ টাকার কারেন্সি নোটটা নিয়ে পালিয়ে আসে।

বলা বাহুল্য, এই নিম্‌কি এবং তার দুঃখ-বেদনা-চিত্ত-চাঞ্চল্যও আমাদের চেনা। তা ছাড়া জ্যোতিদা, আপনার 'দ্বিতীয় প্রেম', 'বুটকি ছুটকি'—কাহিনীর সর্বত্র এমন অজ্ঞ কিশোরীর যত্রতত্র যৌনপীড়নের নজির রয়েছে।

কিন্তু নিম্‌কির, অর্থাৎ এক কিশোরীর বেদনা আমাদের কাছে সংক্রামক ব্যাধির মতোই বিষাদ এবং আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে তখনই, যখন দেখি তার এই উৎসহীন গোপন উপার্জন ছিনিয়ে নিয়ে মদ্যপানের আয়োজন করে নিম্‌কির জন্মদাতা শশী। একবার প্রশ্নও করে না মেয়ের হাতে এই টাকা কে এবং কেন দিল। এ ব্যাপারে নিম্‌কির পিসির অভিব্যক্তি যেন আরো অভিনব—"তুই কি কাঁদছিস নাকি, কাঁদবার কি হল? না হয়, তোর রোজগারের টাকা দিয়ে আজ বাপ একটু খেয়ে এল।"

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই মনোবিকলনই আপনার কাহিনীর বিষয় জ্যোতিদা। কিন্তু 'রাক্ষসী' গল্পে এই মনোবিকার এক অন্য মাত্রা পেল। যখন এক নারীর কবর খননের কাজে হাত লাগায় মাতৃসমা অন্য এক নারী। একজন নারীও তা হলে নারীবিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে। কাজেই নিম্‌কি যদি তার পিসিকে ঘৃণা করে, বাবা তথা সমগ্র পুরুষসমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে। প্রতিটি ক্ষত লেহন করে সাত হাত লম্বা জিভ বার করে, তা হলে বোধহয় তাকে নারী বলা যায় না। সে তখন রক্ত প্রত্যাশী রাক্ষসী হয়ে উঠতে পারে। কারণ এই বিদ্বেষ কিংবা বিতৃষ্ণা সবই তার আত্মা থেকে সঞ্চারিত। সে আগে নিজের আত্মার পীড়ন সহ্য করেছে। আপন আত্মার আর্তনাদ কান পেতে শুনেছে। তারপর এক ভয়ংকর বিবমিষা থেকে নিম্‌কি আবিষ্কার করেছে, "...তার কানদুটো গরম হয়ে গেছে। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ও ভাবে। তবে কি সত্যি নিম্‌কি আর নিম্‌কি নেই,—একটা রাক্ষুসী হয়ে গেছে? তবে কি কাল আবার ছাতার কারখানার ভূতটার কাছে ও যাবে? না, বাবা হাত থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল বলে তার দুঃখ হচ্ছে না, দুঃখ হচ্ছে, কান্না পাচ্ছে একবার জিজ্ঞেস করল না কেউ নিমকি কোথায় টাকা পেল? যদি তারা জিজ্ঞেস করত, ধমক লাগাত, মারত, তবে নিম্‌কির ভাল লাগত। টাকা পেয়ে খুশি হয়ে বাবা আর পিসি কি তাকে সত্যিকারের একটা রাক্ষসী বানিয়ে দিচ্ছে না। চিন্তা করে নিম্‌কি অসহায় চোখে অন্ধকার সিলিংটা দেখতে লাগল।"

না, আপনার এই নিম্‌কিকে দেখে ন্যায়-অন্যায়, সতী-অসতী কিংবা ভালো-মন্দ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে পারি না জ্যোতিদা। বরং মাথা নুয়ে আসে। লজ্জায়। এবং আপনার লেখনীর প্রতি পরম মমতায়। প্রেমহীন সংসারের অন্ধকার খুপরিতে এই কিশোরী তো প্রায়শই ধর্ষিত হয়। আর ধর্ষিতা মেয়ে যদি নারীর সমস্ত লজ্জা ও মর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়ে সহসা রাক্ষসী হয়ে ওঠে এবং তার এই হয়ে ওঠার পথে প্রতিটি বেদনাময় কাঁটা যদি আপনি শনাক্ত করে দেন, তা হলে সেই কাঁটা যতই খচখচে হোক, মানুষের নীতিবোধের থুতনি নেড়ে দিতে সাহায্য করে। প্রেমহীনতাও তো একধরনের দুর্নীতি, তাই না? আপনার লেখনী তাই আমাদের কাছে জাগ্রত বিবেক। প্রশ্ন, মূল্যবোধেরও বটে।

কিন্তু মা যখন মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন! দুই প্রজন্মের ভিতর জন্ম নেয় অসূয়া,

বিদ্বেষ কিংবা দূরত্ব—তা বোধহয় কেবল মূল্যবোধের অভাব জনিত নয়। বিবেকহীনতার পরিচয়ও নয়। আসলে এ সেই নারীর শাশ্বত আত্মরতি। নার্সিসাস প্রেম। যে নিজেকে ছাড়া কিছুই দেখে না।

'টুকরো কাপড়' গল্পে ছত্রিশের তটিনী তার সদ্যযৌবনবতী কলেজ-পড়ুয়া মেয়ে সেবার সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেন এক ভয়ংকর অসূয়া এবং বিদ্বেষ বোধ থেকে। কারণ তটিনীর অধ্যাপক তথা সমাজসেবী স্বামী প্রফুল্লর ঘনিষ্ঠজন ও যাবতীয় অতিথি অভ্যাগতরা বাড়ি এলে আগে সেবার দিকে তাকায়। তারপর তটিনীর প্রতি। সেবার দিকে পাঁচবার তাকালে তটিনীর প্রতি তারা দৃষ্টিপাত করবে দু'বার।

আপনি জানিয়েছেন, "কি, ছত্রিশ বছর বয়সে নারীর দ্বিতীয় যৌবন দেখা দেয়। তটিনীর তাই দিয়েছে, এটা তটিনী সারাক্ষণ এত বেশী মনে রাখে এবং সেভাবে চলে যে সেবা অনেক সময় তার আঠারো বছরের যৌবন নিয়ে মার সঙ্গে পেরে ওঠে না। এবং যদি কোন সময় সেবা প্রতিপন্ন করতে চায় যে মার চেয়ে তার চোখ, মুখ, কথা, চলা, চুল, শরীর নখ কি আঙুলটিও দেখতে বেশী রমীয় লোভনীয়—তো তটিনী সাংঘাতিক চটে যায়। মেয়ের সঙ্গে কথাই বলবে না তখন।"

বলা বাহুল্য, তটিনীর এই আত্মরতি আত্মবঞ্চনারই নামান্তর। সে সংসারের প্রতিটি সম্পর্কের আয়নায় কেবল নিজের মুখ দেখতে চায়। এবং বিপরীত কিছু ঘটলে কিংবা নিছক সন্দেহবশত তার মনে যে ক্রোধ বা বিষবাষ্প জমা হয় সেই বিষক্রিয়ায় ঝাপসা হয়ে যায় আয়নাটাই। শিথিল হয়ে যায় সম্পর্কের সুতো। তখন এক অসহায়তার বিকার তাড়িয়ে বেড়ায় তার আত্মা তথা অস্তিত্বকে।

ধোপার বাড়ি কাপড়জামা ধোয়া নিয়ে, বাথরুমে স্নানের সাবান প্রসঙ্গে অথবা যে কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ে তটিনী মেয়ের সঙ্গে প্রবল ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। বাক্যবাণে ফালাফালা করে দেয় মেয়েকে, "তাই তো বলছিলাম আমার শরীর শরীর না তোরটাই সব। আমার শরীরে পোকা পড়ুক, সংসারের হাজার কাজের নোংরা ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে পচে হেজে যাক—এই ইচ্ছা নিয়েই তুই রাতদিন আছিস।"

তার স্বামী একাধারে অধ্যাপক এবং সমাজসেবী হয়েও যখন আইন পরিষদের সদস্য হন আবার ছোট খাটো ছাপাখানাও খুলে ফেলেন, প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটান, তখন মধ্যদিনের নিঃসঙ্গ বিহ্বল তটিনী এইভাবেই তার আত্মজ, একান্ত কাছের জনকে পেরেক বিদ্ধ করতে থাকেন। তার অস্তিত্বের বিপন্নতার সবটুকু কেন্দ্রীভূত হয় নিরাপত্তাহীনতা তথা শরীরের যৌবন বিগত হওয়ার সম্ভাব্য ভয় নামক সংরাগের একটিমাত্র বিন্দুতে।

আপনার মনে আছে জ্যোতিদা, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র শশী একবার কুসুমকে বলেছিল 'শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম?'

একই প্রশ্ন যদি আমরা তটিনীকেও করি, তা হলে তার স্রষ্টা আপনি কী উত্তর দেবেন জ্যোতিদা? নারীশরীর পুরুষের আরাধ্য হতে পারে, নারীসঙ্গ কবির প্রিয় অধ্যাস হতে পারে কিন্তু নারী নিজে কেন কেবল শরীরকেই একমাত্র 'মূলধন' মনে করে বিপন্নতার

চোরাগলিতে ঘুরপাক খাবে! এক মধ্যযৌবনা নারী তার কাঁধে পিঠে বয়সোচিত উদ্বৃত্ত চর্বি ও গভীর বোধ জনিত প্রজ্ঞার বিষণ্ণ কালি চোখের তলায় সঞ্চয় করে যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, তার সৌন্দর্য কি কম উপভোগ্য! তটিনী তো তার মেধা এবং অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্য দিয়ে মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে পারত। মেয়ের সৌন্দর্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আহ্লাদিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। আপনি তা হতে দেননি। একটি টুকরো কাপড়ের মতোই অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে দিয়েছেন তাকে। তার অশিক্ষার অন্ধকারে।

আসলে, এ গল্প কেবল তটিনীর নয়। আঠারো এবং ছত্রিশ—দুই অসমবয়সী নারীর তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বেরও গল্প। দু'জনেই নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য পরখ করে। একজন উন্মেষপর্বের লাবণ্য প্রভায় বিহ্বল হয়। অন্যজন বিদায়বেলার উদ্বেগে কেবল ভারাক্রান্ত হয়।—"সেবা ভাবে। ...উঠে দেয়ালের হুক থেকে আরশিটা টেনে নিয়ে সেটা বইয়ের গায়ে ঠেকিয়ে টেবিলে দাঁড় করিয়ে রাখল তারপর চুপচাপ সেদিকে চেয়ে রইল। ...না, দু'বছর আগে একবছর আগে বুঝি তার ঠোঁট এত লাল, আর দাঁত এত সুন্দর ছিল না। আরশি থেকে চোখ সরিয়ে সেবা আবার একটা নিশ্বাস ফেলে।

...ইদানীং সে খুব সতর্ক হয়ে গেছে নিজের শরীরের আকৃতি সম্পর্কে। ...রাত্রে ভাত বন্ধ করেছে আলু ছেড়েছে ঘি ছেড়েছে এমন কি তটিনীর এত প্রিয় খাদ্য মাংস পর্যন্ত ছাড়তে চলল। প্রফুল্লবাবু মাঝে মাঝে স্ত্রীর 'শ্লিম' হওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা দেখে হাসেন, ঠাট্টা করেন বটে, কিন্তু তটিনী তা গায়ে মাখে না।"

হ্যাঁ জ্যোতিদা, আপনার অধিকাংশ কাহিনীতে নারীকে বারবার আয়নার সামনে দাঁড়াতে দেখি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আয়না প্রেমের নয়, মননের নয়। নিছক শরীরের প্রতিফলক মাত্র! তাই মা-মেয়ের মধুর সম্পর্ক দ্বিধাবিভক্ত হয়।

একটি সুখী পরিবারের বৃত্তে বারবার ফাটল ধরে। কেবল শাড়ি আর ফ্রকের ভিতর নারীদেহের আনাগোনার তারতম্য থেকেই চিহ্নিত হয় পোশাকি নারীবাদ। প্রসঙ্গত, "এটা অভাব না, শাড়ি পরিয়ে নারীত্ব মাতৃত্ব ইত্যাদির বিজ্ঞাপন থেকে যতদিন পারা যায় মেয়েব শরীর মন মুক্ত রাখতেই যে বাবা মা ফ্রক পরতে দিতেন বেশ বুঝতে পারত তটিনী। এখন সে এটা আরো বেশি বুঝতে পারে। কিন্তু প্রফুল্ল সনাতনপন্থী। এই নিয়ে তটিনীর সঙ্গে কত হাজারবার ঝগড়া তর্কবিতর্ক হয়েছে। সেবার ফ্রক পরা নিয়ে। খুব বেশিদিন সেবাকে ফ্রক পরিয়ে রাখতে তটিনী পারেনি। অথচ শাড়ি পরিয়ে যে খুব একটা সুফল হয়েছে তা-ও না।

সেবাকে শাড়ি কিংবা ফ্রক পরিয়ে কোনো বিশেষ অনর্থ ঘটেছে বলে আপনি জানাননি। তবে কাহিনীর অভ্যন্তরে এই তীব্র শ্লেষ নারীবাদের বাহ্যাড়ম্বর বা পোশাকি আস্ফালন সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে নিঃসন্দেহে।

আদতে তটিনী কোনো পূর্ণবিকশিত নারীর নাম নয়। সে তার অসম্পূর্ণতা ঢাকতে, অন্যের চোখে নিজের আলোকচিত্র দেখার আশায় তার প্রথম যৌবনের প্রথম পুরুষ সতীশের বাড়ি হানা দেয় এক মধ্যদুপুরে। এই তটিনী যত না প্রবৃত্তিতাড়িত, তার থেকে

বেশি বেদনাতাড়িত। সে বিদ্রোহিনী নয়। আবার কবিতার মতো আপন মহিমায় স্রোতস্বিনীও নয়। তার সমস্ত রকম অবরোধ, বোকামি এবং তজ্জাত বেদনার ভার হাল্কা করতেই সতীশকে অবলম্বন করে।

আর বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা সতীশ তার ক্ষুদ্র দর্জি দোকান থেকে কিছু ছিট কাপড় উপহার দেয় তটিনীকে। তার মেয়ের পুতুল খেলার সামগ্রী স্বরূপ। কিন্তু মনোবিকলনে জর্জরিত তটিনী উপলব্ধি করে, সেই সঙ্গে আমরাও, যে আসল বেদনার উৎস কোথায়। ছত্রিশের তটিনী তার দ্বিতীয় যৌবন তারিয়ে উপভোগ করার আগেই মেয়ের উদ্দাম প্রথম যৌবন চতুর্দিক ঢেকে ফেলেছে।

বাস্তবিক আপনি কোনো সংবেদনশীল, আত্মস্থ স্থিতধী, স্নিগ্ধ নারীচিত্র উপস্থাপন করেননি। তটিনীর ছত্রিশ বছর বয়সটাও তার উপযোগী নয়। আসলে সমস্ত রকম অভাব ও বৈষম্যের মধ্যে ফেলে দিয়ে নারীকে প্রত্যক্ষ করাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল জ্যোতিদা। হয়তো এইভাবে আপনি তটিনী তথা নারীর নারীত্ব, মাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব যাচাই করতে চেয়েছিলেন। এ-ও এক নারীবাদী চিন্তারই ফসল বলতে হবে। নারীবিদ্বেষ নয়। তা হলে অন্তত গল্পের শেষে তটিনীর অনুভবে এমন গভীর মনস্তত্ত্ব খুঁজতে যেতেন না। খিটখিটে, বদমেজাজী এবং সদা সন্দেহপ্রবণ তটিনীকে এমন অকৃত্রিম বেদনায় মথিত হতে দেখতে পেতাম না আমরা—"আঃ, সত্যি সেবা যদি আজ ছোট থাকত, —সেবা যদি ছোট থাকত, পুতুল খেলত, তটিনী কি আরও ক'টা বছর হাতে পেত না। না পেলেও অন্তত ওর সঙ্গে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হ'ত না তটিনীর।"

এই তটিনী যদি 'ধী' এবং 'হ্রী' দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখত, কিছু সুসংবদ্ধ চিন্তার অধিকারী হ'ত, তা হলে মা-মেয়ের সম্পর্ক অনেকটা সুস্থ হতে পারত। সেটা হ'ত সম্ভাব্য সত্য। কিন্তু আপনি তো বরাবর সত্যের আপেক্ষিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন জ্যোতিদা। হয়তো আপনার সৃষ্ট চরিত্ররা তা পারেনি। কিন্তু আপনি পেরেছেন। তাই তটিনীর নির্লজ্জ বোকামি দেখে নিভৃতে সেবা হাসে। প্রফুল্লও হাসে। কিন্তু সৃষ্টির নিঃসঙ্গ প্রহরে অসহায় অস্তিত্বের শরিক হয়ে সাহিত্যের অন্দরমহলে স্থান পায় তুচ্ছ এই নারী।

কিন্তু আপনার কাহিনীর অন্দরমহলে অসহায়, বিকারগ্রস্ত, প্রবৃত্তিতাড়িত, চিন্তাশক্তিশূন্য নারী যত হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, হৃদয় সংরাগে ঐশ্বর্যময়ী নারী তত অবাধ প্রবেশাধিকার পায়নি। ব্যতিক্রম 'সাঁকোর ওপরে নীরা' এবং 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসের দুই নারী—নীরা ও রমলা।

নীরার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। রমলার কথাও। তবু বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে একজন অর্থাৎ শেক্‌স্‌পিয়রের এলিয়ট রবীন্দ্রনাথ পড়া অধ্যাপিকা ধীমতী নীরা দুই অবিবেচক, আস্ফালনপ্রিয় পুরুষের তাকে কেন্দ্র করে প্রলোভনের লড়াই প্রত্যক্ষ করে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। কোনো গন্তব্যে তার পৌঁছনো হয়নি। কিন্তু তার শরীরী লাস্যে প্ররোচিত করে তপেন ও সুজিত দুই পুরুষকে, পুরুষের কামনাকে সে উস্‌কে দেয়নি। কলকাতার ট্রামে বাসে রেস্তরাঁর ভিড়ে সে দু'জনের সঙ্গেই সমব্যবহার করেছে বন্ধুর মতো। নারী শরীরের সহজ রসায়ন ভুলে। একজনের

গালে চুমু খেলে অন্যজনকেও বঞ্চিত করেনি।

ত্রয়ী সম্পর্কের মূল্যায়ন নির্ধারণে আপনি জানিয়েছেন, "সাদা কথায় নীরার সঙ্গে সুজিতের ভালবাসার মধ্যে বা নীরার সঙ্গে তপেনের অন্তরঙ্গতার মধ্যে সেক্স-এর নোংরামী ছিল না। অন্তত নীরা তাই জানত। তা বলে অতীন্দ্রিয় ভালবাসা—প্লেটনিক প্রেমের উচ্চ আদর্শ মেনে নিয়ে যে তারা কাঠখোট্টা সন্ন্যেসী হয়ে সারাক্ষণ চলত তা-ও নয়। যথেষ্ট গা-ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে।

...সুজিত যদি কখনো নীরার গালে গাল ঠেকিয়ে ওকে আদর করেছে—তপেনের দিকেও নীরা আর একটা গাল তক্ষনি বাড়িয়ে দিয়েছে—গালে গাল ঠেকিয়ে তপেনও সেভাবে ওকে আদর করেছে। এটা যে সাংঘাতিক একটা গোপনীয় কিছু নয়—তাই প্রমাণ করার জন্য নীরা এমন করত। ...একলা নীরা কারো নয়। এই বোধ নিয়ে তারা চলছিল বলে স্বার্থপরতার গন্ধ তাদের মধ্যে উঁকি দিতে পারেনি। স্বার্থপরতা থেকেই পাপের সৃষ্টি, নোংরামীর সৃষ্টি। এবং তখনই হিংসা ঈর্ষা সন্দেহ মাথা চাড়া দেয়। এবং তারপর যা ঘটার ঘটে।" (পৃ. ১৩-১৪)

যৌনবিকারকে অতিক্রম করার এই সহজপাঠ আপনার তৈরি নারীই দিতে পারে জ্যোতিদা। অতিবাঁধন বা অতিনগ্ন কাল বপনের প্রয়াসে তারা দিনযাপন করে না। কিন্তু জীবনে সহজ হবার সাধনা যারা ভুলে গেছে, এই পাঠক্রম তাদের জন্য নয়। তাই প্রকৃতির নির্জন আবহে পিকনিকের ছলে এসে এক নারীর প্রতি অধিকারবোধে পাইপগান ও বোমা নিয়ে ধুন্ধুমার লড়াইয়ে নেমে পড়ে তপেন ও সুজিত।

ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব—কোনো গন্তব্যেই পৌঁছনো হয় না নীরার। দু'জনের কাউকেই বিশেষ প্রশ্রয় দিতে পারে না সে। তার বোধ, তার রুচি এবং শিক্ষা সম্বল করে হেঁটে যায় বিপন্ন সাঁকোর পথ ধরে।

আবার রমলার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা আপনি আমাদের দেননি। রমলা ঘরের বউ। এক সন্তানের জননী। চিকিৎসকের পুত্রবধূ। ইঞ্জিনিয়র ঘরনি, এটুকু আমরা জেনেছি।

কিন্তু রমলার বড় পরিচয় বোধহয় সে নিজে। হৃদয়াবেগে ভেসে না গিয়েও এক হৃদয়তাড়িত স্বয়ংসম্পূর্ণা নারী এই রমলা।

রমলা শ্বশুরকে মান্য করে। স্বামী পরিতোষকে ভালোবাসে। সেবা, মমতা, স্নেহ দিয়ে সংসারকে শ্রীমণ্ডিত করে রাখে। তাদের সুখের সংসারে দাম্পত্য কলহ যে হয় না, তা নয়। কিন্তু সে যেন কেবল অনুরাগের রং আরো গাঢ় করার জন্যই। রমলা তার বয়সে ছোট দেওর সন্ন্যাসী সুকোমলকেও শ্রদ্ধা করে। শাসন করে।

কিন্তু এই রমলা মিথ্যে কথাও বলে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সংসার পরিত্যাগ করে চলে যায়। ভাশুর পরিমলের জন্য।

নারীপ্রেমে ব্যর্থ, বঞ্চনার শিকার পরিমল খুনের অপরাধে জেল খেটে ফিরে আসার পর বাড়িতে সবাই যখন তাকে নিয়ে সন্ত্রস্ত, সন্দিগ্ধ তখন রমলাই তার পাশে দাঁড়ায়।

এক খুনির মধ্যে এক প্রেম প্রত্যাশীর সৌন্দর্যতৃষ্ণা উপলব্ধি করে রমলা। প্রত্যক্ষ করে এক কবিকে। বয়স্ক শিশুকে।

বেকার ভাশুরকে, প্রণয় সন্ধানী পরিমলকে সে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। বাথরুমে ছেলেকে স্নান করাতে গিয়ে আঙুলের সোনার আংটি ফেলে আসে রমলা। সেই আংটি পরিমল তুলে নিয়ে গেলে প্রাথমিক ভাবে বিচলিত হলেও সত্য প্রকাশ করে না শ্বশুর জগমোহন কিংবা স্বামী পরিতোষের কাছে। তাদের জেরার মুখে মিথ্যে কথা বলে পরিমলকে বুলার প্রতি প্রেম ঋদ্ধ হওয়ার অবকাশ এনে দেয় এই রমলা।

জ্যোতিদা, আপনার বর্ণনা থেকেই রমলাকে চিনে নিতে পারি আমরা, "কোথায় সেই চোর, শয়তান। হেমন্তের সোনালি আলোয় ভরা নীল আকাশের নিচে একটি সুন্দর মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। শিশুর সরল কৌতূহল তার দুই চোখে। ...চঞ্চল শিশু পাখির মতন আকাশে উড়তে গিয়ে যেমন বাধা পায়—তারপর ম্লান হতাশ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে উড়ন্ত পাখিটাকে দেখে। যেন সেই বিষণ্ণতা হতাশা এই মানুষটির চোখে।

রমলার চোখে জল এল।" (পৃ. ৩৪৩)

রমলার এই চোখের জলে আপনার পাঠকেরও আত্মার শুদ্ধিকরণ হয়।

কিন্তু পার্থিব জগৎ তো সন্দেহ-ঘৃণা-দ্বেষ মুক্ত নয়। তাই স্বামীর কুটিল সন্দেহের শিকার হয় রমলা। ভাশুরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ার অপবাদে অপমানে ঘর ছাড়ে সে। এই নারী প্রতিবাদী। ধীমতী। হৃদয়জীবীও বটে।

তা হলে কি এটাই ধরে নেব, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বোধের আলোকে একজন মানুষ যে উচ্চতা অর্জন করে, একজন নারী তার ব্যতিক্রম নয়। এবং সেই উচ্চতা অনিবার্যভাবে তাকে পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করে দেয় এ-ও সত্য। যেমন রমলার ক্ষেত্রে ঘটে। নীরার ক্ষেত্রেও।

এবার বলি জ্যোতিদা, আপনার সৃষ্ট নারী তার প্রকট শরীরী সত্তা নিয়েও একজন মানুষের মতই বিধ্বংসী, বেদনাহত, স্নেহপ্রবণ এ কথা আপনি প্রমাণ করতে পেরেছেন।

তাদের শরীরের বিকার আছে। বুদ্ধির বিকারও। কিন্তু বোধ ও বুদ্ধির সমন্বয়ে এক মাতৃমূর্তিও লালন করে তারা। প্রয়োজনে দশভুজা সংহার মূর্তি ধারণ করতে পারে।

কাজেই আপনার নারীনির্মাণ নারীর প্রতি বিদ্বেষপুষ্ট নয়। বরং ব্যাপক অর্থে একে নারীবাদ বলা যেতে পারে। এই নারীদের কাছে যৌনশিক্ষার জটিল ব্যাকরণ পাঠ নেওয়া যেতে পারে। অর্জন করা যেতে পারে অপ্রেমের হতাশা থেকে উত্তরণের গোপন চাবিকাঠিও।

সর্বোপরি আপনি এ-ও জানিয়েছেন, নারীপ্রেমের অন্তর্লীন প্রবাহে একটি প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে একটি শিশু। তাই 'রূপালী মাছ'-এর মাধুরী স্বপ্নে বারবার শিশুসন্তান প্রত্যক্ষ করে। রমলা তার ভাশুরের চৌর্যবৃত্তি ভুলে ক্ষমাশীল হয়ে ওঠে এক বয়স্ক শিশুর আকুলতা নিরীক্ষণ করে।

বাস্তবিক এক অনাবিল সারল্য, নিঃশর্ত সমর্পণ ও তীব্র অসহায় আকুলতা নিয়ে এক শিশু যেমন তার মাকে জড়িয়ে নিবিষ্ট হয়ে থাকে, নারীপ্রেম সেই মাতৃস্বরূপা আধারেই

তার সমগ্রের পরিতৃপ্তি পায়।

পুরুষ কিন্তু তার হৃদয়ের একাংশ মাত্র প্রেমের জন্য বরাদ্দ রাখে। তাই পুরুষের প্রেমে বারবার ছন্দপতন। সে ক্ষণভঙ্গুর, তাই বহুনারীগমন।

তবু একটা কথা না বললে এ রচনা সম্পূর্ণ হয় না জ্যোতিদা। আপনার কাহিনীতে বিকৃতকাম, পঙ্গু, নির্জীব, প্রণয়-প্রত্যাশী এবং সর্বোপরি আত্মানুসন্ধানী পুরুষেরও পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু আপনি এ কথা জানাননি, একজন পুরুষ যখন মাতৃহৃদয়ের কোমল সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও তাবৎ নিষ্ঠা নিয়ে হাত বাড়ায়, তখন নারী তথা বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে ফিরে ফিরে আসে তার সমস্ত মাৎস্যন্যায় বিসর্জন দিয়ে। এ-ও নারীবাদ বৈকি, নারীর আকাঙ্ক্ষাজাত সত্য।

জ্যোতিরিন্দ্র : প্রভাব-প্রতিফলন-প্রতিভাস

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে আমরা চারের দশকের লেখক বলে চিহ্নিত করতে পারি। কেননা ১৯৪৮ সালেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়। যদিও ১৯৩৭-৩৮-এ কলেজজীবনে প্রবেশ করার সময় থেকেই ছোটগল্প রচনায় হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। যাইহোক, আলোচনার সুবিধার জন্য এই দশক নির্দেশ জরুরি বলে মনে করি। আর এইভাবেই তাঁর পরিণত রচনার ক্ষেত্রে পর্ববিভাগ সম্ভব।

বলা বাহুল্য, ১৯৩৯-৪৭-এর পটভূমিতে আবির্ভূত কোনো লেখকই সময়ানুগ দহনকাল বা সামাজিক বিপর্যয় ও সার্বিক ভাঙনের থেকে দূরে থাকতে পারেননি। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে যুদ্ধান্তিক ধ্বস্ত সমাজ ও সময়ের যুগচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁদের রচনায়। সে অর্থে কেউ কারো সঙ্গে তুলনীয় নন, তবে সমান্তরাল বৈভবে বিচারযোগ্য অবশ্যই। কেননা, এভাবেই একজন স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রসঙ্গ এবং প্রকরণে প্রতিটি পৃথক রচনারীতি চিনিয়ে দেয় একটি দলিত সময়ের সঠিক রূপকল্প। প্রতি স্রষ্টার ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র স্ফুরণে যুগের যে খণ্ডচিত্র আঁকা হয় (কেননা সমগ্রকে দেখার চেতনা বা ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা অর্জন কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব নয়), সেই খণ্ডচিত্র এবং ব্যক্তিসত্তার চৈতন্যের বিপরীত ক্রিয়ায় প্রতিফলিত এক-একটি সৃষ্টিকে পাশাপাশি রাখলেই সেই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

তিনের দশকের আগে ও পরে আরো দুই স্বতন্ত্র ধারার লেখকের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। এঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইরে থেকে দেখলে অর্থাৎ বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে বিভূতি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই ভিন্ন গোত্রের লেখক। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায় এঁদের দু'জনের সঙ্গে একটা ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে 'প্রভাব' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করছি না। কারণ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কখনোই কারো অনুকরণ করেননি কিংবা প্রভাব স্বীকার করেননি। তা ছাড়া একজন খাঁটি লেখকের কাছে 'প্রভাব' শব্দটা বোধহয় সম্মানজনক নয়। বস্তুতপক্ষে

আঙ্গিক বা শৈলীর দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বলেই আমি মনে করি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ('প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' ইত্যাদি গল্প) তথা ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্ব অনুসারী চরিত্রগুলির জটিল অন্তর্লোক বিশ্লেষণ আমরা জ্যোতিরিন্দ্রের কাহিনীতেও দেখতে পাই। এজন্য অনেকসময় তাঁকে 'মানিকের ভাবশিষ্য' বলে মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর বিস্তার এবং বিশ্লেষণে মানিকের মতো তথ্যনিষ্ঠ নন জ্যোতিরিন্দ্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'দিবারাত্রির কাব্য' ইত্যাদি উপন্যাসে একটা বর্ণনাধর্মী জীবনালেখ্য প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনীগুলিতে উদ্ভট কল্পনা বিলাস এবং সাংকেতিকতার ছাপ যেমন রয়েছে তেমন অভিজ্ঞতা নির্ভর বাস্তবের অনুপুঙ্খ বর্ণনাও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আদিম মানবী কপিলার অসংস্কৃত মনোবৃত্তি অথবা হোসেন মিঞা চরিত্রটির রহস্যময়তা ও আকাশচারী মনোভাব লক্ষণীয়। আবার কুবেরের অনুষঙ্গে নদীমাতৃক গ্রামজীবন, ধীবর পল্লীর প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি হাসি-কান্না-ছলনা-সংরাগ আড়ম্বরহীন নিখাদ বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তেও শশীর নাগরিক যন্ত্রণা, শশী-কুসুমের সম্পর্কের টানাপোড়েন বা রহস্যের জাল বিস্তারকে ছাপিয়ে উঠেছে গাউদিয়া গ্রামের জীবনপ্রণালী ও চরিত্রগুলির ধারাবাহিক বৈচিত্র্যহীনতা, ভণ্ডামি, ঈর্ষা, প্রণয়, অস্থিরতা, নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের বর্ণনা। আদপে মানিকের রচনাশৈলীতে একটা ইতিহাসধর্মী প্রসার লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রের রচনা শৈলীতে পাওয়া যায় জীবন ও অনুভূতির তাৎক্ষণিক চিত্রাভাস। রহস্যময়তা বা সাংকেতিকতার অভাব সেখানে নেই, কিন্তু তা যেন অনেক পরিশীলিত, এবং পরিমিত।

বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গে বলা যায় তাঁর কাহিনীতে গঠনগত শৈথিল্য আছে। নিটোল কষ্টিপাথরের মতো জমাট ছিদ্রহীন রচনা তাঁর নয়। বিভূতিভূষণের রচনার আদ্যন্ত এক সহজ সাবলীল জীবনধারার অনুপুঙ্খ ছায়াপাত আছে। প্রেমের মাধুর্য আছে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে সে প্রেম কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃতির প্রতি এই অকৃত্রিম আনুগত্য বা পক্ষপাত ছাড়া আর কোনোদিক দিয়েই তুলনীয় নয় দুই লেখকের রচনা।

তুলনামূলক এই আংশিক পারম্পর্য থেকেই লক্ষ করি কাহিনীর গঠনবৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি'-তে অপুর শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে যৌবন পর্যন্ত কাহিনীর যে বিস্তার, পল্লীজীবনের যে লেখচিত্র ফুটে ওঠে, জ্যোতিরিন্দ্রতে তা অনুপস্থিত। আবার জীবনের ও জগতের প্রতি বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ সরল বালকের মতো। তিনি গল্প বলেন কথকের ভঙ্গিতে। একের পর এক বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৈরি হয় কাহিনীর পটচিত্র। রোমান্টিক মেদুরতা ছড়িয়ে থাকে সেই কাহিনীতে। সে কাহিনী বস্তুতান্ত্রিক জীবনভারে জর্জরিত নয়। সর্বোপরি অতীন্দ্রিয় রহস্যালোকের উদ্ভাস বিভূতিভূষণের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একইসঙ্গে রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি ও বর্ণনাবিলাস তাঁর কাহিনীর রসগ্রহণে বাধা হয় না ঠিকই, তবে গল্প-উপন্যাসের শরীর বা কাঠামো নির্মাণে একটা অসঙ্গতি এনে দেয় নিঃসন্দেহে।

প্রেক্ষিত বিচারে বলা যায় কোনো পূর্ণবত্তের কাহিনী রচনা জ্যোতিরিন্দ্রের বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর কাহিনীর চরিত্রগুলি বিশ্লেষণধর্মী। কিন্তু কাহিনীবিন্যাসে কোনো ব্যাপকতার আভাস পাওয়া যায় না। বিশাল ব্যাপক ক্যানভাসের লেখক নন জ্যোতিরিন্দ্র। প্রায়শই একটা তাৎক্ষণিক মুহূর্ত, অনুভূতি, অনুসন্ধান স্থান পায় তাঁর কাহিনীতে। একটা সাংকেতিকতা, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতময়তা সেই মুহূর্ত বা অনুভূতি ব্যাখ্যার সহায়ক হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমসাময়িকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) প্রমুখ-র নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের লেখক বিমল কর (১৯২১)-এর রচনাও এই পর্যায়ের আলোচনায় বিশ্লেষণযোগ্য।

যুদ্ধ, দেশভাগ, মন্বন্তর এবং তেভাগা আন্দোলনে ধ্বস্ত পটভূমিতে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হলেও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখনী মূলত রোমান্টিক। তবে সমাজ চেতনার নির্যাসটুকু রেখেও পাঁক এবং পদ্মফুল দুইয়েরই উদ্ভাস তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনের জটিলতার শিল্পী নরেন্দ্রনাথও। কিন্তু পুরোপুরি নিরাবেগ নিষ্ঠুর স্টোয়িক শিল্পী নন। বরং আবেগসমৃদ্ধ মমত্ববোধ সম্পন্ন শুভচেতনায় বিশ্বাসী শিল্পী। গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির মানুষকে, তাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে, পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্সংঘাতকে নরেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতাও ধরা পড়েছে তাঁর সূচীমুখ বিশ্লেষণে। দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার।

'সেতার', 'ঘুষ' প্রভৃতি গল্পে মনোগহনের জটিলতার ছবি, 'রস' গল্পে সমাজের ছবিতে— প্রেম ও প্রয়োজনেব সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনেরই জয় হবে, তার ইঙ্গিত।

লক্ষণীয়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—উভয়ের রচনাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানবমনের জটিল অন্তর্লোক উন্মোচনের কথা বলে। তবে মানিকের মতো তীব্র রাজনীতিমনস্ক নন দু'জনের কেউই। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে মানিকের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তবে, নরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হল, চিন্তার পরিধি বিস্তারে তিনি কিছুটা শম্বুকগতি। দর্শনের নেতিজিজ্ঞাসা তাঁর বিশেষ নেই। রাজনীতি তাঁকে আকর্ষণ করে না। মানুষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রবল হলেও একটি বিশেষ স্তরে এসে সংহত খুবই স্বাভাবিক কারণে। কারণ, মানুষ তো শুধুই রক্তমাংস ও মনসিজ অস্তিত্বের সমষ্টি নয়, বরং আরো কিছু, অতিরিক্ত আরো বিবিধ সংস্কার সমষ্টি, যেসব সংস্কার জন্ম দেশ, কাল, সমাজ-ঘটিত সংঘর্ষের ইতিহাসে।

বস্তুতপক্ষে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সিদ্ধি সম্পর্কে কোনো সংশয় পাঠকের নেই। 'কল্লোল'- পরবর্তী যুগের বাংলা কথাসাহিত্য তাঁর রচনাকর্মে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তবু বলতেই হয়, যুগ ও সময়ের খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। একটি বিশেষ কালের স্পন্দমান জীবনের এক ভগ্নাংশকেই ধরার চেষ্টা করেছেন। যুগকে না ধরে যুগের কিছু

লক্ষ্মণকেই উপজীব্য করেছেন শেষ পর্যন্ত।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প-উপন্যাসের কুশীলবরা প্রাত্যহিকতায় আশ্লিষ্ট এবং বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। নিজের বা নিজের তাৎক্ষণিক সমস্যার বাইরে কিছুই তাদের স্পর্শ করে না। কোনো সমস্যার সামনে দাঁড়িয়েই তারা ভয়ংকরভাবে অসহায় বোধ করে না। প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, অভিমান, আকর্ষণ ইত্যাদি যেসব শর্তে জন্মসূত্রেই মানুষের অধিকার বর্তায়, সেইসব নিয়েই তারা তুষ্ট।

'দ্বীপপুঞ্জ'-এর সুবল, 'চেনামহল'-এর অরুণ, 'দেহমন'-এর বিভাস কিংবা 'সূর্যসাক্ষী'র শশাঙ্ক— চরিত্র হিসেবে এরা একক ও সম্পূর্ণ, একজনের সমস্যার সঙ্গে অন্যের সমস্যার প্রভেদ দুস্তর, পরিণতিতেও আছে বৈপরীত্য। কিন্তু যে-কারণে এরা সদৃশ হয়ে ওঠে, তা হল এদের আত্মভুক উপলব্ধি। এক ধরনের আত্মসচেতনতায় কমবেশি এরা সকলেই আক্রান্ত। ভয়, ক্লৈব্য, উৎকণ্ঠা ও মর্ষকামিতা—আধুনিক চরিত্রের লক্ষণগুলি তাঁর নায়ক নায়িকার মধ্যে নেই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই দুঃসাহসিক। তাঁর রচনায় নরনারীর বিকাশ প্রায়শই নিষিদ্ধ পথে, অবৈধ সংসর্গের মধ্যে, অর্থাৎ আপাতদর্শনে সাধারণের চোখে যা দূষণীয় মনে হতে পারে। এইখানে জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ এক। কিন্তু অভিন্ন নন। কারণ সৃষ্টিকর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ রোমান্টিক। নিছক নিয়তিবাদ বা নিষ্ঠুরতা নয়। মানুষ ও জীবন সম্পর্কে সুগভীর মমতা লগ্ন হয়ে আছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সন্তোষকুমার ঘোষ তেমনই এক শিল্পী, যিনি অন্য অনেকের মতো ঠিকুজি বিচারে আধুনিক হয়েও অষ্টাদশ শতকের গল্পকার হয়ে ওঠেননি। 'কিনু গোয়ালার গলি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চেনা গিয়েছিল লেখকের অন্তর্নিহিত স্বরূপটি। নগরজীবনের ক্লেদ, পঙ্কিলতা, ব্যর্থতা, পরাজয়, হতাশা আর আনন্দ দূর থেকে দেখেননি তিনি। জীবনের অতল গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন আসল সত্যের কৌটোটি। 'কানাকড়ি', 'কস্তুরী মৃগ', 'একমেব', 'শনি', 'দ্বিজ', 'ধাত্রী', 'দিনপঞ্জি', 'যাদুঘর' এবং আরো অজস্র ছোটগল্পে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষণীয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'কিনু গোয়ালার গলি' ছাড়াও 'নানা রঙের দিন', 'মোমের পুতুল' ইত্যাদি রীতিমতো সাড়া জাগায় পাঠকমহলে।

উল্লেখ্য, সন্তোষকুমারের রচনায় কোনো প্লট নেই। আছে শুধু সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছবি। আর আছে বিশেষ প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজসচেতন সহানুভূতি তাঁর সমগ্র মন জুড়ে, অসমতল বাস্তবতার প্রতি ব্যথাক্লিষ্ট বিদ্রূপের কশাঘাত তাঁর বাক্য ব্যবহারে, অন্যদিকে আশাবাদী উৎফুল্লতায় উজ্জ্বল তাঁর দৃষ্টি। কখনো কখনো তিনি কবি আর দার্শনিকের মতো উদাস, কিন্তু উদাসীন কখনো নন। জীবনের অন্তিমপর্বে এসে তিনি জেনেছেন, পাঠককে জানিয়েছেন, সভ্যতার শেষ কথা অনিশ্চয়তা, শূন্যতা এবং অসহায়তা। তাঁর এই বৈপ্লবিক চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করা যায় 'মুখের রেখা', 'জল দাও' উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী এবং আরো নানা রচনায়।

সর্বোপরি প্রেম সম্পর্কে সন্তোষকুমারের দার্শনিক ধারণাও লক্ষণীয়। প্রেম ছাড়া

জীবনযাপন কখনো কখনো যদি বা সম্ভব, প্রেম ছাপিয়ে জীবন কখনোই নয়। সব খুইয়েও আমরা একটা আশা বা বাসনার সঙ্গে বসবাস করি—সেও প্রেম। অথবা শেষ পর্যন্ত বিতৃষ্ণা বা ঘৃণার সঙ্গেও চলে সহবাস।

আদতে নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতাজাত বিষাদ, জীবনের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টি এবং সামাজিক বৈষম্যকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-আক্রমণ—জ্যোতিরিন্দ্র এবং সন্তোষকুমারের রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এই সময়ের অন্যতম আরো এক উল্লেখযোগ্য কথাকার নবেন্দু ঘোষ। বাস্তবের প্রতি আনুগত্য নবেন্দু ঘোষের রচনারও মূল ধর্ম। কিন্তু তিনি মূলত পজিটিভ মতে বিশ্বাসী। ভাবাবেগের প্রশ্রয় তাঁর রচনায় অনেকাংশে উপস্থিত। প্রসঙ্গত লেখকের 'বাঁকা তলোয়ার' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। গল্পের কুশীলব পার্বতী, মানিক ও তাদের মেয়ে টুনু। মহানগরীর রাজপথে দুটি ক্ষুধার অন্ন চেয়ে গ্রামের মানুষ বিসর্জন দিল তার প্রাণ, নারী দিল তার সম্ভ্রম, তবু কেউ বাঁচাতে পারে না তার ক্ষুধার্ত স্বামীকে, মেয়েকে। দেহ বিক্রি করে পার্বতী ফিরেছে, হাতের মুঠোয় এক টাকার নোট ও খুচরো কয়েক আনা পয়সা। "পার্বতী হাতের দিকে চাহিয়া ভাবে—অতীতের কথা নয়, ভবিষ্যতের। নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে সে যেন একটা বাঁকা তলোয়ার ধরিয়া আছে। দুই চক্ষু তাহার নির্বাণোন্মুখ চিতাগ্নির মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে। (পার্বতী—ভয় নাই। সৈনিকেরা প্রস্তুত আছে)।"

এছাড়া নবেন্দু ঘোষের 'কাণা', 'ত্রাণকর্তা', 'বস্ত্রং দেহি', 'ছিন্নমস্তা' ইত্যাদি একাধিক গল্প পাওয়া যায় যেখানে লেখকের মানসক্রিয়া বা সৃষ্টির পটভূমি রাজনীতি-অর্থনীতির ফ্রেমে আবদ্ধ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, দাঙ্গা দেখেছেন, যুদ্ধ-স্বাধীনতা-দেশবিভাগ-উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসবের তিক্ত অভিজ্ঞতা অনুভব করেছেন। নিজে সহিংস আন্দোলনের একজন স্বেচ্ছাসেবকও হয়েছিলেন এক সময়, পুলিশের হাতে নির্যাতনও ভোগ করেছেন। শৈশব থেকেই রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি। কংগ্রেসী স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে যার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই রাজনীতি চেতনাই তাঁকে একদিন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী করে তোলে। তাঁর লেখাতে তাই সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি মানুষ রাজনৈতিক জীব। সমাজের প্রয়োজনেই ব্যক্তির ভূমিকা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাগত বৈশিষ্ট্য হল, প্রথমত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘাতের কথা বলেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত বলেছেন মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার বা শ্রেণী সংগ্রামের কথা। তৃতীয়ত সেই শাশ্বত কালের দ্বিখণ্ডিত মানুষের দ্বন্দ্ব। মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের বোঝাপড়ার কথা।

তাঁর 'বনজ্যোৎস্না' গল্পটি বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের বিপ্লবী যুবককে নিয়ে লেখা। ডুয়ার্সের অরণ্যে পলাতক হয়ে যুবক এক ভুটানী মেয়ের কাছে আশ্রয় পায়। পূর্বরাগ জন্মায় উভয়ের। অবশেষে তারা ঠিক করে ভুটানে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে সংসার বেঁধে মুক্ত মানুষের জীবন কাটাবে। কিন্তু পথখরচা সংগ্রহের জন্য মেয়েটি দেহদান করে কাহিনীর খলনায়কের কাছে। যখন পয়সা হাতে ফিরে আসে, প্রেমিক যুবক তখন

পলাতক। জঙ্গলের ভীষণ অন্ধকারে জ্যোৎস্না নয়, সহসা দাবাগ্নি জ্বলে ওঠে। কাহিনীর পরিণতিতে কিন্তু লেখক মানুষের শক্তিতেই আস্থা প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় তাঁর 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে। 'লাল মাটি' উপন্যাসেও জমিদার ও প্রজার স্বার্থ জনিত সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সার্থক প্রেমের গল্পও লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণে তাঁর লেখনভঙ্গি পুরোপুরি আবেগনির্ভর, রোমান্টিক। লেখকের মতে প্রেম ইত্যাদি ব্যাপারগুলো শাশ্বত। এখানে ইজমের বিষয়গুলো খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

বস্তুত মানুষকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু পুরনো কাহিনী, পুরনো কথা, পুরনো রোমান্টিক ভঙ্গি এড়াতে পারেননি পুরোপুরি। হতে পারেননি আগাগোড়া অন্তর্মুখীন।

প্রচলিত গল্পরচনার রীতিতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে নতুন ছোটগল্প রচনার আগ্রহে চঞ্চল হয়েছিলেন কথা সাহিত্যিক বিমল কর। প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা, বিশেষত প্রেমের সূক্ষ্ম রুচিকর বোধ, সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমের চাপা অনুভব, অপ্রাপ্তির করুণ বেদনা—এগুলি তাঁর জীবন সম্পর্কে এক ধরনের সূক্ষ্ম রোমান্টিক বোধের পরিচয়। অন্যদিকে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা— প্রেমের বিকার, মৃত্যুর প্রবণতা, বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতার বেদনা, আত্মমগ্নতা, পবিত্রতাবোধ, আত্মশুদ্ধির আকুলতা ঋদ্ধ তাঁর গল্পগুলি সাম্প্রতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত পাঠকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।

'পার্ক রোডের সেই বাড়ি', 'সুধাময়', 'নিষাদ', 'পলাশ', 'আত্মজা', 'উদ্ভিদ', 'সোপান', 'এই দেহ', 'অন্য মুখ', 'জননী'—এইসব গল্প অদ্ভুত আত্মমগ্ন চিন্তার ভাষায় ভিতর-মানুষের চিন্তিত, দ্বন্দ্বযুদ্ধ বিষণ্ণ রূপটি ফুটিয়ে তোলে। চরিত্রগুলির মনোবিকলনের সার্থক প্রতিবিম্ব তুলে ধরেন তিনি সাহিত্যের আয়নায়। সর্বোপরি আশ্চর্য কাব্যভাষায় কাহিনীগৌণ গল্প লিখে এক ধরনের নতুন রীতি আনবার চেষ্টা করেন বিমল কর।

উল্লেখ্য, সাহিত্যসৃষ্টি করতে বসে কখনো কাউকে উপদেশ দেন না বিমল কর। জ্যোতিরিন্দ্রের মতোই। ছোটগল্পে যতখানি সম্ভব নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের কথা বলেছেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদিও সৃষ্টির ক্রমপরিণতিতে ভাবধারা পাল্টেছে লেখকের। সেখানে যেন তিনি কিছুটা ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিংবা ঈশ্বরের বিকল্প সন্ধান করেন। মুক্তি পেতে চান শূন্যবাদ কিংবা দুঃখবাদ থেকে।

অগ্রজ এবং সতীর্থদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিশ্চিতভাবে এক নিঃসঙ্গ রূপকার। তাঁর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দক্ষতা, ডিটেইলসের ব্যবহার, সিম্বলের ব্যবহার, আধ্যাত্মিক বিশ্বদৃষ্টি, যার মধ্যে গাছপালা, কীটপতঙ্গ থেকে দুর্গমতম মানুষ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত; বিশেষ করে প্রকৃতি ও নারী সম্পর্কে তাঁর অনুপুঙ্খ কৌতূহল, এবং সামগ্রিক দৃষ্টি,—সব মিলিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির চারিত্রিক রহস্যময়তার উন্মোচন তাঁর গল্প-উপন্যাসকে ভিন্নতর মাত্রা দান করেছে।

জলের গতি যেমন নির্দিষ্ট একরৈখিক নয়, অঞ্জলি ভরে ধরতে গেলে কেবলই ছড়িয়ে পড়ে, গড়িয়ে যায়, আবার খাল-বিল-নালা ছুঁয়ে নদী থেকে সাগরে তার যাত্রাপথের ক্রমিক বিস্তার— তেমনই নিপুণ, নির্মোহ কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যেরও জলের স্বভাব। জলের মতোই তাঁর সৃষ্ট কাহিনী এই পৃথিবী, এই জীবনের কানাগলির বাঁকা পথে ঘুরপাক খেতে খেতে বদ্ধ ডোবা ও নালার মতো অসুস্থ, বিকৃতকাম, পঙ্গু, অবসাদগ্রস্ত (morbid-morose) কিছু হৃদয়ের কথা বলে। জীবনানন্দের ভাষায়, "নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,/যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে/—সেই সব।" হৃদয়ের কথা বলতে বলতে ভুল হিসেবের কানাকড়িমাত্র সম্বল করে কখনও এই সব চরিত্ররা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে। কখনো বা হারিয়ে যেতে যেতে পৌঁছে যায় শাশ্বত কোনো বোধে। সেখানেও তাঁর লেখনী জলের কথাই বলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— পাপবোধ, অনুতাপ ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে চরিত্রের যন্ত্রণা লাঘব বা চিত্তশুদ্ধির উপলব্ধি। ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬) উপন্যাস থেকেই বোধহয় এই ধারার সূচনা হয়েছিল। কাহিনীর নায়ক রাসকলনিকফ-এর পাপবোধ ও পাপমুক্তির ব্যাকুলতা এক সর্বজনীন বোধের কথা বলে, যেখানে পাঠকও চরিত্রটির যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে।

আধুনিক কথাসাহিত্যের আরো এক বৈশিষ্ট্য হল, জীবনসত্যের অন্বেষণ। আলবেয়ার কাম্যু-র 'দি আউটসাইডার' বা 'দি স্ট্রেঞ্জার' উপন্যাসটি সে অর্থে বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। নায়ক মরসোর কাছে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, কিংবা হৃদয়াবেগের যাবতীয় প্রকাশ অর্থহীন মনে হয়। কাম্যুর নায়ক আদর্শ চরিত্রের লোক নয়, কিন্তু লেখকের বিন্যাসকুশলতায় পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করে চরিত্রটি। মরসোর জীবনসত্যের অন্বেষণই তার চরিত্রটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'তে সাহায্য করে পাঠককে।

জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টিকে উপরোক্ত উপন্যাসগুলির প্রতিতুলনায় দাঁড় না করিয়েও বলা যায় আধুনিক সাহিত্যচর্চার নিরিখে ক্ষয়িষ্ণু জীবন-কাহিনী অবলম্বনে তাঁর সৃষ্টি এক বাঙ্ময় সত্যের চিত্ররূপ। সেখানে পাপ আছে, ভ্রম আছে, শঠতা-ধূর্ততা-ব্যভিচার-হত্যা আছে। আবার হাহাকার এবং যন্ত্রণাও আছে। নিঃসঙ্গ শূন্যতা আছে। চরিত্রগুলি লোভী, অলস অবসাদগ্রস্ত, কখনো বা সংগ্রামবিমুখ। ছলে কিংবা কৌশলে কার্যোদ্ধারই তাদের লক্ষ্য। তারা নিয়ত অপরাধ করে। অপরাধের মাশুলও গোনে। আবার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্ত হয়। সর্বার্থে আশ্রয়হীন সর্বহারা মানুষগুলি রক্তাক্ত হয়। প্রেমহীন জীবনের গ্লানি বহন করে চলে দৈনন্দিনের ছল, চাতুরী ঈর্ষা ও ইতরতাকে আশ্রয় করে। জন্ম দেয় বিষাদ-বৈষম্যের। সবকিছু অপ্রাপ্তির মধ্যেও এই প্রেম সৌন্দর্যের সাধনাই ('এই তার পুরস্কার'-এর রামানন্দ বা 'প্রেমের চেয়ে বড়'-র পরিমল, 'গিরগিটি' গল্পের বৃদ্ধ, 'অজগর' গল্পের বরেন ইত্যাদি আরো একাধিক চরিত্রের মতো) জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টির স্বতন্ত্র ধারাটিকে চিনিয়ে দেয়।

ভূমিপুত্র জ্যোতিরিন্দ্র

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।"

('মানুষের মৃত্যু হলে' : শ্রেষ্ঠ কবিতা : জীবনানন্দ দাশ)

কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র সেই স্বতন্ত্র ও নিঃসঙ্গ পথিকদের একজন, যিনি ভূমিহীন কৃষকের ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন মাটির খুব কাছাকাছি। মাটির খুব গভীরে, পাতাল-গহ্বরে। গিয়েছিলেন উত্তরাধিকারীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সন্ধানে। নুড়ি, পাথর সরিয়ে তীব্র কুঠারাঘাতে নিরন্তর মাটি খুঁড়ে চলেন তিনি। তাঁর আয়ুক্ষয় হয়, রক্তক্ষরণ হয়। তবু থেমে থাকে না খননকার্য। প্রবেশ করেন অন্ধকার, আরো অন্ধকারে। 'হাজার বছর ধরে' খুঁড়ে চলার পর উঠে আসেন এক 'জলসত্র' হাতে। জলের সন্ধান আমরা পাই। পাই প্রেম-সৌন্দর্যের হীরকদ্যুতি।

আদতে সেই 'জলসত্র' কিন্তু এক ম্যাজিক আয়না। যার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা হয়ে যায় পরস্পরের মুখ। মুখোশের আড়ালে মুখ। দেখি ভয়ংকর ও সুন্দরকে। দেখি প্রেম-অপ্রেম, আবেগ-নিরাবেগ, সংরাগ-বিরাগ, বিবেক-বিবেকহীনতা, আগ্রাসী ক্ষুধা, যৌনবিকার, পাপ, আত্মহত্যা ও খুনের সংক্রমণে নিষ্ঠুর নৈর্ব্যক্তিক সত্যের মুখ।

এখন যদি বলি বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র : ভূমিকায় 'কালান্তক যম', কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাই বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দান নিঃসন্দেহে 'চেতনার ক্রোধ'। 'চেতনার বিপ্লব'ও বটে।

আলোচনার বিস্তারে যাওয়ার আগে বলে রাখা ভালো, সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছোটগল্পকারের। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস বিখ্যাত হলেও মুখ্যত তিনি ছোটগল্পকার। উপন্যাসগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি বিস্তার এবং অতি সংকোচনের দরুন অংশত শিথিল

চরিত্রের। সে তুলনায় প্রয়োগ-প্রকরণ ও ভাষাশিল্পে ছোটগল্পগুলি আরো নিখুঁত, অব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে আধুনিককালের আদর্শ ছোটগল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। বিজ্ঞানমনস্ক নিরপেক্ষ ভাবনায়, পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবসমস্যার নির্বেদ নির্মোহ বিশ্লেষণে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। পথ দেখিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মকে। তাই তিনি 'লেখকের লেখক'। সমসাময়িক কবিকুলের বিশেষ প্রিয় ছিলেন এই লেখক তথা শিল্পী। তাঁর ভাষা সৃষ্টির জন্য। ভাষা দিয়ে অবিকল্প এক মায়া জগৎ তৈরি করতে পারতেন তিনি।

বস্তুত কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৪), প্রগতি (১৯২৫)-র কালেই যুদ্ধোত্তর ভারতের পরিস্থিতি আশ্রয়ী সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু—এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম। এঁদের ভাবানুসারী বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে। 'চেতনার ক্রোধ' ও 'চেতনার বিপ্লব' আলোচনায় আমরা দ্বিখণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রকে আবিষ্কার করি। নিঃস্ব ও ঋদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্র।

নিঃস্ব জ্যোতিরিন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রের ত্রুটি

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বলেছিলেন, "কেহ একা থাকিও না। কেহ যদি তোমার প্রণয়ভাগী না হইল তাহা হইলে এ জীবন বৃথা।" বলা বাহুল্য, জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের পটভূমিতে এক বড় রকমের 'বিষবৃক্ষ' মাথা চাড়া দিয়েছিল। সেই বিষবৃক্ষ নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্নতাবাদ (alienation)। এমন এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষগুলি ক্রমাগত প্রেমহীনতার কথা বলে। মানুষে মানুষে সন্দেহ, কুটিল ঈর্ষা, পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, অনীহা এবং সর্বোপরি আর্থিক সংকট ও সেই সংকটকে আড়াল করার মধ্যবিত্ত মানসিকতা—এসবই ভালোবাসা- শূন্য প্রেমহীন এক দলছুট একক প্রাণীর জন্ম দিয়েছিল, যারা আকারে মানুষ হলেও আদতে মনুষ্যত্বহীন। আর এই মনুষ্যত্বহীন জাগ্রত বিবেকের অভাব জন্ম দিয়েছিল আরো এক অসুখ। নাগরিক পরিভাষায় যার নাম 'এক্সপ্লয়টেশন' (এ ব্যাপারে আলোচনা আমরা আগেও করেছি)। মানুষের হাটে মানুষকে ব্যবহার করার প্রবণতা। সেক্ষেত্রে ভালোবাসা, যৌনতা বা দারিদ্র সবই বিক্রয়যোগ্য পণ্য।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে কে. গুপ্ত-র আর্থিক বা মানসিক দারিদ্র তার মেয়ে বেবিকে মুদিদোকানির যৌনশিকারে পরিণত করেছে। 'মীরার দুপুর' উপন্যাসে মীরা তার প্রাক্তন প্রেমিকের ভালোবাসাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অসুস্থ স্বামী ও সংসারের অভাব পূরণের জন্য। 'রাবণবধ' উপন্যাসে কিশোর বাবলু ব্যবহৃত হয় নিছকই নীহার চৌধুরীর যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। আবার 'কেমন হাসি' গল্পে তরুণী লায়লা নিজেই নিজের রূপ-সৌন্দর্য-হাসিকে ব্যবহার করে অফিস বসের যৎকিঞ্চিত কৃপালাভের জন্য।

ভাববৈষম্যহীন পটভূমিগত অসুখ 'এলিয়েনেশন' ও 'এক্সপ্লয়টেশনে'র ক্রমিক শিকার এইসব চরিত্ররা প্রেমহীনতার কথা বলবে—এ যেন অনিবার্য ছিল। এ হল লেখকের দৃশ্যজগতের সত্য। এই দৃশ্যজগৎ 'মরবিড' ও 'মরোজ' বা বিকৃত-অসুস্থ বিষাদগ্রস্ত

মানুষের জগৎ। কঠোর দুঃসহ এই বাস্তবের রূঢ় কশাঘাতে তড়িদাহত হন ব্যক্তি জ্যোতিরিন্দ্র। সাধারণ মানুষের মতোই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন ক্লেদাক্ত ভারসাম্যহীন অন্ধকার জগতের সঙ্গে। দুঃখ ও ক্ষোভে ধ্বস্ত হন। কিংবা তলিয়ে যেতে থাকেন চাপ চাপ অন্ধকারের অন্তহীন বিষাদগহ্বরে। এই জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দের মতোই আলোড়িত হন দ্বিধা-দীর্ণ চেতনায়—

"...সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা : আমাদেরই আন্তরিকতাতে
আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা।
*   *   *
এ যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।"

(১৯৪৬-৪৭ : জীবনানন্দ দাশ)

ব্যক্তিমানুষের এই বিপন্নতাই 'চেতনাব ক্রোধ'। এখানে তিনি নিঃস্ব জ্যোতিরিন্দ্র। অবক্ষয়ের সার্থক কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র। মূল্যবোধের এই সার্বিক অবক্ষয়জনিত ঘটমান বর্তমানই তাঁর 'চেতনার ক্রোধ'-কে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কাজেই প্রথম পর্যায়ে আমরা এক নিঃস্ব, নৈরাশ্যবাদী জ্যোতিরিন্দ্রকে পাই যিনি একের পর এক প্রেমহীন, আলোহীন, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-সাযুজ্যহীন বিকারগ্রস্ত অন্ধকার জগতের কাহিনী রচনা করেছেন। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমিতে আক্রান্ত সেই কাহিনী, কাহিনীর চরিত্ররা আমাদের ক্লান্ত করে। বিস্ময়-বিমূঢ় বোধহীন জগতের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় পাঠক-সাধারণকে। বস্তুত 'সাদা ফুল কালো কীট', 'স্বাতী ও দীপু', 'আততায়ী', 'স্বর্গোদ্যান', 'তিন পরী ছয় প্রেমিক', 'জীবনের স্বাদ', 'যুবতীর মন নদী' ইত্যাদি এমনতর বহু কাহিনী জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছেন যা রচনা

না করলে বাংলা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না। এ হল জ্যোতিরিন্দ্রের ত্রুটির দিক। সীমাবদ্ধতার দিক। এখানে তিনি নিঃস্ব। আচ্ছন্ন দৃষ্টির ধারক জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর দেখার জগতের সত্য এখানে আপেক্ষিকতা আক্রান্ত।

কিন্তু অন্তর্গত চরিত্রে নিঃসঙ্গ মানুষটি তখনো হৃদয়ে লালন করেন এক জিজ্ঞাসা। নিয়ত অনুসন্ধিৎসু লেখক-হৃদয় এক জীবনসত্যের অন্বেষণ করে ফেরে। তাই কি ঘটা উচিত বা কি ঘটা উচিত ছিল, চেতনার অন্তর্লোক উন্মোচনকারী শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রের লেখনীতে সৃষ্টি হয় তেমনই এক মনোবাস্তব বা অধিবাস্তব জগতের কথা—প্রেম ও সৌন্দর্য যার একমাত্র আশ্রয়। সেখানে তাঁর চরিত্ররা প্রেমকে খুঁজে ফেরে রক্তের মূল্যে, জীবনের মূল্যে। কিন্তু কখনই বোধহীন অন্ধকারে হারিয়ে যায় না। এখানেই চেতনার বিপ্লব। এখানেই জ্যোতিরিন্দ্রের ঋদ্ধি। এই জ্যোতিরিন্দ্র প্রেম প্রত্যাশী। এই জ্যোতিরিন্দ্রই 'এই তার পুরস্কার'-এর কবি রামানন্দের কণ্ঠে ভর করেন। আমাদের জানান—"তাই আমি চেয়েছিলাম/ভালবাসার সব রং পাখি হয়ে ফেরে,/সূর্য হয়ে সোনা করে দেয়/জীবন এমন—।"

এই জ্যোতিরিন্দ্রই ব্যবহারিক জীবনযাপনের বেদনা ও ক্লান্তিতে, হতাশা ও ব্যর্থতায় আত্মাকে জানার সন্ধানে বৃত হন। ঈশ্বর আছেন কি নেই সে প্রশ্ন তাঁর কাছে বড় কথা নয়। সুন্দর, গ্লানিমুক্ত জীবনযাপনের দুর্মর প্রয়াসে ভালো-মন্দ-দ্বেষ-ঘৃণা ছাপিয়ে সমস্ত দোলাচলবৃত্তি অতিক্রম করে যাত্রা করেন মহাপ্রস্থানের পথে। কোনো এক শক্তি বা সত্যের সন্ধানে। 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসের পরিমলকে দেখে স্বামীজি তাই যথার্থই বলেন—"...মনের যখন এই অবস্থা আসে, তখন মানুষ দেহ নিয়ে, দেহজ প্রেম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—সে আরও বড় জিনিস খুঁজে বেড়ায়, আরও বড় আনন্দ-পরমানন্দ লাভের জন্য তার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে"। এই জ্যোতিরিন্দ্র অজ্ঞাবাদী (agnostic)।

এই পর্যায়ের নৈর্ব্যক্তিক জ্যোতিরিন্দ্র খুলে দেন আমাদের বিবেকের গোপন দরজাগুলি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত কিছু চেতনার দ্বার খুলে দিয়ে পুরস্কৃত করেন তাঁর পাঠককে। প্রেমহীন জীবনের চোরাস্রোতে অলীক ভ্রমণ শেষে জানান—তবু ভালোবাসা থেকে যায়। তীব্র স্নায়ুযুদ্ধের পরও থেকে যায় সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। তাই তীব্র অনৈক্য ও বৈচিত্র্যহীনতার পর প্রেমিক আত্মাকে ঐক্যের সুরে স্নান করানোর প্রয়াস শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রের।

চলমান সময়ে প্রেম দুর্মূল্য, বিশ্বাস সংশয়াচ্ছন্ন, শ্রদ্ধা আত্মরহিত। তাঁর কাহিনীতে তাই অবক্ষয়ের প্রাধান্য। পূর্ণরূপ প্রেমিক ঈশ্বরের দেখা কদাচিত ঘটে জীবনে। কিংবা সারাজীবনেও দেখা মেলে না। কিন্তু থেমে থাকে না অনুসন্ধান। জ্যোতিরিন্দ্রের কাহিনীতে তাই আলো কম, অন্ধকার বেশি। প্রেম কম, অপ্রেমের কুয়াশা বেশি। গুটিকয় মাত্র ইতিবাচক কাহিনী রচনা করেছেন তিনি। আদতে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি পরিমাণে কমই হয়ে থাকে। এ-ও বাস্তব সত্য। তাই জ্যোতিরিন্দ্রের ত্রুটিও তাঁর বৈশিষ্ট্যের দিক। ক্রমাগত অন্ধকারের কথা বলতে গিয়ে প্রতিভার যে অপচয় তিনি ঘটান, তা-ও অনন্য। বিষয়গত ভাবে

বৈচিত্র্যহীন নিতান্ত নগণ্য একাধিক গল্প উপন্যাসেও তাঁর বর্ণনাভঙ্গি, উপমা-শ্লেষ-সংরাগ-কল্পনা সহযোগে ভাষানির্মাণ এক কুশলী শিল্পীর পরিচয় বহন করে।

আদতে আলো-অন্ধকারের আবর্তনে জ্যোতিরিন্দ্রের নির্মাণ। এই নির্মাণ পর্বে 'কালান্তক যম'-এর মতোই তিনি নিষ্ঠুর নির্মোহ অথচ সংবেদনশীল। প্রথমেই তিনি বিপরীতধর্মী স্ববিরোধিতাপূর্ণ (আদতে এই বৈপরীত্য এবং স্ববিরোধিতাও মানুষের ধর্ম) শব্দসমুচ্চয়ের তীব্র কষাঘাতে তড়িৎস্পৃষ্ট করেন পাঠককে। চেতনার মৃত্যু ঘটান। তারপর ধীরে ধীরে অত্যন্ত বিলম্বিত লয়ে জমাট অন্ধকারের জাল কাটতে কাটতে নিয়ে যান মৃত্যুহীন আত্মার অমৃতলোকে। এই মৃত্যুহীন আত্মা তখন এক শাশ্বতবোধের কথা বলে, যার নাম সৌন্দর্যসাধনা। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবমনের সৌন্দর্য চয়নের মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ আত্মার মুক্তি।

সৌন্দর্য সন্ধানী জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর নিগূঢ় সৌন্দর্য দর্শন অর্থাৎ নারী, প্রকৃতি ও প্রেমভাবনার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য সম্পর্কিত বিচিত্র ধারণার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রের এক স্মরণীয় উপহার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেমনতর এই সৌন্দর্যসন্ধান। সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্যের বিরোধ কতদূর! কিংবা যা সত্য তা-ই সুন্দর কিনা। আর এই প্রশ্নগুলির হাত ধরে চলে আসে সত্যের আপেক্ষিকতা অতিক্রম করার প্রশ্ন।

উত্তরে বলা যায়, পথ চলতে কীলখানায় ঝুলন্ত কাটা খাসীর শবদেহ দেখে আমরা শিউরে উঠি, চোখ বন্ধ করে ফেলি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনই মাংস দোকানের পাশাপাশি সহাবস্থান জনৈক ফুল বিক্রেতাব—এ-ও সত্য। আবার সেই ফুল কাজে লাগে ঈশ্বরের নিত্যসেবায়, বেশ্যার অঙ্গরাগে ও মৃতের সৎকারে। সমাজ-সংসারে, শিল্প সাহিত্যে এই বৈপরীত্য এবং বৈচিত্র্যই প্রমাণিত সত্য। জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার আবেদন সত্যদর্শনের সেই মিশ্র অনুভূতির কথাই বলে। তাঁর রচনা নগ্নতার অতিকথন নয়, আবার রোমান্টিক সুন্দরের ভাববিলাসও নয়। শিল্পের দরবারে জ্যোতিরিন্দ্রের ভূমিকা নৈর্ব্যক্তিক স্রষ্টার। কিন্তু নিছক সৌন্দর্যসাধনা বা সৌন্দর্যসাধনায় মুক্তির কথা বলেন না তিনি। কর্মের কথাও বলেন। বলেন কর্মের মধ্যে মুক্তির কথা। কারণ কর্মবিমুখতার গ্লানি সব সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যায়। 'এই তার পুরস্কার'-এর কবি রামানন্দ চরিত্রের ক্রমিক বিবর্তন সেই সত্যকেই তুলে ধরে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। বাস্তবিক রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মূল সুর অভিযোজন এবং সংযোজন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সে বিচারে উত্তীর্ণ কি না সে ব্যাপারে বিতর্ক থাকতেই পারে। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তিনি একই সঙ্গে নন্দিত এবং বিতর্কিতও বটে। কেননা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বিবিক্ত যন্ত্রণায় ক্রমাগত নিঃসীম অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে যায়। উচ্চবিত্ত সমাজ ও মানুষ তাঁর রচনায় অনুপস্থিত। প্রাত্যহিকতার গ্লানি ছাপিয়ে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের শক্তির অনন্ত সম্ভাবনার কথা তিনি বলেননি, যেটা 'socialist realist'-রা বলেছেন।

আমরা জানি জীবনে বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র সংগ্রাম, 'স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স'।

আবার, 'সংগ্রাম' ও 'অস্তিত্ব' বা 'অস্তিবাদ' শব্দ দুটি ওতপ্রোত জড়িত। জড়িত 'বিচ্ছিন্নতা'র প্রশ্নে। ঐক্যহীন, ঐতিহ্যহীন, নিঃসঙ্গ মানুষ বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়েও অন্তর্গত চরিত্রে কিন্তু ঐক্যভাবনার শিকার। সমাজবদ্ধতার ভিত্তিতেই প্রোথিত সেই ঐক্যচেতনা। সাহিত্যে এই জীবনের প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে কেউ হয়েছেন নৈরাশ্যবাদী (ডাডাবাদী) কেউ অস্তিবাদী।

যদিও এই উপমহাদেশের কোনো সাহিত্যিককে প্রকৃত অর্থে অস্তিবাদের সবকটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা যায় না, তবু এ কথা উল্লেখযোগ্য, অস্তিবাদের মূল প্রবক্তা স্বয়ং ডস্টয়েভস্কি বলেছিলেন, 'চারপাশে এত অন্ধকার আছে বলেই' সৃষ্টিতে অন্ধকারের প্রাধান্য। বাস্তবিক জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে শিল্পীকে কোনো একবার নরক দর্শন করতেই হয়। যেমন দান্তে করেছিলেন। যেমন ডস্টয়েভস্কি করেছিলেন। তারপর সেই রুদ্ধশ্বাস পরিক্রমার পর অশান্ত অস্থির আত্মার প্রশান্তির জন্য শিল্পীর আলোকসন্ধান। ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' বা 'দ্য ইডিয়ট' উপন্যাসে এই অভিধা অবশ্য প্রযোজ্য।

শিল্পের প্রেক্ষাগৃহে জ্যোতিরিন্দ্রের নরকদর্শনও সে অর্থে গভীর তাৎপর্যবাহী। অনেক অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে রক্ত জল করা তাঁর অভিযাত্রা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও ঐক্যবোধের পরিচয়। জ্যোতিরিন্দ্রের ত্রুটি ও তাঁর বৈশিষ্ট্যেব দিক। কারণ, অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে নিরন্তর পথিকবৃত্তি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর। অশান্ত অথচ নিশ্চল, বিক্ষুব্ধ আবার প্রশান্ত। সাহিত্যের বিশুদ্ধ পাঠককে তাই বারবার তাঁর কাছে ফিরে যেতে হয়। আদতে বিচ্যুত হয়েও পুনর্বাসনের আকাঙ্ক্ষা জ্যোতিরিন্দ্রের সৃষ্টির গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে বলা যায়।

মনে রাখতে হবে, স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব যখন নিজের থেকেও লম্বা হয়ে তাবৎ আপেক্ষিকতাকে ছাপিয়ে যায়, তখনই তিনি শিল্পী, দ্বিতীয় বিধাতা। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই 'উচ্চতা' শব্দটা বড় জরুরি। সৃষ্টির ক্রমিক পরিণতি পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রও যেন স্বকীয় দৈর্ঘ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন বৈপ্লবিক উচ্চতা।

হয়তো রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় বা ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে তুলনীয় নয় সে উচ্চতা। কারণ, পটভূমি ও মানসিকতাগত পার্থক্য তো ছিলই। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, ছায়া দীর্ঘতব হয়নি। অর্থাৎ অপ্রেম, মৃত্যু আর বিস্মৃত অন্ধকারই জ্যোতিরিন্দ্রের রচনার শেষকথা নয়। বেলাশেষের ছায়া মাড়িয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সজীবতায়, যেখানে তাঁর সৃষ্টি অন্য জ্যোতিরিন্দ্রের কথা বলে। যিনি পটভূমি, সময় ও সত্যের আপেক্ষিকতা অতিক্রম করেছেন। আশ্রয় খুঁজেছেন প্রেম, ভালোবাসা ও সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে। তাঁর সৃষ্টি বিশুদ্ধ পাঠকের কাছে তাই রোগমুক্তির আরকবিশেষ। তিনি প্রথম পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর কাদা-মাটি-খড় জড়ানো প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামোটা পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। তারপর রং-তুলির নিপুণ টানে রূপ দেন সৌন্দর্য প্রতিমার। সাহিত্যের সংগ্রহশালায় জ্যোতিরিন্দ্র তাই একাধারে কালান্তক যম ও চেতনার অবরোধ উন্মোচনকারী এক জ্যোতির্ময় শিল্পী।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গ্রন্থপঞ্জি

গল্পগ্রন্থ

১. শালিক কি চড়ুই (১৩৬১) : নায়ক-নায়িকা, খুকী, চড়ুইভাতি, বধিরা, ভোলাবাবুর ভুল, খেলোয়াড়, চামচ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী।

২. প্রিয় অপ্রিয় (১৩৬৪) : কৈশোর, গিরগিটি, আটপৌরে, বুটকি-ছুটকি।

৩. খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর (১৩৬৭) : কেষ্টনগরের পুতুল, পঙ্গু, মাছধরার গল্প, নীল পেয়ালা, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর।

৪. আজ কোথায় যাবেন (১৩৬৭) : সোনালি দিন, আম কাঁঠালের ছুটি, দুই শিশু, লেডিজ ঘড়ি, আরশোলা, গোধূলি, ভালো ছেলে খারাপ ছেলে, চশমখোর, জিয়নকাঠি মরণকাঠি, আজ কোথায় যাবেন, গোপন গন্ধ।

৫. পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা (১৩৬৮) : তিন বুড়ী, গোঁয়ার, বৃষ্টির পরে, আপেল, সমুদ্র, উপহাস, মৌসুমী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা।

৬. শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা (১৩৭০) : শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ।

৭. ছিদ্র (১৩৮৩) . ছিদ্র, সোনার চাঁদ, বুনো ওল, ক্ষুধা, হিংসা।

৮. শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৮৩) : নদী ও নারী, শালিক কি চড়ুই, মঙ্গলগ্রহ, তারিণীর বাড়ি বদল, ট্যাক্সিওয়ালা, চোর, বনের রাজা, গিরগিটি, তিন বুড়ী, সমুদ্র, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, ভাত, আলোর পাখি, সেই ভদ্রলোক, জীবন, ছাতা, অজগর, সামনে চামেলী।

৯. গল্পসংগ্রহ ১ম খণ্ড (১৩৮৯) : তাঁকে নিয়ে গল্প, এক ঝাঁক দেবশিশু, মহড়া, কেমন হাসি, হার, মাছি, ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা, সুখী মানুষ, সংহার, ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার, গাছ, মিষ্টি জ্বালা, বাবু, চাওয়া, নিঃশব্দ নায়ক, বন্ধুপত্নী, মঙ্গলগ্রহ, দৃষ্টি।

১০. গল্পসংগ্রহ ২য় খণ্ড (১৩৮৯) : তারিণীর বাড়ি বদল, মেয়ে-শাসন, দুপুরে গল্প, মৌচাক, টুকরো কাপড়, প্রতিনিধি, নৈশভ্রমণ, দিগ্‌দর্শন, রাক্ষসী, পতঙ্গ, শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ, মহীয়সী, বনের রাজা।

১১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প (১৩৯৬) : নদী ও নারী, রাইচরণের বাবরি, সমুদ্র, বৃষ্টির পরে, বনের রাজা, বন্ধুপত্নী, গিরগিটি, শ্বাপদ, তারিণীর বাড়ি বদল, মঙ্গলগ্রহ, চোর, নীল পেয়ালা, চন্দ্রমল্লিকা, পার্বতীপুরের বিকেল, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, পতঙ্গ, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা, জ্বালা, সামনে চামেলী, গাছ।

১২. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প (১৩৯৮) : কালো বৌদি, আপন ভাই, ম্যাজিক, ফুল ফোটার দিন, রূপকথার রাজা।

উপন্যাস

১.	সূর্যমুখী	:	১৩৫৯
২.	মীরার দুপুর	:	১৩৬০
৩.	বারো ঘর এক উঠোন	:	১৩৬২
৪.	গোলাপের নেশা	:	১৩৬৬
৫.	গ্রীষ্মবাসর	:	১৩৬৭
৬	নিশ্চিন্তপুরের মানুষ	:	১৩৬৭
৭.	চন্দ্রমল্লিকা	:	১৩৬৯
৮.	সমুদ্র অনেক দূর	:	১৩৬৯
৯.	আলোর ভুবন	:	১৩৬৯
১০.	হৃদয়ের রঙ	:	১৩৬৯
১১.	স্বর্গোদ্যান	:	১৩৭১
১২.	আকাশলীনা	:	১৩৭১
১৩.	নিঃসঙ্গ যৌবন	:	১৩৭১
১৪.	নাগকেশরের দিনগুলি	:	১৩৭২
১৫.	প্রেমের চেয়ে বড়	:	১৩৭৩
১৬.	বনানীর প্রেম	:	১৩৭৪
১৭.	অপারেশন	:	১৩৭৪
১৮.	সুনন্দার প্রেম	:	১৩৭৪
১৯.	নীড়	:	১৩৭৬

২০. ঝড় : ১৩৭৬
২১. হরিণ মন : ১৩৭৬
২২. সর্পিল : ১৩৭৭
২৩. দুই সমুদ্র : ১৩৭৮
২৪. লড়াই : ১৩৭৮
২৫. স্বর্গ খেলনা : ১৩৭৮
২৬. দ্বিতীয় প্রেম : ১৩৭৮
২৭. এই তার পুরস্কার : ১৩৭৯
২৮. লাস্ট চ্যাপ্টার : ১৩৭৯
২৯. রাবণবধ : ১৩৭৯
৩০. হৃদয়জ্বালা : ১৩৭৯
৩১. তিন পরী ছয় প্রেমিক : ১৩৭৯
৩২. অভিনয় : ১৩৮০
৩৩. রাঙ্গা শিমুল : ১৩৮০
৩৪. নীলরাত্রি : ১৩৮০
৩৫. বিশ্বাসের বাইরে : ১৩৮০
৩৬. ছোট পাখি নীল আকাশ . ১৩৮০
৩৭. বনহরিণী : ১৩৮০
৩৮. সোনার ভোমরা : ১৩৮১
৩৯. প্রেমিক : ১৩৮১
৪০. যুবতীর মন নদী : ১৩৮২
৪১. কলকাতার নট : ১৩৮২
৪২. সাঁকোর ওপরে নীরা ও সপ্তরথী : ১৩৮৩
৪৩. শেষ বিচার : ১৩৮৪
৪৪. আততায়ী : ১৩৮৪
৪৫. জীবনের স্বাদ : ১৩৮৪
৪৬. জ্যোৎস্নার খেলা : ১৩৮৪
৪৭. মন বদলায় : ১৩৮৭
৪৮. সাদা ফুল কালো কীট : ১৩৮৭
৪৯. অবেলায় *
৫০. অনুভার স্বপ্ন *
৫১. বসন্তরঙিন *
৫২. স্বাতী ও দীপু *

* প্রকাশ-সাল পাওয়া যায়নি।